(ইমাম মাহদীর দোস্ত-দুশমন)
দেশ বড় না দীন বড়?
মাও. আছেম ওমর
United Nations
ভাষান্তর
ছানা উল্লাহ সিরাজী

(ইমাম মাহদীর দোস্ত-দুশমন)

দীন বড় না দেশ বড়?

মাওলানা আছেম ওমর

কোথায় কী?

তুহফা

ইমামে ওয়াক্ত
গাজী আব্দুর রশীদ শহীদ রহ.
ও
(লাল মসজিদের)
সেসব আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ছাত্রীর নামে
যারা
পুরুষদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়ে
দীনি স্বকীয়তার মান রেখেছে
এবং
হকপন্থীদের ইতিহাসকে
লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে
বাঁচিয়েছে।

-মাও. আছেম ওমর

অনুবাদকের কলম

দিন বদলের মিছিলের সাথে ক্রমেই বাড়ছে আযাদীপ্রিয় জাতির মশালবাহীদের ভীড়। যামানার বুক চিড়ে বিশ্বের খিত্তায় খিত্তায় জেগে উঠছে শতবছর ধরে নির্যাতিত মুসলমানদের জিহাদী স্পৃহা। মজলুম জাতির নওজোয়ানেরা খুঁজে ফিরছে নিজেদের হারানো ঐতিহ্য। দুনিয়া জুড়ে বাতিলের সামনে সীনা টান করে দাঁড়াচ্ছে মুহাম্মদী সিংহ শাবকেরা। ইসলামী বিশ্বে বয়ে যাচ্ছে বিপ্লবের ঝড়ো সমীরণ। গরম হচ্ছে জিহাদের ময়দান। নওজোয়ানেরা সেজেগুজে দৌড়ে যাচ্ছে হুরদের দিকে। মায়েরা জোয়ান ছেলেদেরকে কুরবানী দিচ্ছে আল্লাহর নামে। লেখা হচ্ছে বাহাদূরী আর বীরত্বের নতুন ইতিহাস। দিক-দিগন্ত থেকে পঙ্গপালের মতো বদলা নিতে ছুটে চলছে জিহাদের স্বর্গরাজ্য আফগান, সিরিয়া আর ইরাকসহ মজলুম খিত্তাগুলোতে।

কিন্তু আমরা বাংলা ও হিন্দুস্তানের মুসলিম জাতি দাজ্জালী গণতন্ত্রের নেকাব লাগানো দুনিয়ার সেরা ধোকাবাজদের সামনে দণ্ডায়মান। গোলামীর শৃঙ্খল আর পৈতা ওয়ালা ব্রাক্ষনদের প্রতারণা আমাদের স্মরণশক্তির উপর বিছিয়ে দিয়েছে অচেতনতার চাদর। দিল্লির জামে মসজিদ, লাল কেল্লা, কুতুব মিনার আর সোমনাথ মন্দীরের ইতিহাসও আজ আমাদের ঐতিহ্য মনে করাতে পারছে না। বাবরী মসজিদ, গুজরাট আর শাপলা চত্তরের রক্ত আমাদের বুকে শেল হয়ে বিঁধছে না। যে জাতির নারীদেরকে আমরা ইযযত দিয়েছি, সেই জাতি আজ ভরা বাজারে আমাদের ইযযতের নিলাম করে ফিরছে। অথচ আমরা দুই সেজদা আর গরু কুরবানীর অনুমতির জন্য কেঁদে মরেও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছি বলেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। ভুলে গেছি দারুল হারব আর দারুল ইসলামের মাসআলা। অথচ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. হিন্দুস্তানকে সেই সময় দারুল হারব ফতোয়া দিয়েছিলেন, যখন দিল্লির মসনদে মুসলিম বসা ছিলো। আদালতের আইন কানুন কাজীদের হাতেই ছিলো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সব ধরণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিলো। দুই ঈদ, জুমা এবং আযানের ব্যাপারেও কোনো আপত্তি ছিলো না। সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সায়্যিদ আহমদ

শহীদ রহ., শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এবং মাও. আব্দুল হাই রহ.সহ সকল খোদাপ্রেমিকরা ছুটে গিয়েছিলেন বালাকোটের প্রান্তরে। বিশ্ববাসী দেখেছে, চাটাইয়ের উপর উপবিষ্ট জীর্ণশীর্ণ দেহ আর সম্বলহীন মোল্লা মৌলভীরা তোপ-কামান উঠিয়েছেন। নিজেদের ইলমের মান রাখতে ঘর-বাড়ী, বিবি-বাচ্চা, বড় বড় দীনি মজলিস সবকিছুকে আল বিদা বলে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসের দরস ছেড়ে কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান হেফাজত করতে দাঁড়িয়ে গেছেন। ভুলে গেছেন কে শায়খুল হাদীস, কে শায়খুত তাফসীর, কে কুতুব আর কে আবদাল? নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহ তা'আলার মানশা পূর্ণ করতে ধূলি মলিন হয়েছেন। কাদায় লুটোপুটো খেয়েছেন। শুকনো বাসি রুটির উপর দিন কাটিয়েছেন। ক্ষুদা সহ্য করেছেন। ভর্ৎসনাকারীদের ভর্ৎসনা সহ্য করেছেন। কুরআন হাদীস থেকে 'হেকমতে আমলী' আর 'মাসলাহাতপছন্দী'র সবকদাতাদের জবাব দিয়েছেন। গাদ্দারী, অকৃতজ্ঞতা আর ঘর-বাড়ীর বিচ্ছেদ সহ্য করে অবশেষে এই মহান ব্যক্তিদের কাফেলা বালাকোটের ময়দানে নিজের শেষ সম্বল জানটুকুও রব্বে কায়েনাতের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী দিয়েছেন। আজ আমরা দীনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার বাহানা করছি। অথচ ইসলামের শেয়ারগুলো (ধর্মীয় নিদর্শন) হেফাজত করা-ই দীনের সবচেয়ে বড় খেদমত। তার জন্য নিজের ঘর, নিজের মাদরাসা এমনকি নিজের মাতৃভূমিও ছাড়তে হলেও।

বিবেককে প্রশ্ন করুন, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এর মতো মুহাদ্দিসের কি এতটুকু অনুভূতি ছিলো না, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর ফতোয়া কতটুকু মসিবত বয়ে আনবে? তাঁর কি জানা ছিলো না, এই পদক্ষেপে হিন্দুস্থানের মাদরাসাগুলোর প্রত্যেকটা ইট ইংরেজরা খুলে নিবে? কিন্তু তারপরও কোন ব্যাথায় দিল্লিতে দীনের মহা খেদমত আঞ্জামদাতা মাদরাসাগুলোকে দুশমনের তোপের নীচে রাখলেন? উম্মতের হীরাগুলোকে একত্রিত করে কেনো শহীদ করালেন? আমার মতো স্বল্পজ্ঞানী লোক যখন আকাবেরের ইতিহাস অধ্যয়ন করি এবং বর্তমানের অবস্থা পর্যবেক্ষন করি, তখন অন্তর সামনে সফরের পরিবর্তে অতীতের দিকে ছুটে যেতে চায়। আজ নিজেদেরকে কাসেম নানুতবী আর মাহমুদ গজনবী রহ. এর

মাপকাঠিতে পরখ করার সময় এসেছে। মুহাম্মদী কষ্টি পাথরে যাচায় করতে হবে, আমাদের এবং সলফে সালেহীনদের পথ ও কর্মপদ্ধতীতে কতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে? এই পার্থক্য কেবলই শাখাগত? নাকি বুনিয়াদী ভাবেই দূরে সরে গেছি? কেবল কর্মপদ্ধতীতেই মতানৈক্য, নাকি উদ্দেশ্য মিশন সবই উলট পালট হয়ে গেছে? উদ্দেশ্য এবং মিশন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদেরকে কুরবানী করছি, নাকি নিজেদের জন্য উদ্দেশ্য এবং মিশন কুরবানী করা হচ্ছে? নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আগ্রহ বাকী আছে, নাকি বেঁচে যাওয়ার তামান্না দীলে বাসা করে নিয়েছে? বালাকোটের প্রেরণা আর শামেলীর স্পৃহা দীলকে উত্তপ্ত করে, নাকি লণ্ডন ওয়াশিংটনের নিমন্ত্রণ দীনের খেদমতের নতুন তাকাযা শিখিয়ে দিয়েছে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিবর্তে মাসলাহাত আর কল্যাণ তো জায়গা করে নেয়নি?

বাংলা ও হিন্দুস্তানী মুসলিম ভাইদেরকে একটা প্রশ্ন করতে মন চাচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানের মতো আপনিও কি ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছেন? যদি ইমাম মাহদী এসে পড়ে, তাহলে আপনি কী করবেন? দেশের সঙ্গ দিবেন, নাকি ইসলামের সঙ্গ দিবেন? ইমাম মাহদীর সাথে মিলে বাংলা ও ভারতী সেনাবাহিনীর মুকাবেলা করবেন, নাকি হেকমত আর মাসলাহাত সামনে নিয়ে ফায়সালা করবেন? ইমাম মাহদীর সাথে মিলেই যদি জিহাদ করেন, তাহলে সেই জিহাদের হুকুম এখনও আছে। বাংলা ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্য নিজেদের আগামী প্রজন্মকে মুসলমান করে রাখার জন্য হিন্দুদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। অন্যথায় ধীরে ধীরে হিন্দুদের বিষ শিরায় শিরায় রক্ত হয়ে দৌড়তে থাকবে। আপনি নিজের মুখে যতই দাবী করতে থাকুন যে, বাংলা ও হিন্দুস্তানে আপনার সব রকমের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, আপনাকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তানের বাহিরে আপনার অপদস্ততা দেখে গোটা বিশ্ব আফসোস করছে। আপনার অধঃপতনের উপর ছাঁপা রিপোর্টগুলো পড়ে তো এমন মনে হয় যে, আপনাকে শূদ্র খাসী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। আসুন অতীতকেই ফিরিয়ে আনি। আলোচনা-পর্যালোচনা রাখুন। শাহ আব্দুল আযীয রহ. যেসব কারণে এই উপমহাদেশকে দারুল হারব

ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলো অধ্যয়ন করুন। বাংলা ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতনের চিত্র দেখুন। জেগে উঠুন, জাগিয়ে তুলুন। বিশ্ব কাঁপানোর মিছিলে শরীক হয়ে যান। মজলুম হওয়ার দিন শেষ। এবার বদলা নেবার পালা।.....

মাওলানা আছেম উমর সাহেবের বাচনভঙ্গির এই সাবলীল ধারা বজায় রাখতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি গোটা গ্রন্থের পাতায় পাতায়। কিন্তু যোগ্যতার দৈন্যতা বরাবরই বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে। তবুও জখমী দীলের তড়পানো প্রয়াস যদি কোনো একটা হৃদয়কে কালো পতাকার মিছিলে শামিল করতে পারে, সেটাই হবে চরম ও পরম পাওয়া। মাওলানা আছেম উমর সাহেবের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তার হৃদয় নিংড়ানো আবেগ আর চেতনায়ে তাওহীদের ভিত্তিতে উম্মতে মুহাম্মদীকে জাগরণী লেখা উপহার দেয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ, মুফতী মোহাম্মাদ মোসাদ্দেক সাহেব দা.বা. এর প্রতি, যার প্রেরণা আর ঘুমিয়ে যাওয়া বিবেককে বারবার জাগ্রত করার ফলে গ্রন্থটি আপনাদের হাতে।

অবশেষে সবার কাছে দু'আ চাই রব্বে কায়েনাত যেনো এই অধমকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র জন্য কবুল করেন। দুনিয়া জুড়ে লাড়াইরত মুজাহিদীনকে বিজয় দান করেন। মুসলিম জাতির ঐক্য আর ঐতিহ্য ফিরিয়ে দেন। সেই সাথে শাপলা চত্ত্বরের শহীদদের স্মরণে এই ক্ষুদ্র নজরানাকেও কবুল করেন। আমীন।

-ছানা উল্লাহ সিরাজী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। যিনি তার বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবিয়্যুনা, হাবিবুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

এক হিন্দুস্তানি মুসলমানের সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের পর এ বিষয়ে লেখার আগ্রহ জাগলো। কথোপকথনের বিষয়বস্তুটা ছিলো, 'বার্মোডা ট্রায়েঙ্গেল এবং দাজ্জাল' নামক পুস্তকে লিখিত হিন্দুস্তানের ব্যাপারে কিছু কথা। সেই পুস্তকে লিখাছিলো, কোন পাকিস্তানি ভারতে গেলে ফিরে এসে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়, অথচ কয়েকদিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে হিন্দুয়ানী মন-মানসিকতার কিছুই সে বুঝতে পারে না। সেই পুস্তকে গযওয়ায়ে হিন্দ এবং ভারত জয়ের ব্যাপারে লিখিত কথাগুলোও তার পছন্দ হয়নি। মূলত তার অসন্তুষ্টির কারণ ছিলো দেশপ্রেম। তাই আমি তাকে 'দেশপ্রেম এবং ইসলাম' এই বিষয়ের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো এ বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাও তার ছিলো না। যার ফলে সে আমার কথাগুলো বুঝলো না। তাই আমি তাকে প্রাথমিক ভাবে এই কথা বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, ইসলামে মহব্বত-ঘৃণা এবং দোস্তি-দুশমনির মাপকাঠি কী? ইসলামে এর গুরুত্ব কতটুকু? এটি ছাড়া একজন মুসলমানের ঈমানের অবস্থান কোথায়? যদি দুটি মাপকাঠি একটি অপরটির মুকাবেলায় এসে যায়; একদিকে ইসলাম অপর দিকে যে কোনো বিষয়, যেমন মাতা-পিতা, সন্তান, গোত্র, জাতি অথবা জন্মভূমির মহব্বত, তাহলে ইসলামের মুকাবেলায় যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা ঈমানকে সঙ্কায় ফেলে দিবে। ইসলামের এই বুনিয়াদি চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক ভাবে এবং সবখানে গাফলতি পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অনেক দীনদার! লোকেরাও ইসলামের মুকাবেলায় বংশ, গোত্র এবং জন্মভূমিকে প্রাধান্য দেয়। উপরন্তু এটিকে তারা গুনাহ মনে করে না। অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাগত মাসআলা। যেটি ইমামগণ আকীদার কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। যেই আকীদার কারণে

আমাদের সলফে সালেহীন দোররার আঘাত সহ্য করেছেন, জেল খেটেছেন এবং জীবন দিয়েছেন। যেই অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত থাকবে তার অন্তরে আল্লাহর বন্ধুদের মহব্বত থাকবে এবং আল্লাহর দুশমনদের ঘৃণা থাকবে। যেমন ভাবে একটি অন্তরে ঈমান এবং কুফর একত্রিত হতে পারে না, ঠিক তেমনি একটি অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এবং আল্লাহর দুশমনের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না। একই বিষয় কার্যকর হবে আল্লাহর বন্ধুদের ব্যাপারেও। জন্মভূমির উপর যদি ইসলামকে প্রাধান্য দেয়া না হয়, তাহলে ইমাম মাহদী আ. এর সাথে কিভাবে শামিল হবে? মুসলিম ভুখন্ডগুলোর শাষকবৃন্দ অথবা ভারত যদি ইমাম মাহদী আ. এর বিরোধী বিশ্ব ঐক্যে শামিল হয়, তাহলে এমতাবস্থায় মুসলমান কী করবে? দেশপ্রেমের মূর্তীকে ভেঙ্গে দিবে, নাকি ইসলাম ছেড়ে দিবে? এ দুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বেছে নেয়ার সুযোগ থাকবে। এই অবস্থাকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলার মদদ চেয়ে এই বিষয়ে লেখার ইচ্ছে করি। যেহেতু ফেতনা এবং ইমাম মাহদী আ. এর ব্যাপারে দলিল প্রমাণগুলো আগেই মওজুদ ছিলো, তাই সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে সেসব দলিল প্রমাণ এই পুস্তকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

'ইমাম মাহদীর দোস্ত দুশমন' এখন আপনার হাতে। প্রমাণাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমি আধিক্যতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি। তাই ফেতনার ক্ষেত্রে সেসব হাদীস উল্লেখ করেছি যেগুলো ইসলামী চালচলনে সামনে আসে। পুস্তকটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এক. ফেতনার বর্ণনা

এতে বিভিন্ন ইহুদী জাদুকর ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে কথাটি বুঝানো উদ্দেশ্য সেটির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এই অধ্যায়ে ফেতনার ব্যাপারে একটি আলোচনা রয়েছে। যদি অলসতার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে হাদীসগুলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হবে। তাই বিভিন্ন হাদীস সামনে রাখলে কথাগুলো বুঝতে সহজ হবে।

দুই. হক পথের মুসাফির

এই বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। ইসলামের ইতিহাস সেসব আল্লাহ ওয়ালাগণের নামে ভরপুর, যাদের আলোচনা ঈমানদারদের জন্য অন্তরের প্রশান্তি ও দৃঢ়তায় শক্তি যোগায়। এই অধ্যায়ে সলফে সালেহীনের আলোচনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কলম তার আপনগতিতে কালি ঢেলেছে। যদি শব্দ চয়নে কোনো ভুল হয়ে থাকে, তালেবে ইলম মনে করে ক্ষমা করবেন। তবে এটাও আপনাদের মহব্বত যে, কলম জযবায় এসে কালি ঢেলেছে। তাদেরকে টার্গেট বোর্ডে এমন ভাবে নিশানা বানানো হচ্ছে যেমন ভাবে শিকারী তার শিকারকে বাছায় করে করে নিশানা বানায়।

তিন. ইমাম মাহদী আ. এর ব্যাপারে

এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে। পুস্তকে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, সেসবের পর্যালোচনাও লেখা হয়েছে। আর যেগুলো উলামায়ে কেরামের রায়, সেগুলোকে রায় আকারেই লেখা হয়েছে। সুতরাং পাঠকগণ কেবল সেসব হাদীসকেই প্রমাণ মনে করবেন, যেগুলো প্রমাণ হওয়ার যোগ্য। আর যেগুলো রায়, সেগুলোকে রায় হিসেবেই বর্ণনা করবেন। আমার জ্ঞানস্বল্পতার ব্যাপারে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই। সুতরাং পুস্তকে যে ভুলই হোক তা আমার জিম্মায় দিয়ে দিবেন। আর যদি আমাকে অবগত করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দিবেন। এই পুস্তকটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার দয়ায় আপনাদের হাতে এসেছে। অন্যথায় আমার অবস্থা হলো, তাঁর সাহায্য ছাড়া একটি শব্দও লিখতে সক্ষম নই। যেসব বন্ধু-বান্ধব এ ব্যাপারে সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আর ঈমান পিপাসার এই যুগে শাহাদাতের পেয়ালা পান করান। আল্লাহ তা'আলার নিকট আকুতি, এই পুস্তককে ঈমানদারদের জন্য উপকারী করুন এবং হকের জন্য অন্তর খুলে দিন। আমীন।

সবশেষে আমি মুহতারাম মুফতী আবু লুবাবা শাহ মানসূর সাহেবের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, তিনি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ

দিয়েছেন। যা আমার খুবই উপকারে এসেছে। আমার চেষ্টা এটাই যে, আমার কলম যেনো সলফে সালেহীনের হক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। সেজন্য সম্মানিত উস্তাদগণের নিকট দরখাস্ত, লেখককে তালেবে ইলম মনে করে ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিবেন। এই গুনাহগারের জন্য এখন আপনাদের দু'আর যতটুকু প্রয়োজন, সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনো ছিলো না। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাদের দু'আতে আমাকে শামিল করবেন। বিশেষত সেসব আল্লাহ ওয়ালাগণ, যারা রণাঙ্গনে আছেন এবং তাহাজ্জুদে হাত উঠান। আল্লাহ তা'আলা যেনো হক ওয়ালাদের সাথে শামিল করেন, তাঁদের সাথেই শাহাদাত দেন এবং তাঁদের সাথেই কেয়ামতের দিন উঠান। আমীন।

আপনাদের দু'আর মুহতাজ
আছেম ওমর

বর্তমান থেকে ভবিষ্যত

মুফতী আবু লুবাবাহ শাহ মানসূর দা.বা.

মাহদিয়াত একটি স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু। এর উপর কাজ করনেওয়ালা ব্যক্তি আকাবেরগণের মধ্যমপন্থা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তাকলীদ থেকে বিচ্যুত হলে বিপদজনক ভুল এবং গোমরাহীর শিকার হতে পারেন। আমি নীচে এমনই কিছু ভুলের আলোচনার প্রয়াস চালাবো। তারপর কিতাবের বিষয়ে ফিরে আসবো এবং কিছু কথা পেশ করবো।

অধিকাংশ লোকই এ বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। তারা এর স্পর্শকাতরতা এবং পুলসিরাতসাদৃশ পরীক্ষাক্ষেত্র মনে করে আলোচনার বিষয়বস্তুই বানান না। তারা এ ব্যাপারে কখনো কিছু বলেনও না লিখেনও না। তারা এতেই নিরাপত্তা মনে করে যে, 'দরিয়াতে অনেক উপকার রয়েছে, যদি নিরাপত্তা প্রার্থী তীরে থাকে।' এ কথা স্পষ্ট যে, এতে হক ওই ধূলোর নীচে ঢাকা পড়ে, যা মূর্খতার পতাকাবাহীর আড়াল থেকে দৃশ্যমান হয়। এর ক্ষতি তখনই প্রকাশ পায়, যখন আকস্মিক কোনো মিথ্যা দাবীদারের দাবি এবং দাওয়াতের কামিয়াবীর খবর আসে। মানুষ বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে, সহজেই মিথ্যাবাদীদের ধোঁকায় পড়ে যায়। ফলাফল এই দাঁড়ায়, ইতিহাসে আরো একটি দুর্ঘটনার সংযোজন হয়। আর কেউ কেউ এই বিষয়ে আলোচনা করেন, লেখালেখি করেন এবং কথাও বলেন, তবে তা গা ছাড়া ভাবে। কিন্তু এ বিষয়টিকে নিছক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার হিসেবে পেশ করেন। অর্থাৎ এটিকে আসমান যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত রেখে শুধু ধারণাপ্রসূত বর্ণনা করেন। যমীনের বাস্তবতা অর্থাৎ যুগের সামঞ্জস্যতা থেকে এতো দূরে রাখেন যে, পাঠক বা শ্রোতা এটিকে কয়েক শতাব্দি দূরের কোনো কাল্পনিক ঘটনা মনে করেন। তাদের ধারণা, তার অথবা তার পরবর্তী বংশধরের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং না সে নিজের সংশোধনের প্রয়োজন মনে করে, না তার সাথে সম্পৃক্ত সেসব লোককে ফেতনা থেকে বাঁচানো প্রয়োজন মনে করে, যাদের ঈমানে ঘুণ ধরেছে এবং আমল ছেড়ে দেয়াকে অভ্যাসে পরিনত করেছে। আল কাদেরীজাতীয় কিছু টাইটেলদারী

লোক এই বিষয়ের গবেষণার ঘোষণা দিয়ে দেয়। যখন দুনিয়াবাসী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন নিজের গবেষণার ফলাফলে এই কথা বলে যে, হযরত মাহদী আ. এর যুগ আরো কমপক্ষে ছয়শত বছর দূরে। প্রথম প্রশ্ন তো হলো, যেহেতু হাদীস শরীফে সময় নির্ধারণ করা হয়নি, সুতরাং অন্যরা কিভাবে তা নির্ধারণ করবে? দ্বিতীয় কথা হলো, মুসলমানদের উপর যে প্রাণনাশা যুগ এসেছে এবং কাফেরদের যে সার্বিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে, এর সমাপ্তি মনে হয় না কোনো বড় এবং বিশ্ব নেতা ছাড়া সম্ভব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটা ইমাম মাহদীই হবেন। তাঁর আগে কারো হাতে এতো বড় সফলতার সম্ভাবনা দেখা যায় না। খেলাফতের পতনের ১৯২৪ সালের একশত বছর আগে থেকে মুসলমান জুলুম এবং নির্যাতনের শিকার। খেলাফতের পতনের একশত বছর পর তো তাদের পশ্চাদগামী আর পতনের কোনো সীমানাই থাকলো না। খেলাফতের অধঃপতন থেকে পতন পর্যন্ত এবং পতন থেকে আজ পর্যন্ত দু'শত বছর হয়ে গেলো। এরপর আমরা কি এ কথা মেনে নেবো যে, কঠিন থেকে কঠিনতর কুরবানী সত্ত্বেও আরো ছয়শত বছর কষ্ট ও লাঞ্চনার শিকার হতে থাকবো আর কাফেরদের কর্তৃত্ব আটশত বছর বাকী থাকবে? দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অবস্থা প্রত্যেক ভূখন্ডে, প্রত্যেক ময়দানে এমন হওয়া সত্ত্বেও কিছুই হবে না? না। কখনোই নয়। খোদার কসম কখনোই হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাস এবং ফেতনার হাদীসের উপর নজর রাখনেওয়ালা ব্যক্তি, যিনি যুগ পরিবর্তনের খোদায়ী নিয়ম সম্পর্কে অবগত, অর্থাৎ যিনি আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহ অধ্যয়ন করেন, রাসূলগণের সংবাদের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখেন, সে তা মেনে নিতে পারেন না। এটা তো দুশমনের যবান এবং দুশমনের সৈন্যদলকে উৎসাহী করে। কিছু লোক এই বিষয়টিকে যদি আলোচ্য বিষয় হিসেবে নিয়েও ফেলে, তাহলে তার প্রত্যেক শাখার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনা এবং তাফসীর করাকে নিজের উপর বাধ্য করে নেন। তারা এই কথা দেখেন না যে, 'যা আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও অস্পষ্ট রাখ' এই নিয়মের ভিত্তিতে এর যতগুলো ব্যাখ্যাই করেন না কেনো, তার মধ্যেও কোনো না কোনো অস্পষ্টতা থেকে যাবে। এমনকি মাও. বদরে আলম মিরাঠী রহ.

এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী তো খোদ মাহদী আ.ও একটা সময় পর্যন্ত জানবেন না যে, তিনিই শেষ যামানার মাহদী আ.। আর যখন কোনো না কোনো অস্পষ্টতা থেকেই যাবে, তখন প্রত্যেক জিনিসের বাধ্যতামূলক বিশ্লেষণ করা কিভাবে জরুরী হতে পারে? এটিতো সঠিকও হতে পারে না। এসব অসাবধান এবং অতিচালাক লোকেরা যেখানে একদিকে সীমাবদ্ধ তবীয়তের আলেমদেরকে এই বিষয় থেকে দূরে থাকতে এবং যবান ও কলম চালাতে সতর্ক থাকতে বাধ্য করেছে, সেখানে এই প্রভাব পড়েছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈরাশ, কাপুরুষতা এবং অনির্ভরতা জন্মেছে। এখন সাধারণ লোক হককেও সন্দেহেরে দৃষ্টিতে দেখে।

মাও. আছেম ওমর সাহেব দা.বা. (আল্লাহ তা'আলা তার ইলম এবং হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন) কাটা থেকে আঁচল বাঁচিয়ে এই কাটাঘেরা পথে চলার চেষ্টা করেছেন। এই অক্ষম এবং স্বল্প জ্ঞানের জানা অনুযায়ী ফেতনার হাদীসের উপর আরব এবং আযমে যারাই কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে এই মাওলানার কাজ ব্যতিক্রম এবং প্রশংসাযোগ্য। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রজ্জ্বলিত আলোর মাধ্যমে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যাওয়ার রাস্তা সাবধানী দৃষ্টিতে দূর পর্যন্ত দেখা, যাচায় করা, পরখ করা, পাঠকদেরকে অবগত এবং সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। কোথাও প্রকাশ্য শব্দ চয়ন এবং কোথাও চাপা শব্দের মাধ্যমে, বর্তমান যামানার ফেতনা এবং ফেতনার অবস্থা অনুধাবনের পরিপ্রেক্ষিতে আগত ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। বর্তমান লেখকগণের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনাকে ইহুদী এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার সাথে সম্পৃক্ত করার মতো বর্ণনাকারী তো কিছু না কিছু আছেন, কিন্তু কথা যখন আফগানিস্তান, পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্তানের ব্যাপারে আসে, তখন জ্ঞানস্বল্পতা, দূরদৃষ্টির অভাব অথবা সাহসিকতার অভাবে যবান বন্ধ হয়ে আসে। মাওলানা সাহেবের প্রথম পুস্তক 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল' এই নিরবতার পর্দা ছিড়ে ফেলেছে এবং এরপর থেকে এই বিষয়ের উপর তিনি ধারাবাহিক প্রয়োজনানুপাতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজের মধ্যে পুরাতন কিতাবাদি থেকে গবেষণা এবং প্রমাণাদি উল্লেখ রয়েছে। তেমনি নিত্য নতুন অজানা বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ এবং সেসব থেকে পূর্ণ ফায়দা

উঠানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। এটি বিরল, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আভিজাত্যের প্রমাণ। এই অক্ষম দীল থেকে দু'আ করছি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাস্থ্য, মেজায, স্বাদ, যবান এবং কলমের নিরাপত্তাকে বিজয়ী করুন। তাঁকে সুস্থতা, সুন্দর মন এবং সত্য যবান দান করুন। তার ঘাম ঝরানো অণুসন্ধান এবং হৃদয় নিংড়ানো ব্যাখ্যার মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে উপকৃত করুন। ফেতনার এই যুগে কাটাঘেরা উপত্যাকা পেরিয়ে মুসলিম উম্মাহকে যুগের ফেতনা থেকে সতর্ক করার যে বোঝা কাঁধে নিয়েছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলা কামিয়াব করুন।

সবশেষে লেখকের নিকট একটি দরখাস্ত এবং পাঠকের নিকট একটি। লেখকের নিকট দরখাস্ত হলো, মধ্যমপন্থা, সতর্কতা, বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পৃক্ততা এবং সলফে সালেহীনের তাকলীদের আঁচল ছাড়বেন না। এর মধ্যেই নিরাপত্তা, গ্রহণযোগ্যতা, বরকত এবং উপকারিতা নিহিত। আলেম এবং পাঠকদের নিকট দরখাস্ত, মানুষ যখন কোনো অজানা বিষয়ে কাজ করে, সেটি আবার এমনিতেই স্পর্শকাতর বিষয় হয়, তখন তাতে দু'একটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতই থাকে। যখন কারো দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক থাকে, অবগত করার পর সংশোধন হওয়ার ওয়াদা করে, তখন সকল আলেমের উচিত তার ভালো দিকগুলো গ্রহণ করা এবং অন্তরকে প্রশস্ত করা। তার ভুলগুলো সম্পর্কে তাকে অবগত করা। যতক্ষন পর্যন্ত কারো কাজে ভালো দিকটাই বেশি হয়, ততক্ষন পর্যন্ত তার বিরোধীতা, ত্রুটি অন্বেষণ এবং ভরা মজলিশে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। সেই সাথে তার কাজ সংশোধন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্য আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করা। তাহলে ফেতনার এই যুগে সেটাই হবে উম্মতের সর্বোত্তম খেদমত। ইনশাআল্লাহ। হেদায়াত দেয়ার মালিক আল্লাহ তা'আলাই। আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার হেদায়াতের মুহতাজ। দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত স্বত্ত্বা একমাত্র তিনিই। আমরা সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনশীল।

প্রথম অধ্যায়
ফেতনার বর্ণনা

ফেতনাসমূহের ব্যাপারে কেনো গাফেল?

বহুকাল থেকে ইসলামী বিশ্ব নানা রকম ফেতনার শিকার হয়ে আসছে। যারমধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্গত সবধরণের ফেতনাই রয়েছে। এসবের মধ্যে এমন কিছু ফেতনা ছিলো, যেগুলোর প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসে হয়েছে। আবার এমন কিছু ফেতনাও ছিলো যেগুলোর প্রতিক্রিয়া আমলের মধ্যে হয়েছে। কিছু ফেতনা মুসলমানদের দেহে প্রতিক্রিয়া করেছে, আবার কিছু ফেতনা মুসলমানদের অন্তরকে আক্রান্ত করেছে এবং কাপুরুষতা, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। আবার কিছু ফেতনা এমন ছিলো, যেগুলো আমাদের পারিবারিক চাল-চলনকে উলট-পালট করে দিতে চেয়েছে। কিছু ফেতনা ঘরের খায়ের-বরকত উঠিয়ে নিয়েছে এবং কিছু ফেতনা পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে। বাবা ও ছেলে অপরিচিত হয়ে গেছে। মা ও মেয়ের মধ্যে মায়া-মমতা বাকি থাকেনি। কিছু ফেতনা উলামায়ে কেরামের উপর এসেছে আর কিছু মুসলমান ব্যবসায়ীদের উপর এসেছে। এসব ফেতনা ইবলিশ এবং তার জিন ও মানবরূপী চেলারা জানতোড় মেহনত করে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়েছে। সেসবের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের প্রতিরক্ষা শক্তি অনুযায়ী হয়েছে। আমরা এসব ফেতনাকে চক্রান্ত নামে জানি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোকে বিভিন্ন ফেতনা নামে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম বিরোধী চক্রান্তে ইতিহাস ভরপুর। এসবের কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার আঘাতে আজও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দেহ থেকে ব্যাথার গোঙ্গানি উঠে। এসব ফেতনা এবং চক্রান্ত উম্মতের পশমে পশমে, জোড়ায় জোড়ায় এমন আঘাত হেনেছে যে, দেহের প্রত্যেক অঙ্গে ফোড়ার মতো ব্যাথা অনুভব হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ফেতনার আলোচনা করেছেন এবং খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। ফেতনার নাম বলেছেন। ফেতনা সৃষ্টিকারীর নাম বলেছেন। এমনকি তার বাবার নাম বলেও উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কোন্ ফেতনার মধ্যে কী প্রস্তুতি নিতে হবে সেগুলোও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করতে গিয়ে সলফে সালেহীন

সেসব ফেতনার ব্যাপারে স্বতন্ত্র কিতাব লেখেছেন। ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে, ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিম শরীফে এবং অন্যান্য সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম কিতাবুল ফিতান পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছেন। উম্মতের উলামায়ে কেরাম প্রত্যেক যুগে মুসলমানদেরকে বিপদ ও হুমকি সম্পর্কে হাদীসের আলোকে সতর্ক করেছেন। যাতে মুসলমানগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আইনি রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করতেন। সেগুলো আসার আগেই তিনি জানতেন। আর এটা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণসমূহের একটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সেসব পেরেশানকারী ফেতনা আসার আগেই নেক আমলে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছেন, যেগুলো অধিক পরিমাণে দল বেঁধে আগত। তিনি বলেন, তোমরা ফেতনার মুকাবেলায় নেক আমলে প্রতিযোগিতা কর।

বর্তমান যামানায় ফেতনা এমন ভাবে আসছে, যেমন ভাবে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফেতনার অন্ধকার এতই প্রবল যে, অমাবস্যার আঁধার রাতের মতো হাতও দেখা যায় না। ফেতনাই ফেতনা। যেমন মালের ফেতনার কথা-ই ভাবা যাক, এই ফেতনা মানুষকে এমন ভাবে বেষ্টন করে নিয়েছে যে, মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে মালকেই মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, বহু দীনদারেরও ধারণা হলো, অধিক মাল যিন্দেগীর জন্য এমনই জরুরী, যেমন বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস জরুরী। তাছাড়া মিথ্যার ফেতনা আছে। আল্লাহর পানাহ, মানুষ মিথ্যার জালে এমন ভাবে আবদ্ধ যে, তারা বাতিলকে হক এবং হককে বাতিল মনে করে বসে আছে। নারীর ফেতনা আছে। যার ঠকঠকানি বন্ধ দুয়ারকেও প্রকম্পিত করে রেখেছে। ধীরে ধীরে অন্তরসমূহ থেকে অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা উঠে যাচ্ছে। মুসলমান নিজের চোখে অশ্লীললতা হতে দেখছে, কিন্তু তার ঈমান তাকে এই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার হোতাকে দেখে নিতে উত্তেজিত করছে না। এসব ফেতনা থেকেও বড় ফেতনা দাজ্জালের ফেতনা। সলফে সালেহীনের তুলনায়

আমরা মানব ইতিহাসের এই ভয়ানক ফেতনার নিকটবর্তী এসে গেছি। এতদসত্ত্বেও যদি এখন এই ফেতনার আলোচনার সময় না আসে, তাহলে আর কবে আসবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলোকে মানুষের নিকট পৌছানোর সময় যদি এটি না হয়, তাহলে সেটা কখন? উম্মত যখন গর্দান পর্যন্ত ফেতনায় ডুবে গেছে তখনও যদি তাদেরকে নূরে নবুওয়াতের কিশতিতে আরোহণ করানো না হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে? আঁধার রাতে বিজলী চমকাচ্ছে, বজ্র গর্জন করছে। পেরেশান এবং পথহারা এই উম্মতকে এখনও যদি উলামায়ে হক আঙ্গুল না ধরেন, তাহলে কে তাদেরকে পথ দেখাবে? যেসব পশ্চিমপন্থী আলেমের রূপ ধরে ধোকার মঞ্চে বসে আছে তারা? নাকি তারা, যাদের মজলিসে শয়তান হাজির হয়? নাকি সেসব লোক, যাদের যবানে যাদু আছে? অথচ তাদের সবার উদ্দেশ্য এই উম্মতকে হক পথ থেকে সরিয়ে নেয়া। উম্মতকে সঠিক পথ দেখানো এবং কাফেলায়ে মুহাম্মাদীকে ডাকাত দল থেকে হেফাজত করা উলামায়ে হকের উপর ফরজ। তারাই এর উপযুক্ত যে, এই বিষয়ে কলম উঠাবে এবং উপত্যাকার নিরবতা ভাঙ্গবে। মানুষদেরকে এ কথা বলা অবস্থার দাবি যে, ভয়ে ভয়ে, চুপচাপ, নীরবে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাইলে যিন্দেগীর শ্বাস বেড়ে যায় না। হক কথা বললে, দাজ্জালকে দাজ্জাল বললে নির্ধারিত শ্বাস দুনিয়ার কোনো শক্তি কমাতে পারে না। যতটুকু আরাম আয়েশ এবং পেরেশানি ভাগ্যে আছে, তাতো লেখা হয়ে গেছে। তা ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি মিলেও বদলাতে পারবে না। বান্দার সবকিছু তার মাওলার জন্য হয়ে যাবে, তাতেই তো কামিয়াবি। চাই তা মহব্বত হোক অথবা ঘৃণা হোক। সুযোগ হোক অথবা পরীক্ষা হোক। সবকিছুই আল্লাহর জন্যই হবে। মনে রাখতে হবে, এই নতুন টেকনোলজির যুগেও সকল বিষয় কেবলই সেই প্রতিপালকের ইচ্ছাধীন, যার বাদশাহীতে আমেরিকাও শরীক নয় এমনকি কানা দাজ্জালও শরীক হতে পারবে না। জীবন মরণের শক্তি সি.আইকে দেয়া হয়নি। ব্লাক ওয়াটারও তা উভয় জাহানের প্রতিপালকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। দুনিয়ার বিপদ-আপদ এবং পরীক্ষা সবই সাময়িক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কুরবানী সম্পর্কে গাফেল

নন। জালেমদের রশি লম্বা হতে দেখে কেউ যেনো এ কথা মনে না করে যে, সে আরশ কুরছির বাদশাকেও অক্ষম করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান এবং সকল হেকমতের আঁধার। দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। ফেতনার জায়গা। এখানে সে-ই বাঁচতে পারে যে ফেতনাগুলো থেকে দূরে দূরে চলে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কাটাঘেরা জঙ্গল দিয়ে হেটে যাচ্ছে। যার দুই পাশে কাটার ঝোঁপ। বাকে বাকে বিপদ ঘাপটি মেরে বসে আছে। সৌভাগ্যবান সেই লোক, যে নিজে কাটার ঝোঁপ থেকে বেঁচে থাকে এবং অন্যকেও বাঁচিয়ে মঞ্জিলের দিকে পথ চলে। সফরও চালু রাখতে হবে এবং কাটা থেকেও বাঁচতে হবে। সাবধান থাকতে হবে, যেনো কাটার ঝোঁপে পড়ে না যায়। আবার এই ভয়ে বসেও থাকা যাবে না যে, যদি কাটা লেগে যায়। কারণ, মঞ্জিলে পৌছাও জরুরী। তাই পথ চলতে হবে। তবে তা ঘাপটি মেরে বসে থাকা ফেতনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে।

এখানে সেসব ফেতনা বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি, বর্তমান ইসলামী বিশ্ব যেগুলোর মুকাবেলা করছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা উচিত যেনো তিনি তার রহমতে আমাদের সবাইকে ঢেকে নেন। সবধরণের ফেতনা এবং তার কারণ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। হাত ধরে আমাদেরকে মঞ্জিলে পৌছে দেন। আমীন।

দুনিয়ার ফেতনা

দুনিয়ার ফেতনা মানুষের শিরা উপশিরায় এমন ভাবে ঢুকে গেছে যে, কবরস্থানে গিয়েও আখেরাতের কথা মনে আসে না। যে দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা বারবার ধোঁকা বলেছেন, তাকেই অবিচল হাকীকত মনে করছে। দুনিয়া হাসিল করার আশায় বছর কি বছর মেহনত করে যাচ্ছে, কিন্তু পলক পড়ার সাথে সাথে শুরু হওয়া আখেরাতের যিন্দেগীর জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই। দুনিয়ার মহব্বতের পরিমাপ করুন। যদি কাউকে বলা হয়, আমি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলবো, যা করলে পলক পড়ার সাথে সাথেই তুমি জান্নাতের নেয়ামতসমূহে পৌছে যাবে। তোমার হাকীকি মাহবুবের দিদার লাভে ধন্য হবে। তাহলে কতজন মুসলমান পাওয়া যাবে

যারা হাকীকি মাহবুবের সাথে দেখা করতে আগ্রহী হবে? আমাদের তো নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করা উচিত। চোখ বন্ধ করে মনে মনে হিসেব করা উচিত, যেই স্বত্ত্বার সাথে সবচেয়ে বেশি মহব্বতের দাবী করি, তার সাথে মুলাকাত করতে কোন জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়ায়? অন্তরে তার সাথে দেখা করার কতটুকু আগ্রহ আছে? কতটি নামাজের মধ্যে তার সাথে মুলাকাতের দু'আ করেছি? অথচ যদি দুনিয়ার উন্নতির জন্য, দুনিয়ার দৌলত হাসিলের পন্থা বলে দেয়া হয়, তাহলে তার অস্থিরতা দেখো, এর জন্য সে কী না করে। তাহলে এটি দুনিয়ার মহব্বত এবং তার প্রতি ঈমান নয় তো কী?

আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে নিজের দুনিয়াকে মহব্বত করল সে নিজের আখেরাতের ক্ষতি করলো। আর যে নিজের আখেরাতকে ভালোবাসলো সে নিজের দুনিয়ার ক্ষতি করলো। সুতরাং তোমরা লয়শীল বিষয়ের উপর চিরস্থায়ী বিষয়কে প্রাধান্য দাও।

-এই হাদিসটি হাকিম রহ. মুসতাদরাকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। হাফেজ যাহাবী রহ.ও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রুগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

-হাকিম রহ. এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন। হাফেজ যাহাবী রহ. এটিকে সত্যায়ন করেছেন।

আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তোমাদের চাল-চলন তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাল-চলন থেকে কতো আলাদা। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। অথচ তোমরা এই দুনিয়া নিয়েই সবচেয়ে বেশি আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব কর।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. তাঁর সাথীবর্গকে বলেন, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ থেকে বেশি নামায-রোযা এবং জিহাদ কর। অথচ তাঁরা তোমাদের থেকে উত্তম ছিলো। তাঁরা

জিজ্ঞেস করলো সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, তাঁরা তোমাদের তুলনায় দুনিয়া থেকে অধিক বেঁচে থাকতেন এবং আখেরাতের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

-জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী রহ.।

মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, তোমরা যাদুকরনী থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটি উলামায়ে কেরামের অন্তরে যাদু করে দেয়।

এই যাদুকরনী দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া। মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ রাজি আমাকে বলেন, যদি আপনি এই কথার উপর আনন্দ অনুভব করেন যে, আপনি ইবাদাতের স্বাদ পেয়েছেন এবং স্বাদের চূড়ায় পৌছে গেছেন, তাহলে আপনার এবং আপনার নফসের মাঝখানে লোহার এক দেয়াল বানিয়ে নিন।

-যম্মুদ দুনিয়া লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া।

সুফিয়ান সাওরী রহ. থেকে বর্ণিত, ঈসা বিন মারইয়াম আ. বলেন, যেমন ভাবে আগুন এবং পানি এক পাত্রে একত্রিত হতে পারে না, তেমনি মুমিনের অন্তরে আখেরাতের মহব্বত এবং দুনিয়া এক সাথে থাকতে পারে না।

-যম্মুদ দুনিয়া লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া।

সাহল আবু আসাদ রহ. বলেন, এ কথা প্রশিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি আখেরাত এবং দুনিয়াকে এক করতে চায়, তার উদাহরণ ওই গোলামের মতো, যার দু'জন মনিব রয়েছে। অথচ তার এ কথা জানা নেই কোন মালিক সন্তুষ্ট হয়েছে।

-যম্মুদ দুনিয়া লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া।

হাসান বসরী রহ. বলতেন, যে দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রাখবে এবং দুনিয়া পেয়ে খুশী হবে, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় চলে যাবে। যে ব্যক্তি ইলমের মধ্যে উন্নতি করলো এবং দুনিয়ার লোভও বৃদ্ধি পেলো, ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। সে আল্লাহ তা'আলা থেকে অরো দূরে চলে গেলো।

-যম্মুদ দুনিয়া লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া।

ওহাব রহ. বলেন, দুনিয়া এবং আখেরাতের উদাহরণ হলো, যেমন একজনের দু'জন স্ত্রী রয়েছে। একজনকে সন্তুষ্ট করলে অপরজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

-জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী রহ.।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, সলফে সালেহীনের মধ্যে কোনো একজন দুনিয়া এবং দুনিয়াদার সম্পর্কে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, এই দুনিয়া কী? একটি পঁচা গলা দূর্গন্ধযুক্ত লাশ। যার উপর কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যদি আপনি তা থেকে দূরে থাকেন, তাহলে আপনি নিরাপদ। আর যদি আপনি এই কামড়া কামড়িতে শরীক হন, তাহলে এর উপর লাফানেওয়ালা কুকুর আপনার সাথে লড়াই করবে।

সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ার ফেতনার ভয়

যায়েদ বিন আরকাম রা. বলেন, আমরা আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। কোনো একজন তাঁকে পানি এবং মধু এনে দিলেন। যখন তিনি তা মুখের কাছে নিলেন, তখন তিনি এতো কান্না করলেন যে, তাঁকে দেখে তাঁর সাথীরাও কান্না করলো। অতঃপর সাথীরা তো থেমে গেলেন কিন্তু তিনি থামলেন না। দ্বিতীয়বার তিনি পানি মুখের কাছে নিলেন এবং আবারো কাঁদতে শুরু করলেন। এমন ভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর সাথীরা মনে করলেন তাঁকে আমরা থামাতে পারবো না। পুনরায় তাঁরা নিজেদের চোখ মুছলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! কোন কথা আপনাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি দেখলাম তিনি নিজের কাছ থেকে কোনো জিনিসকে দূরে সরালেন। অথচ তার কাছে আমি কোনো জিনিস দেখলাম না। সুতরাং আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজের কাছ থেকে কী দূরে সরালেন? তিনি বললেন, এটি দুনিয়া ছিলো। যা আমার সামনে এসেছিলো। আমি তাকে বললাম, যাও আমার থেকে দূরে সরে যাও। সে পুনরায় ফিরে আসলো এবং বললো, নিশ্চয় আপনি আমার থেকে বেঁচে

গেলেন। কিন্তু আপনার পরবর্তীরা কখনোই আমার থেকে বাঁচতে পারবে না।

-যম্মুদ দুনিয়া লি-ইবনে আবিদ দুনিয়া।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ইফতারির জন্য দস্তরখানে আসছিলেন। দস্তরখানে নানা রকম খাবার রাখা ছিলো। তিনি বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। তারপর দস্তরখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

দুনিয়া বিমুখী এবং দুনিয়ার খারাবী সম্পর্কে অনেক হাদীস ও বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের পর সলফে সালেহীনের নিকট দুনিয়া বিমুখীতা কতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তা এই বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবসমূহ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। দুনিয়া বিমুখীতা সম্পর্কে প্রশিদ্ধ কিতাবগুলো হলো,

১. আয যুহুদ-ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.।

২. আয যুহদুল কাবির-বায়হাকি রহ.।

৩. আয যুহুদ-ইবনে আবি আছেম রহ.।

৪. আয যুহুদ-ইবনে সিররি রহ.।

৫. আয যুহুদ-ইবনে মুবারক রহ.।

৬. আয যুহুদ-আবু হাতেম রাযি রহ.।

৭. আয যুহুদ-আহমদ বিন হাম্বল রহ.।

৮. আয যুহুদ-আবু দাউদ রহ.।

৯. আয যুহুদ-আসাদ বিন মূসা রহ.।

১০. আয যুহুদ-হান্নাদ রহ.।

১১. আয যুহুদ-ওকী‘অ রহ.।

১২. আয যুহদু ওয়ার রকায়িক-খতীবে বাগদাদী রহ.।

১৩. আয যুহদু ওয়াল অরঊ ওয়াল ইবাদাহ-ইবনে তাইমিয়া রহ.।

১৪. আয যুহদু ওয়া ছিফাতুয যাহিদীন-ইবনে আরাবী রহ.।

১৫. আল ফাওয়ায়িদু ওয়ায যুহদু ওয়ার রকায়েকু ওয়াল মারাছি-জাফর খালদী রহ.।

১৬. যম্মুদ দুনিয়া-ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.

যা মানুষকে আখেরাত থেকে গাফেল করে দেয় তা দুনিয়ার মহব্বতই। আর এজন্যই কুরআন ও হাদীসে এই দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্বের উপর অনেক জোর দিয়েছে। বস্তুত: আজ দুনিয়ার মহব্বতই আমাদের অন্তরে বাসা বেধেঁ বসে আছে। যার কারণে দেড়শত কোটি মুসলমানের অবস্থা সমুদ্রের ফেনার মতো হয়ে আছে। আমাদের জন্য উচিত হলো, আমাদের অন্তরে এই দুনিয়ার প্রতি অনিহা জন্মানো। তার স্বাদে বিভোর হওয়ার পরিবর্তে তার স্বাদ থেকে দূরুত্ব বজায় রাখা। লয়শীল, যে কোনো সময় সঙ্গ ত্যাগকারিনী, অকৃতজ্ঞ দুনিয়ার প্রতি দীল লাগানোর পরিবর্তে চিরস্থায়ী, অনন্ত এবং কৃতজ্ঞ আখেরাতের চিন্তায় অন্তরকে আবাদ করা। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর জীবনী অধ্যয়ন করা যেতে পারে। যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হালাল রিযিক পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে থাকেন, তাহলে সেসব সাহাবাগণকে দেখুন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা খুব মাল দৌলত দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আমলের অবস্থা কেমন ছিলো? বর্তমানে মানুষ সেসব সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকটও তো অনেক টাকা পয়সা ছিলো। কিন্তু তারা সেসব সাহাবাগণের সাধারণ যিন্দেগী ভুলে যান। আমাদের মালদার এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পার্থক্য হলো ওই দুই ব্যক্তির মতো, যাদের নিকট টাকা পয়সা রয়েছে। উভয়ের ঘরে খানা পিনার সব আসবাব রয়েছে। দামী দামী কাপড় রয়েছে। কিন্তু একজনের ঘরে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে। অথবা এমন কোনো পেরেশান এসেছে, যা তার অন্তরকে ভিতর থেকে দংশন করছে। অথচ দ্বিতীয়জনের ঘরে কোনো পেরেশানী নেই। এখন বলুন, প্রথম ব্যক্তির ঘরে পেরেশানী থাকা অবস্থায় দুনিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন? আপনি তার জন্য দুনিয়ার খাবার একত্র করে দিলেও এই পেরেশানী থাকাবস্থায় এক লোকমাও তার গলার নিচে যাবে না। সাহাবায়ে কেরামের নিকট অবশ্যই সবকিছু ছিলো, কিন্তু তাদের অন্তরে আখেরাতের চিন্তা এতো বেশি ছিলো যে, অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। আর আমাদের উদাহরণ হলো, দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো। দুনিয়াও আছে আবার অন্তর আখেরাতের চিন্তা

থেকে খালি। তাই নিজের নফসের চাহিদা পূরণ করতে মালদার সাহাবায়ে কেরামের সাথে তুলনা করা নিতান্তই বাড়াবাড়ি। উসমান বিন আফফান রা. ও আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর মতো মালদার সাহাবাগণের জীবনী উল্টিয়ে দেখুন। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কোন চিন্তায় যিন্দেগী কাটিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রা. হাজারো দেরহাম দিনের বেলা দান করে দিতেন আর সন্ধায় ইফতারের জন্য কিছুই রাখতেন না। উমর বিন খাত্তাব রা. ছেলের দাওয়াত এ জন্য ফেলে চলে যেতেন যে, দস্তরখানে দু'ধরনের খাবার রাখা ছিলো।

দীনের বিনিময়ে দুনিয়া কামানো

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যামানায় এমন কিছু লোক আসবে, যারা দীনের বিনিময়ে দুনিয়া কামাবে। তারা মানুষকে দেখানোর জন্য দুনিয়া বিমূখীতার ঝাণ্ডা উড়াবে। তাদের যবান চিনির চেয়ে মিষ্টি এবং অন্তর থাকবে ভেড়ার অন্তরের মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কী ব্যাপার আমাকেই ধোকা দিচ্ছ? নাকি আমার উপর দুঃসাহস দেখাও? আমার মর্যাদার কসম, সেসব লোকের উপর তাদের থেকেই এমন ফেতনা চাপিয়ে দিবো যে, তাদের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিরাও হয়রান হয়ে যাবে।

ফায়দাঃ উলামায়ে কেরাম এর উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেন যে, যারা দীনকে দুনিয়া, সম্পদ উপার্জন এবং মান সম্মান হাসিল করার মাধ্যম বানায়, তাদের জন্য এই হুমকি। এছাড়াও আরো কিছু হাদিস রয়েছে, যাতে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায়, বিশেষত সেসব ইলমেদীন হাসীল করনেওয়ালাদের ব্যাপারে হুমকি এসেছে, যারা তা দুনিয়া কামানোর জন্য শিক্ষা করবে।

হালাল মাল কমে যাওয়ার ভবিষ্যতবাণী

হুযায়ফা বিন ইয়ামান রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

তোমাদের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন তিন জিনিসের চেয়ে প্রিয় তোমাদের নিকট কোনো জিনিস থাকবে না। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ। এমন ভাই যার সাথে সে সম্পর্ক রাখে। কোনো সুন্নত যার উপর সে আমল করবে।

-তিবরানী রহ. 'আল আউসাথ' গ্রন্থে এবং আবু নুআইম রহ. 'আল হুলিয়াতু' গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

গান বাদ্যের ফেতনা

গান বাদ্য করনেওয়ালারা শুকর এবং বানর হয়ে যাবে

অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে। তারা সেটিকে মদ ছাড়া অন্য কোনো নাম দিবে। তাদের মাথায় পানপাত্র থাকবে। গায়িকারা গায়বে, বাজাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন। তাদেরকে বানর এবং শুকরে পরিণত করবেন।

-মুসনাদে আহমদ, ইবনে আবি শায়বা, সহীহ ইবনে হিব্বান, তারিখে কাবীর-ইমাম বুখারী রহ.।

আবু উমামা আল বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক খাওয়া-দাওয়া এবং খেল তামাশার মধ্যে রাত কাটিয়ে দিবে। অতঃপর সকালে বানর এবং শুকর হয়ে যাবে। তারা যমীনে ধ্বসে যাবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের জীবিতদের মধ্যে বাতাস পাঠানো হবে। যা তাদেরকে এমন ভাবে উপড়ে ফেলবে, যেমন ভাবে পূর্ববর্তীদের ফেলা হয়েছিলো। আর এই আযাব তাদের মদকে হালাল মনে করা, ঢোল তবলা এবং গান বাদ্যের যন্ত্র বানানোর কারণেই হবে।

নারীর ফেতনা

উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি আমার পর নারীর ফেতনা থেকে ক্ষতিকর কোনো ফেতনা ছেড়ে আসিনি।

ফায়দাঃ ইবনে বাত্তাল রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয় নারীর ফেতনা সকল ফেতনা থেকে বড়। এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীমের আয়াতও সাক্ষী। 'নারী এবং সন্তানাদির আকর্ষণ মানুষের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে।' (আয়াত) আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে নারীকে সব আকর্ষণের আগে এনেছেন। সুতরাং মুসলমানদের উচিত আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা এবং নারীদের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত থাকা। -শরহে ইবনে বাত্তাল।

সাঈদ বিন মুসায়্যিব রহ. বলেন, যখনই শয়তান কাউকে পথভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই নারীর দিক থেকে তার কাছে এসেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টিও নষ্ট হওয়ার পথে। কিন্তু তারপরও নিজের ব্যাপারে নারীর চেয়ে বেশি অন্য কিছুকে ভয় করি না। আর তখন তার বয়স ছিলো ৮৪ বছর।

বর্তমান যামানায় শয়তানী শক্তি এই কথার উপর জোর দিয়েছে যে, নারী-পুরুষের মেলা মেশাকে ব্যাপক করা হোক। মুসলমান নারীদেরকে ইহুদী-নাসারা নারীদের মতো চালানোর জন্য শয়তান অগণিত জাল বিছিয়ে রেখেছে। সেসব জালের আকর্ষণীয় শ্লোগান, বিজ্ঞাপন, চক্রান্ত এবং ধোকা এমন ভাবে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মা বোনকে সেদিকে যেতে বাধা দানকারীকে নিজের, সমাজের, উন্নয়নের এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে দুশমন মনে করা হয়। স্বাধীনতা, সমানাধিকার এমনকি ইসলাম এবং দীনেরও দুশমন মনে হয়। যেসব হায়েনা তাদের নাকে লাগাম লাগিয়ে বসে আছে, তাদেরকে তারা নিজেদের নিরাপত্তার দূত, অধিকারের ধারক-বাহক এবং নারী জাতির মুক্তিদাতা মনে করছে। শরম-লজ্জা, সতত্বি ও পবিত্রতা, আদিকালের কথা হয়ে গেছে। বর্তমান কাল তো এই নষ্ট দুনিয়া থেকে যে যতো বেশি ভোগ করতে পারবে সে-ই সম্মানিত, সে-ই বুদ্ধিমান, সে-ই নেতা। আর তাই কওমের যুবতীরাও সেই লাশের পিছনেই ছুটছে। আর ছুটাছুটিতে পিতার উড়ানো লজ্জার দুপাট্টা কোথায় উড়ে গেছে, কতো পুরুষের পায়ের নীচে দলিত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। দৌড় একটাই। পুরুষের আগে

যাওয়ার দৌড়। অথচ এই অজ্ঞ মূর্খ জানে না, এটা কেবল শ্লোগান বৈ কিছুই না। যা পুরুষেরা নারী জাতীকে ভোগ করার জন্য আবিস্কার করেছে। বাস্তবতার সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। তারা নারী জাতিকে ইযযতের যিন্দেগী থেকে বের করে রাস্তায়, ফুটপাতে এবং দফতরে মজদুর বানিয়ে লাঞ্চিত করেছে। ওরা মূর্খ কার্লচারের হায়েনা। যারা নিজেদের শিকারকে একই দৃষ্টিতে দেখে। ইউরোপ আমেরিকাকে দেখ। হর্তকর্তা কে? ফায়সালা কার হাতে? পুরুষের হাতে নাকি নারীর হাতে? নারীদের দিয়ে দফতর এবং রাস্তায় মজদুরি করিয়ে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারেনি। মজদুর হিসেবে ভর্তি হয়ে মজদুর হিসেবেই বের হয়ে গেছে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস খুলে দেখুন। মুসলমান বোনদের চিন্তা করা উচিত, সফলতা সেটি নয় যেটি ইবলিশ এবং তার লোকেরা দেখাচ্ছে। সফলতা তাতেই, যা আল্লাহ এবং তার সত্য রাসূল বর্ণনা করেছেন। তাদের জন্য নির্লজ্জ ইহুদী-খ্রিস্টান নারী মডেল হওয়া উচিত নয়, বরং নবীজির পবিত্রা স্ত্রীগণই তার উপযুক্ত। নারী জাতি তাদেরকেই নিজেদের মডেল মনে করবে। তাতেই ইযযত, তাতেই সফলতা। তাতেই পুরুষের সমানাধিকার, তাতেই সামাজিকতার উন্নতি এবং উন্নয়ন নিহিত।

নারীদের অবাধ্য হওয়া এবং যুবকদের ফাসেক হওয়ার বর্ণনা

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের নারীরা অবাধ্য হয়ে যাবে এবং তোমাদের যুবকরা ফাসেক হয়ে যাবে? তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এমনটিও হবে? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। বরং তার চেয়ে বেশি হবে।

একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, হায় যদি আমার পর আমার উম্মতের অবস্থা জানা থাকতো, যখন তাদের পুরুষেরা অহংকারী চালচলন করবে, তাদের নারীরা সাজ সজ্জা করে চলবে। হায় যদি তাদের অবস্থা

জানা থাকতো, যখন তারা দু'ধরণের হয়ে যাবে; এক. যারা নিজেদের গর্দান জিহাদে বিছিয়ে দিবে, দুই. সেসব লোক যারা গায়রুল্লাহ'র জন্য আমল করবে।

-ইবনে কাছীর রহ. তার তারীখ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দুই প্রকারের জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। এক. সেসব লোক, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো দুররা থাকবে এবং তা দিয়ে লোকদেরকে প্রহার করবে। দুই. সেসব নারী যারা কাপড় পরিহিতা থাকবে। কিন্তু তবুও উলঙ্গ থাকবে। পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা ঝুকে থাকা উটের কুহানের মতো থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এতটুকু দূর থেকে নেয়া সম্ভব।

-সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।

এই হাদীস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযাসমূহের একটি। যাতে তিনি তারপর আগত অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। এই হাদীসে নারীদের ফ্যাশনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। নারীরা এমন পোষাক পরিধান করবে, যার দ্বারা সতর ঢাকবে না। তাদের সাজসজ্জা, বেশ-ভূষণ, ফ্যাশন সবকিছু পর পুরুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য হবে। নারীরা মাথার চুলকে উপর দিকে উল্টিয়ে খোপা বাঁধবে। যা উটের কুহানের মতো উঁচু হয়ে থাকবে। শুনেছি আজকাল নতুন বধুকে বিউটি পার্লারের লোকেরা এভাবে সাজিয়ে দেয় যে, তার মাথা উটের কুহানের মতো দেখা যায়। কবি বলেন,

মুখের প্রসাধনী আস্তরের উপর আস্তর
অবাক, কুহানের মতো মাথা বেঁধেছে,
আম্মিজানও অবাক হলো
দুলহান বিউটি পার্লার থেকে এসেছে।

যেহেতু আমাদের শিক্ষিত সমাজ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে হলিউড এবং বলিউড ওয়ালাদের নিকট বন্ধক রেখেছে। যেমনটি ভারতী ফিল্মে দেখেছে তেমনটি-ই নকল করতে শুরু করেছে এবং তার উপর ফ্যাশনের

লেভেল লাগিয়ে জায়েয করে নিয়েছে। নতুবা কতজন শিক্ষিত লোকের এ কথা জানা আছে যে, হলিউড তথা মুম্বাই এবং দিল্লিবাসীরা ফ্যাশনে কোন ডিজাইন করে? এগুলোর সবকিছুই ইহুদী ধর্মের পোকা। যারা এই উম্মতকে দিয়ে প্রত্যেক ওই কাজ করাতে চায়, যা আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তাই তারা এমন ফ্যাশনই আবিস্কার করে, যা করলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিপালক নারাজ হবেন আর তাদের রব ইবলিশ খুশি হবে। মূলত এই জাহেলী ফ্যাশনের আবিস্কারক ইহুদিরাই। যারা অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ এবং হারোর্ড এর মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা।

নারীদের বড় অপারেশনের ভবিষ্যত বাণী

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নারীদের ধরা হবে। তারপর তাদের পেট ফাড়া হবে। তারপর যা কিছু গর্ভে থাকবে তা নেয়া হবে। ছেলে সন্তান হওয়ার ভয়ে তাকে বের করে ছুড়ে ফেলা হবে।

ফায়দাঃ বাচ্চা জন্মের সময় নারীদের বড় অপারেশন করা বিশ্ব ব্যাপী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর বিশেষ উপদেশের অংশ বিশেষ। দেশব্যাপী বিস্তৃত এনজিও গুলোর উদ্দেশ্যই হলো যে কোনো ভাবে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে শেষ করে দেয়া। এনজিওদের পক্ষ থেকে পরিচালিত হসপিটালগুলোর ঘটনা অবাক হওয়ার মতো। বাতিল শক্তিগুলো চেষ্টা করছে যেনো মুসলমানদের বাচ্চা কম হয়। তার মধ্যে পৃথক চেষ্টা হলো যেনো ছেলে জন্ম না হয়। আর এজন্য তারা খাবার এবং পানীয়ের মধ্যে বিভিন্ন কেমিক্যাল মিশিয়েছে। যেমন মিনারেল ওয়াটারের ব্যাপারে মুহতারাম মুফতী আবু লুবাবাহ শাহ সাহেব (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন, আমীন) তার 'দাজ্জাল কোন, কব, কাহাঁ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, মিনারেল ওয়াটারের মধ্যে এমন সব কেমিক্যাল মিশানো হয়, যার কারণে বাচ্চা বেশি বড় হয়। যে কেউ মিনারেল ওয়াটারের কারখানা দিলে তার জন্য সেই কেমিক্যাল পানির মধ্যে মিশানো আবশ্যক। এছাড়া তাকে কারখানা করার অনুমতি দেয়া হবে না। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে সফলতার

সাথে উদ্দেশ্য হাসিল করার পর ইহুদীরা জোর দিয়েছে ইসলামী বিশ্বের আবাদিগুলো কন্ট্রল করার দিকে। আর এর জন্য অগণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রাথমিক চেষ্টার মধ্যে একটি হলো, সাধারণ মানুষকে মিডিয়ার মাধ্যমে প্যাকেটজাত খাবার এবং পানীয়ের দিকে ধাবিত করা। সেসবের মধ্যে পেপসি, কোকা কোলা এবং মিনারেল ওয়াটার শীর্ষ স্থানে আছে। প্রাকৃতিক খাবারের অঢেল মজুদ থেকে মানুষকে হটিয়ে বার্গার, পিৎজা এবং অন্যান্য ফাষ্টফুডে অভ্যস্থ করা। এসব জিনিস ব্যবহার করলে পেট তো অবশ্যই ভরা মনে হবে, কিন্তু মানুষের প্রজনন ক্ষমতা দূর্বল হয়ে যায়। বর্তমানে যেখানে ইচ্ছা আপনি জরিপ চালাতে পারেন। আপনি একজন ফাষ্টফুড খানেওয়ালাকে দেখুন, আর একজন কুদরতী খাবার খানেওয়ালাকে দেখুন। ফাষ্টফুড খানেওয়ালাকে দেখতে মোটা সোটা মনে হবে। কিন্তু উভয়ের ভিতরের শক্তি বরাবর হবে না। প্রাথমিক এই কাজ করার পর বিশ্ব শয়তানী প্রতিষ্ঠানগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে এই কথার উপর মেহনত করে, যেনো নারীদের মনে বিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে। দেরিতে বিবাহ করা, এতো আগেই বিবাহের ঝামেলায় না জড়ানো, স্বাধীন জীবন উপভোগ করা ইত্যাদি। এই সব কথার উদ্দেশ্য একটাই, মুসলমানদেরকে স্বাভাবিক রীতি নীতি থেকে সরিয়ে অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ করা। আর যখন একবার পা পিছলে যায়, তখন গোটা যিন্দেগী-ই পরিবর্তন এবং উল্টো হয়ে যায়। দেরিতে বিয়ে করার অনেক ক্ষতি রয়েছে। যা আপনি সামাজিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। নির্বংশ করার পূর্বে প্রাথমিক স্তর হলো, বিয়ে করার পর শয়তানী মিডিয়া প্রথম থেকেই মানুষের ব্রেন ওয়াস করতে থাকে যে, বেশি সন্তান নিলে রিযিক কমে যাবে। দুটি সন্তানই যথেষ্ট, এই শ্লোগান এমন ভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষিত সমাজ তাকে এখন গ্রহণ করে নিয়েছে। যদি কেউ না মানে, তাহলে তার জন্য রক ফেলার্জ বিশ্ব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি রেখেছে। বিভিন্ন এনজিও ডাক্তারদেরকে পরামর্শ দেয়, বাচ্চার প্রসব বড় অপারেশনের মাধ্যমে করবেন। যেমনটি আজ দেখছেন, কেমন ব্যাথাহীন বড় অপারেশন করছে। এসব প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রচেষ্টা হচ্ছে, পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে।

যে বাচ্চাকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন।

(পোলিও টিকার ব্যাপারে লেখক 'বার্মোডা ট্রায়েঙ্গেল এবং দাজ্জাল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত লেখেছেন।)

কলম ব্যাপক হওয়া

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের আগে পরিচিত লোকদের সালাম করবে, ব্যবসা বেড়ে যাবে, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তা ছিন্ন হবে, কলম ব্যাপক হয়ে যাবে, মিথ্যা সাক্ষী বেড়ে যাবে এবং সত্য সাক্ষি চেপে যাবে।

-মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম রহ. এর সনদকে সহীহ বলেছেন এবং হাফেজ যাহাবী রহ. নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দেখতে নিষেধাজ্ঞা

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা সেসব লোকদের এলাকায় যাবে না, যাদের উপর আযাব নাযিল করা হয়েছে, তবে ক্রন্দনরত অবস্থায় যেতে পার। যদি কান্না না আসে তাহলে যেয়ো না। যাতে করে তোমাদের উপর তা এসে না যায়, যা তাদের উপর এসেছে।

আবদুল্লাহ বিন ওমর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সফরসঙ্গী কওমে সামুদের এলাকায় আসলো এবং তাদের কুপ থেকে পানি নিলো। সেই পানি দিয়ে আটার খামিরা তৈরি করলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পানি কুপ থেকে নেয়া হয়েছিলো, তা ঢেলে দিতে আদেশ করলেন এবং আটার খামিরা উটকে খাওয়াতে বললেন। অতঃপর তিনি সাহাবাগণকে আদেশ করলেন, সালেহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী যে কুপ থেকে পানি পান করতো তা থেকে পানি নিতে।

-বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

আবু কাবশা আনমারী রা. বলেন, গযওয়ায়ে তাবুকে লোকেরা কওমে সামূদের জায়গা দেখতে দৌড়ে যাচ্ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংবাদ পেলেন। সবাইকে আওয়াজ দেয়া হলো, আস্ সালাতো জামিয়া। আবু কাবশা আনমারী রা. বলেন, আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন নিজের উটনী ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা সেসব লোকদের কাছে যাচ্ছ যাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিলো? এ কথা শুনে একজন আওয়াজ দিলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কওমে সামুদের উপর খুব আশ্চর্য বোধ করছি? তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এরচেয়ে বেশি আশ্চর্যের সংবাদ দিবো না? তোমাদেরই একজন লোক তোমাদের আগের লোকদের সংবাদ দিচ্ছে এবং তোমাদের পর আগতদের সাংবাদও। সুতরাং ইসলামের উপর অটল থাক এবং সরল পথে চল। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাস্তির ব্যাপারে কোনো পরোয়া করেন না। আগামীতে এমন লোক হবে যারা কোনো জিনিস দিয়েই নিজেদের প্রতিরোধ করবে না।

-মুসনাদে আহমদ; হাদীস নং ১৮৫১৬।

ফায়দাঃ লোকদেরকে মূর্খতার কার্লচারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পুরাতন নিদর্শনের নামে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে বেঁচে থাকা উচিত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার পর ফারায়েনা, মঞ্জুদার, হাড়পা, রাজা দাহির ও রঞ্জিত সিংকে মহব্বত করা এবং তাদের নিয়ে গর্ব করা, ইসলাম গ্রহণের পর মূর্খতার দিকে ফিরে যাওয়া। এসব কাজের জন্য ইসলামের দুশমনেরা কোটি ডলারের ফাণ্ড এমনিতে জারি করেনি। তারা এর পরিণাম জানে। মুসলমানদেরকে সেদিকে ধাবিত করার পর ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কতটুকু বাকি থাকবে। মিউজিয়ামে আর্টের নামেও শয়তানি কার্লচার মস্তিস্কে বসানো হয়।

কাফের এবং আল্লাহর নাফরমানদের সাথে থাকতে নিষেধাজ্ঞা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি প্রত্যেক ওই মুসলমান থেকে মুক্ত, যে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কেনো? তিনি বলেন, মুসলমান এবং মুশরিক একে অন্যের আগুনও দেখবে না।

-আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফ।

ফায়দাঃ আগুন দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঘর দূরে দূরে হওয়া। এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে হিজরতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং তাদেরকে কাফেরদের রাষ্ট্রে বসবাস না করা উচিৎ।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুশরিকদের সাথে বাসস্থান গ্রহণ করলো সে আমার জিম্মাহ থেকে মুক্ত।

-তিবরানী; হাদীস নং ২২৬১, বায়হাকী; হাদীস নং ১৭৫২৮।

সামুরাহ বিন জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে মেলা মেশা করলো এবং কাফেরদের দেশে বসবাস করলো সে তাদের মতোই।

-আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং ২৭৮৭, তিবরানী শরীফ; হাদীস নং ৭০২৩, দায়লামী শরীফ; হাদীস নং ৫৭৫৬।

ফায়দাঃ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী রহ. আউনুল মাবউদ নামক গ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এসব লোক কয়েকটি কারণে কাফেরদের মতো। কেননা আল্লাহর দুশমনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং তাদেরকে বন্ধু বানানো আবশ্যকীয় ভাবে তাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যায়, শয়তান তাকে বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। আল্লামা যমখশরী রহ. বলেন, এটা তো সহজেই বুঝে আসার কথা যে, বন্ধুর বন্ধুত্ব এবং দুশমনের বন্ধুত্ব একটি অন্যটির বিপরীত। এই হাদীসে অন্তরকে আল্লাহর দুশমন থেকে দূরে রাখা এবং তাদের সাথে মেলা মেশা ও বসবাস করতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

-আউনুল মাবউদ।

সামুরাহ বিন জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা কাফেরদের সাথে বসবাস করো না। তাদের সাথে মেলামেশাও করো না। সুতরাং যে তাদের সাথে বসবাস করলো এবং তাদের সাথে মেলা মেশা করলো সে আমাদের দলভূক্ত নয়।
-ইমাম হাকিম রহ. মুসতাদরাকে হাকিমের মধ্যে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন, হাফেয যাহাবী রহ. বলেন, এটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তাছাড়া এটি তিবরানী রহ., বায়হাকী রহ. এবং ইমাম তিরমিযী রহ.ও বর্ণনা করেন।

ليس منا এর অর্থ-

শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. 'মাআরিফে মাদানী' এর মধ্যে ليس منا এর এই অর্থ লিখেছেন যে, তারা মুসলমানের অন্তর্ভূক্ত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার ধরন এবং খেতাবের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা বুঝায় যায়, এটি হুঁশিয়ারীর এমন একটি বাক্য ছিলো, যা এমন ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করতেন, যেখানে স্পষ্ট ও অকাট্য কুফরী আছে অথবা কুফুরীর খুবই নিকটবর্তী অথবা ইসলামী যিন্দেগী থেকে খুবই দূরের অবস্থা বুঝানো হতো। সাধারণ গুনাহ এবং অন্যায় থেকে এটি অধিক কঠোর এবং অকাট্য কুফুরীর নীচের স্তরের। সুতরাং এই বাক্যের এমন অর্থ বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই যে, সে আমাদের হেদায়াতের উপর নয় অথবা বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যাখ্যা অথবা পরিপূর্ণ মুসলিম নয়। শরীয়ত প্রবক্তা যেসব কাজের জন্য যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন এবং যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে ক্ষেত্রে সেসব শব্দের অভিধানিক অর্থ নিয়ে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা উচিত নয়। যারা এই হীন চেষ্টায় লিপ্ত, তারা মুসলমানদেরকে ইসলাম এবং ঈমানের আমলী যিন্দেগী থেকে বঞ্চিত করছে। যার ফলে গোটা ইসলামী বিশ্বে দুই তৃতিয়াংশ মুসলমান একই ভূখন্ডে আমলের দিক থেকে মনচাহি এবং পথভ্রষ্ট যিন্দেগী যাপন করছে। যদিও বিশ্বাসের দিক থেকে তারা আহলে সুন্নাত হওয়ার দাবি করে।

-মাআরেফে হযরত মাদানী রহ./৪০৫।

মাদানী রহ. একটু পরে বলেন, এটা কেমন কথা যে, একজন লোক যত বড় ফাসেক ও গোনাহগার হোক যদি দু'একটি এখতেলাফী মাসআলায় আমাদের সহযোগী হয়, তাহলে আমরা তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি মনে করি? আরেকজন ব্যক্তি কত আমলদার এবং সৎ ব্যক্তি, কিন্তু কিছু আখলাকী বিষয়ে আমাদের সমমনা না হলে আমাদের দৃষ্টিতে তার চেয়ে খারাপ লোক আর কেউ নেই?

তিনি শেষের দিকে বলেন, ليس منا এর স্পষ্ট অর্থ হলো, সে মুসলমানের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় মুসালমানদের কোনো দলের উপর যুদ্ধের জন্য হাতিয়ার উঠানো এমন এক কাজ, যা করার পর মানুষ মুসলমান হওয়ার উপযুক্ত থাকে না।

বি.দ্র. কাফেরদের দেশে থাকার ব্যাপারে ফকীহগণ ফেকার কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু আজ মুসলমান এ ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করে না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, সৎকাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সহযোগীতা কর। গুনাহ এবং অবাধ্যতার কাজে সহযোগীতা করো না।

ওমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.কে ওলীমার দাওয়াত দিলো। যখন তিনি তার বাড়িতে গেলেন, তখন গানের আওয়াজ শুনলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না। মেজবান বললেন, কী হলো? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যেমন লোকদের সাথে থাকবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যেমন লোকের কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে তাদের সাথে শরীক হলো।

-মুসনাদে আবু ইয়ালা।

কতলের হুকুম দাতার ব্যাপারে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, জাহান্নামের আগুনকে

সত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উনসত্তর ভাগ কতলের হুকুম দাতার জন্য এবং এক ভাগ হত্যাকারীর জন্য।

-মুসনাদে আহমদ; হাদীস নং ২৩৭৬৮।

মুসলিম হত্যায় মদদ দাতা

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বাক্যের একটি অংশ দ্বারাও মুসলিম হত্যায় সহযোগিতা করলো, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন ভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ'।

-সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস নং ২৭১৮, সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী; হাদীস নং ১৬২৯১।

ফায়দাঃ এই অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির জন্য, যে বাক্যের একটি অংশ দ্বারা হত্যাকারীকে সহযোগিতা করলো। অর্থাৎ পুরো বাক্য 'তাকে হত্যা কর' বলেনি, বরং শুধু 'তাকে হত' এতটুকু বলেছে তার ব্যাপারেই এই হুকুম। সুতরাং মোশাররফ, হামিদ কারজাই, নূরী মালিকী, জালাল তালেবানীর মতো লোকদের কী অবস্থা হবে? যারা লাখো মুসলমান হত্যায় আমেরিকাকে সহযোগীতা করেছে। বোম্বিং করার জন্য বিমান ঘাটি করতে দিয়েছে। ক্রুজ মিজাইল নিক্ষেপের জন্য তাদেরকে নিজেদের সমূদ্রঘাটি দিয়েছে। কালেমা ওয়ালা মুসলমানদেরকে কতল করার জন্য আটান্ন হাজার উড্ডয়ন পাকিস্তানের যমীন থেকে করা হয়েছে। কতো যবান সেসব খুনীদের পক্ষে বলেছে, কতো কলম নিহত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ বর্ষণ করেছে। হায়! এমন একজনও তো থাকা উচিত ছিলো, যিনি নিহতদের কতল হওয়ার ফতোয়া দিতো। এমন একজনও তো থাকা উচিত ছিলো, যিনি আমেরিকা এবং তাদের সহযোগীদের থেকে হত্যার বদলা চাইতো। মনে হচ্ছে সবাই খুনীদের সাথে। ভাষনবিদদের কথা বলে কী আর হবে, তা তো মোশাররফ এবং তার ঠোলা বাহিনীও করছে। মুসলমানদের হত্যাকারী কাফেরদের ব্যাপারে কুরআন কী বলে? সেসব কাফেরদের সহযোগীদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বিধান কী? কারো কোনো পরোয়া নেই। মনে হচ্ছে ঘরের লোকেরা আমার কওমের হত্যাকারীদের সাথে আছে। কারণ, সরকার তো সেসব হত্যাকারীদের ইশারায় গঠিত হয় এবং

ভেঙ্গে যায়। তাদেরই ঠোটের হেলনেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাহ্যিক বিরোধীতা কেবল লোক দেখানো এবং শ্লোগান মাত্র। চেহারা ভিন্ন, কিন্তু দাবী সকলেরই এক। আর সেটা খুনী যা ইচ্ছা করবে কিন্তু নিহতদের কোনো প্রকার বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ জায়েয নেই। এতে ইসলামের বদনাম হয়ে যাবে। ইউরোপ আমেরিকাতে ইসলামের জোয়ার, যা অচিরেই হোয়াইট হাউজ এবং টেন ডাউন স্ট্রীটকেও নিজের আয়ত্বে নিয়ে যাবে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। পশ্চিমারা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। আমাদের জন্য লন্ডন এবং ওয়াশিংটনে যাতায়াত মুশকিল হয়ে যাবে। সুতরাং খুনী খুন করতে থাকুক। মুখে তাকে ভালো মন্দ বল, নতুবা অন্তরে খারাপ মনে কর। তাহলেও উম্মতে মুহাম্মদী থেকে বের হবে না। কিন্তু নিহতদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধের উদ্যোগ নেয়া হেকমত এবং মাসলাহাতের খেলাফ। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের দূর্বলতা, ব্যবস্থাপনার স্বল্পতা এবং ভীরুতার জন্য তোমারই কাছে শেকায়াত করছি। হে আরশের প্রতিপালক! আমরা অসহায়, তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। আমাদের সাহায্য কর, সাহায্য কর, সাহায্য কর, হে সাহায্যকারী!

মুসলমানদের কতল করতে সহযোগীতা করা তো অনেক দূরের কথা রাসূলে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সেখানে দাঁড়াতেও নিষেধ করেছেন, যেখানে অন্যায় ভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এই ভয়ে যে, যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি পতিত হয়, তাহলে তাকেও বেষ্টন না করে নেয়।

খরসা বিন হারেসাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ নিহত ব্যক্তির পাশে যেয়ো না। হতে পারে তাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে। যার ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নাযিল হতে পারে, যা তোমাদেরকেও বেষ্টন করে নিতে পারে।

-তিবরানী।

গরম পাথরের মতো ফেতনা

হুযায়ফা বিন ইয়ামান রা. বলেন, তোমাদের উপর ফেতনা আসবে। যা তোমাদের উপর হালকা কালো পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর

তোমাদের উপর ফেতনা আসবে। যা গরম পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর তোমাদের উপর এমন ফেতনা আসবে যা কালো আঁধার হবে।

-আবু নুআইম হিলিয়াতে বর্ণনা করেন, হাদীসটি হাসান।

ফায়দাঃ এর উদ্দেশ্য হলো, ফেতনা প্রথমে হালকা প্রকৃতির হবে। যা দেহ এবং দীনের উপর স্বল্প পরিসরে প্রতিক্রিয়া করবে। তারপর আগত ফেতনা প্রথম ফেতনা থেকে কঠোর হবে এবং দেহ ও দীনের উপর অধিক প্রতিক্রিয়া করবে। তারপর কালো আঁধারীর ফেতনা আসবে। যাতে হক বাতিল চেনা খুবই কঠিন হবে। মানুষ বাহ্যিক অবস্থা দেখে, লোক মুখে শুনে হককে বাতিল থেকে চিনে নিবে।

আমের বিন ওয়াসেলা হুযায়ফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনটি ফেতনা আসবে। তৃতীয় ফেতনা তাদেরকে দাজ্জাল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর তিনটি ফেতনা হলো, এক. যা হালকা পাথর নিক্ষেপ করবে। দুই. যা গরম পাথর নিক্ষেপ করবে। তিন. কালো আঁধারির ফেতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্তাল।

-মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীসটি হাসান।

ফায়দাঃ এই বর্ণনার দ্বারাও আমাদের দূরত্ব অনুমান করতে পারি যে, আমরা কত দূরে অবস্থান করছি। এই তিন ফেতনার পর চতুর্থ যে ফেতনা আসবে, তা দাজ্জালের আগমন পর্যন্ত থাকবে। আর সেই চতুর্থ ফেতনা কী হবে? অন্য এক হাদীসে এই চতুর্থ ফেতনার বর্ণনাও এসেছে। যা মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ এবং মুসতাদরাকে হাকীমে আছে।

উমায়ের বিন হানি রহ. আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ফেতনার বর্ণনা করলেন এবং সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এমনকি আহলাসের ফেতনাও বর্ণনা করলেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, আহলাসের ফেতনা কী? তিনি বললেন, এই ফেতনা পালায়নের এবং ঘর বাড়ি লুটের ফেতনা হবে। তারপর আনন্দ এবং পরিতৃপ্তির ফেতনা হবে। যার ধোঁয়া এমন ব্যক্তির পায়ের নিচ দিয়ে বাহির হবে, যে ব্যক্তি ধারণা করবে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত। অথচ সে আমাদের দলভূক্ত নয়। নিঃসন্দেহে আমার বন্ধুগণ তো

মুত্তাকী। তারপর মানুষ এক অনুপযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে ঐক্যমত হবে। তারপর অন্ধকারের ফেতনা আসবে। আর সেই ফেতনা এমন হবে যে, উম্মতের এমন কোনো লোক থাকবে না, যে তার থাপ্পড় না খাবে। যখনই বলা হবে ফেতনা শেষ হয়ে গেছে, ফেতনা আরো প্রলম্বিত হবে। এসব ফেতনার মধ্যে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে এবং বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। মানুষ এই অবস্থার মধ্যেই থাকবে এই পর্যন্ত যে, দুই তাবুর মধ্যে উপনীত হবে। যার একটি ঈমানদারদের তাবু। যাতে মোটেও কোনো নেফাক নেই। অপরটি মুনফিকদের তাবু। যাতে মোটেও কোনো ঈমান নেই। যখন তোমরা এভাবে পৃথক হয়ে যাবে, তখন দাজ্জালের অপেক্ষা করবে যে, আজ আসবে নাকি কাল আসবে।

-আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম এবং মুসনাদে আহমদ।

ফায়দাঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, চতুর্থ ফেতনা অন্ধকারের ফেতনা হবে। সেই ফেতনার মধ্যে দাজ্জালের দাজ্জালিয়াতের প্রভাব থাকবে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে দেয়া হবে। হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক হিসেবে দেখানো হবে। মুক্তিদাতাকে দাজ্জাল এবং দাজ্জালকে মুক্তিদাতা দেখানো হবে। মুজাহিদকে সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসীকে শান্তিরক্ষী হিসেবে দেখানো হবে। যাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয় থাকবে, সে সেই পথই অবলম্বন করবে যেখানে তার জান মাল আক্রান্ত হবে না, নফসের চাহিদায় বেঘাত ঘটবে না। সুতরাং দাজ্জালী সেই শক্তি দেখানো হলে সে তাকেই হক হিসেবে মেনে নিবে। পক্ষান্তরে সেসব লোক; যারা যে কোনো মূল্যে রবকে সন্তুষ্ট করার ফায়সালা করে ফেলবে, দুনিয়ার সব দৌলত লুটিয়ে দিয়ে আখেরাতের খাজানার সওদা অন্তরে গেঁথে নিবে, হকের পথে আগত বিপদ আপদ; বোমা, মিজাইল, ড্রোন তাদের অন্তরে এমন ভাবে বর্ষিত হবে যে, তাদের অন্তরের প্রতিটি কোনা থেকে নেফাকের টুকরোগুলো বের হয়ে থাকবে এবং অন্তরে কেবল ঈমানই চমকাতে থাকবে, এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর দিয়ে ভরে দিবেন। যার মাধ্যমে তাঁরা এই ঘোর অন্ধকারেও বাতিলকে এমন ভাবে চিনতে পারবেন, যেমন দ্বীপ্রহরের সূর্যের আলোতে কোনো জিনিস চেনা যায়। ধীরে ধীরে মানুষ পৃথক হতে

থাকবে। যারা খালেছ ঈমানদার, অন্তরে বিন্দু মাত্র নেফাক নেই তারা। আর যারা মুনাফিক, যার অন্তরে বিন্দু মাত্র ঈমান নেই তারাও। বাতিল শক্তির ভয়, লোভ, ব্যবসায়ীক কল্যাণ, চাকরী চলে যাওয়ার ভয়, গ্রেফতার হওয়ার খতরা, দুনিয়ার লম্বা লম্বা আশা এসব বিষয় মানুষের অন্তর থেকে ঈমানকে এমন ভাবে নিংড়িয়ে বের করে নিবে যে, এক বিন্দু ঈমানও অন্তরে বাকি থাকবে না।

জাতীয়তা এবং দেশত্মবোধের ফেতনা

এই ফেতনা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অস্তিত্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। যার উপমা, হুবহু একজন জীবিত মানুষকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়ার সাথেই করা যেতে পারে। যার হাত, পা, বাহু, মাথা, সীনা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জাতীয়তা এবং দেশত্মবোধের ফেতনা উম্মতের ঐক্যের এমনি অবস্থা করেছে।

জাতীয়তা এবং ইসলাম

জাহেলিয়াতের যুগে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার মাপকাঠি ছিলো গোত্রের প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঐক্য এবং বিরোধীতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হতো। গোত্রের যে কোনো লোকের সাথে কারো লড়াই হলে, সেটাকে গোটা গোত্রের লড়াই মনে করা হতো। ঐক্যে আবদ্ধ গোত্রগুলোকেও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হতো। এই কথার উপর কেউ কোনো ভ্রুক্ষেপই করতো না যে, কে জালেম এবং কে মাজলুম। রহমতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর, সকল মূর্তীকে না বলে দিলেন। আরবের মুশরিকরা যতগুলো মূর্তী তৈরি করে রেখেছিলো ‘লা ইলাহা’ এর এক যুদ্ধে সব মিসমার করে দিলেন। দু‘জাহানের সরদার, মানবতার ইমাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব চিন্তা চেতনাকে বাতিল করে দিলেন। সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করলেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর উপর। গোত্র, জাতি এবং দেশত্মবোধের মূর্তীগুলোকে

টুকরো টুকরো করে দিলেন। যে একবার কালেমা পড়ে নিলো, সে ভাই হয়ে গেলো। তার দুঃখ বেদনায় শরীক হওয়া, তার প্রতি খেয়াল রাখা, এমনকি তার জন্য জীবন দিয়ে দেয়ারও ঘোষণা করা হলো। অথচ রক্ত সম্পর্কীয় বড় ভাই, যে কালেমাকে অস্বীকার করলো তাকে দুশমন ঘোষণা করা হলো। কালেমায়ে তাওহীদ তাদের অন্তরে এমন ভাবে জায়গা করে নেয় যে, প্রত্যেকের জীবন-মরণ কালেমার ভিত্তিতেই হবে। যে এই কালেমার হয়ে গেলো, সে তার হয়ে গেলো। যে এই কালেমাকে অস্বীকার করলো, সে তার দুশমন হয়ে গেলো। তার মহব্বত এই কালেমার জন্য ছিলো এবং ঘৃণাও এই কালেমার জন্যই। বন্ধুত্ব তার জন্য এবং দুশমনিও তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ রোম থেকে এসেছিলো, কেউ পারস্য থেকে। কিন্তু কালেমা পড়ে নেয়ার পর সবাই একটি দেহ হয়ে গেলো। আর সেই আরব; যারা জাতি এবং গোত্রের নামে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, আজ এই কালেমা তাদের শ্লোগান হয়ে গেলো। এখন এই কালেমার জন্যই যুদ্ধ আর এই কালেমার জন্যই সন্ধি। যারা এই কালেমার উপর জান দিলো, নবুওয়াতের যবানে তাদের জন্য সুসংবাদ শুনানো হলো। আর যারা এই কালেমা ছাড়া অন্য কোনো চেতনার জন্য জীবন দিয়েছে, তাদেরকে ব্যর্থ ঘোষণা করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে এমনই এক ঘটনা রয়েছে। কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আরব্য জাতীয়তাবাদের চেতনায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো এবং নিহত হয়েছিলো। কিন্তু তাদেরকে তিনি জাহান্নামী ঘোষণা করলেন। আল্লাহ তা'আলা কেবল সেসব লোকদেরকেই পছন্দ করেন, যাদের সবকিছু এই কালেমা। এছাড়া সকল সম্পর্ক গোড়ামী এবং মূর্খতা। লড়াই-হত্যা মন্দ জিনিস। কিন্তু তা যদি এই কালেমার বিজয় এবং দীন বাস্তবায়নের জন্য হয়, তাহলে এই কাজের জন্য ফেরেস্তারাও সালাম করে। আল্লাহ তা'আলা তা আদায়ের কসম করেন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিভিন্ন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যদি কেউ নিজের জাতি, গোত্র অথবা দেশত্মবোধের জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে তা গোড়ামী এবং মূর্খতা। আর তার জন্য জীবন দাতারাও জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।

ইসলামের মুকাবেলায় দেশত্মবোধ

ইসলামের দুশমনেরা উম্মতে মুসলিমাকে খেলাফত থেকে মাহরুম করে পঞ্চাশেরও অধিক টুকরোতে বিক্ষিপ্ত করেছে এবং প্রত্যেক ভূখন্ডে নিজেদের সেবাদাসকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে। এই রাষ্ট্রপ্রধানরা ইহুদী মায়েদের কোলে পালিত হয়েছে। তাদের কোলেই বড় হয়েছে। ইসলামের প্রতি ঘৃণা অন্তরে নিয়ে যুবক হয়েছে। সারা জীবন ইহুদীদের সেবাদাস হয়েই থাকবে। তারা জনগণকে সেই সবকই দিচ্ছে, যা তাদেরকে তাদের ইহুদী মায়েরা পান করিয়েছে। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের রাজ্যে ইসলামী চেতনার পরিবর্তে দেশত্মবোধ এবং জাতীয়তার চেতনা দিয়েছে। দেশত্মবোধের ভূত নিজের যাদু দিয়ে মুসলমানদেরকে এমন ভাবে কাবু করেছে যে, দারুল হরবে (যে দেশের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে) বসবাসরত মুসলমানরাও কাফেরদের দেশের সাথে কৃতজ্ঞতার শপথ নিচ্ছে। এমনকি মুসলমানদের মুকাবেলায় তারা কাফেরদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে এবং এটাকে তারা কোনো গুনাহ মনে করছে না। অথচ শরয়ী কোনো প্রয়োজন ছাড়া তাদের জন্য দারুল হরবে থাকাও জায়েয নেই। এভাবেই ইসলামের দুশমনরা দেশত্মবোধের মূর্তী বানিয়ে তাওহীদের উম্মতকে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে। যারা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত একটি ইসলামী মালার মধ্যে গাঁথা ছিলো। যেখানে শরয়ী মাসায়েলের ভিত্তি ইসলাম ও কুফরের উপর ছিলো, সেখানে আজ তা দেশত্মবোধের উপর হচ্ছে। সেসব মাসআলাকে বিলকুলই ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, যেগুলো দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে বসবাসরত মুসলমানকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার অংশ করতো। বরং আজ তো তাদেরকে উম্মতের অংশ বানানোর পরিবর্তে অন্য কোনো দেশের বাসিন্দা বলে কাফেরদের দয়া দক্ষিণার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, এক দেশের মুসলমানের উপর যদি কোনো কষ্ট আসে, তাহলে পরশী দেশের মুসলমানেরা নিজেদের জঞ্জাল নিয়েই ব্যাস্ত থাকে। কোনো মুসলমান দেশের উপর কাফেররা আক্রমণ করলে, বাকি মুসলমানেরা ঘুমিয়ে থাকে। অথচ কুরআন হাদীস অনুযায়ী তা সমস্ত মুসলমানের উপর হামলা ছিলো।

কিন্তু সেসব রাষ্ট্র প্রধানরা নতুন যে শরীয়ত জনগণের জন্য চালু করেছে, তা অনুযায়ী সেটি অন্য দেশের মুসলমানের ব্যাপার। তার দেশের বাস্তবতা এই অনুমতি দেয় না যে, সে নিজের ভাইদের সাহায্যের ব্যাপারে চিন্তা করবে।

এভাবেই ইহুদি নাসারারা একের পর এক মুসলিম দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। মুসলমানদের আসবাবপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেরা মস্তিস্কগুলো হস্তগত করছে। সবশেষে সেই দিনও এসে গেছে, যখন আল্লাহর দুশমন ইহুদীরা পঞ্চাশের অধিক মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৭ সালে প্রথম কেবলা দখল করে নেয়। প্রথম কেবলা দখলের পরও ইসলামী বিশ্ব জাগ্রত হয়নি। এই সুযোগে যদিও কিছু আরব দেশ আরব্য জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাদের জাতীয়তার মূর্তী তাদের কোনো উপকারই করতে পারলো না। ব্যাপারটা প্রথম কেবলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকলো না। ইহুদী নাসারারা মক্কা মদীনার আশেপাশেও পৌছে গেছে। যেই ভূখন্ড থেকে আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বহিস্কার করতে আদেশ দিয়েছেন, ১৪০০ বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনরা পুনরায় সেখানে এসেছিলো এবং সব সৈন্য সামন্ত নিয়েই এসেছিলো। এটাকে ইসলামের দুশমনদের শক্তির মেহনত বলব, নাকি আমাদের অলসতা বলবো? দেশত্মবোধের শ্লোগান দিয়ে মুসলমান নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে। অথচ ইসলাম এবং দেশত্মবোধের সম্পর্ক ঠিক তেমনি, যেমন ইসলাম এবং লাত মানাতের মূর্তীর সম্পর্ক। দেশত্মবোধ একটি মূর্তী, যা বিশ্ব ফেতনাবাজরা উস্কে দিয়েছে। দীন মানেই হলো ইসলাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবলই ইসলাম। দীনে হানীফের মেযায এতই অনুভূতিশীল যে, তার অনুসারীদের কাছে শতভাগ একনিষ্ঠ আনুগত্য চায়। শিরকের সামান্যতম আশঙ্কাও তার মেযায সহ্য করে না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারগণ! পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

সুতরাং ইসলাম যদি এই হুকুম দেয়, তোমরা যে ভূমিতে বসবাস করছো তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহযোগীতা কর, তাহলে মাতৃভূমি ছেড়ে মুসলমানদের সহযোগীতা করতে হবে। ইসলাম যদি হুকুম দেয়, তোমরা যে দেশে বসবাস করছ তা ছেড়ে চলে যাও, তাহলে তাই বাস্তবায়ন করতে হবে। এমনটি হতে পারে না যে, ইসলামকেও মানবে আবার অন্তরে মাতৃভূমির মূর্তীও লালন করবে। ইসলাম কোনো হিন্দুবাদ, খ্রিস্টবাদ কিংবা ইহুদীয়াত নয়। এটি দীনে হানীফ। যা কেবল নিজের অনুসারীদেরকেই আপন মনে করতে চায়। যেসব অন্তরে তার মহব্বত ছাড়া অন্য কোনো মূর্তীর মহব্বত থাকবে, সেসব অন্তর সে গ্রহণ করে না। নবীদের ইতিহাস সাক্ষি, যখন তাদের কওম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে হিজরত করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। তখন নবীগণ দেশপ্রেমের শ্লোগান দেননি। বরং দীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছেন। জন্মভূমি ত্যাগ কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। মানুষ যেখানে লালিত পালিত হয়েছে, যার অলিতে গলিতে খেলা ধূলা করেছে, অন্তরে তার মহব্বত থাকা স্বভাবগত বিষয়। তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আবাদ হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে এই মহব্বতের পরিমাণটা মাল-দৌলত, মান-সম্মান এবং আত্মীয়স্বজনের মহব্বতের মতো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যেমন ভাবে এই শ্লোগান দেয়া যাবে না যে, প্রথমে মাল-দৌলত তার পর ইসলাম, ঠিক তেমনি ভাবে মাতৃভূমির শ্লোগানও লাগানো যাবে না।

সায়্যিদুনা ঈসা আ. কে জন্মভূমি ছেড়ে কিশতিতে আরোহন করতে বললেন এবং এই দু'আ শিখিয়ে দিলেন, আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি যালেম কওম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনি আরো বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করান। আপনি-ই সবচেয়ে উত্তম অবতরণ করানে ওয়ালা।

সায়্যিদুনা ইবরাহিম আ. মূর্তীগুলো ভাঙ্গার পর ঘোষণা করেন, নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছি। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

এছাড়াও লুত আ., মুসা আ., ইউসুফ আ. এবং আসহাবে কাহাফ নিজেদের দীন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করেছেন। সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হলো, যারা জন্মভূমির মুকাবেলায় ইসলামকে গ্রহণ করবে, তারাই মুসলিম বলে গন্য হবে। এছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর দুশমনরা সবসময় আল্লাহ ওয়ালাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কখনো দেশত্মবোধকে উস্কে দিয়ে হকপন্থীদের বিরোধীতা করেছে, কখনো আল্লাহ ওয়ালাদেরকে দেশান্তরীণ করার হুমকি দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন, কাফেররা তাদের রাসূলদেরকে বলে, হয়তো তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে নতুবা অবশ্য আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিবো।

শুআইব আ. কে তাঁর কওমের অহংকারী সরদাররা বললো, হে শুআইব! তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরে আস, নতুবা নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথের ঈমানদারগুলোকে আমাদের আবাদী থেকে বের করে দিবো।

লুত আ. এর উপদেশের জবাবে তাঁর কওম তাকে বললো, আর তাঁর কওমের জবাব এটাই ছিলো, তাকে আমাদের আবাদী থেকে বের করে দাও। এরা নিজেদেরকে খুব পুত-পবিত্র মনে করে।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধেও কাফেররা একই অস্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আর যখন আপনার বিরুদ্ধে কাফেররা চক্রান্ত করছিলো, যাতে তারা আপনাকে গ্রেফতার করে ফেলে এবং কতল করে ফেলে অথবা আপনাকে দেশান্তর করে দেয়। তারা চক্রান্ত করছিলো আল্লাহ তা'আলাও জবাব দিচ্ছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম জবাব দাতা।

জ্ঞানীদের জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে। মক্কার মতো পবিত্র নগরী, যেখানে আল্লাহর ঘর আছে। যেটি গোটা মুসলিম বিশ্বের মারকায। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতো মহব্বত ছিলো এই শহরের সাথে। যার বহিঃপ্রকাশও তিনি করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা ছেড়ে

চলে যাওয়ার হুকুম করা হলো। এমনকি মক্কা বিজয়ের পরও কোনো মুহাজিরকে সেখানো স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়নি। কোনো একজন মুসলমানও মক্কার ফযীলত, তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করেননি। বরং সকলেই নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে সকল মহব্বত, বিশ্বাস এবং স্বপ্ন কুরবানী করেছেন।

মূলকথা এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সংবিধান এবং নিয়ম নীতি তৈরি করে দিয়েছেন। তারই ভিত্তিতে আমাদের চেতনা, আচার-আচরণ, লেনদেন এবং সম্পর্ক ঠিক করতে হবে। সেসব নিয়ম নীতি থেকে সরে গেলে, না কোনো চেতনা গ্রহণযোগ্য হবে, না কোনো মহব্বত। তারপরও যদি কেউ ইসলামের মুকাবেলায় সেসব বস্তুর মহব্বত অন্তরে পোষণ করে, তাহলে সে তাগুতের পূজা করলো। যদি কেউ সেই তাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করে, তাহলে তা হবে মূর্খতা এবং জাহেলিয়াত। সেটাই কেবল জিহাদ হবে যা আল্লাহর দীনকে উচু করার জন্য হবে।

দেশপ্রেম কি ঈমানের অংশ?

মাতৃভূমির ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এ কথা প্রশিদ্ধ আছে যে, হাদীস শরীফে এসেছে, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। এটি জাল হাদীস। মোল্লা আলী কারী রহ. 'আল মাসনু'অ ফি মা'রেফাতি হাদীসীল মাওজু' গ্রন্থে বলেন, হাদীসের হাফেজদের নিকট এই হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম সাগানী রহ. 'আলা মাউজুআত লিস সাগানী' গ্রন্থে এটিকে মাউজু বলেছেন।

জানা সত্ত্বেও এটিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অপবাদ দেয়া। আর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অপবাদ দিবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।

জিহাদ কী?

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কাকে বলে? কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত জিদের জন্য যুদ্ধ করে, আবার অনেকেই কোনো চেতনার (ভাষা, জাতীয়তা এবং দেশপ্রেম) জন্যে যুদ্ধ করে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্নকারীর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমার বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করলো, সে আল্লাহ রাস্তার যোদ্ধা।

-বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

দ্বিতীয় হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমন পতাকার নীচে যুদ্ধ করলো, যার উদ্দেশ্য জানা নেই অথবা কোনো চেতনার (ভাষা, জাতীয়তা, খান্দান) ভিত্তিতে রাগ করলো অথবা কোনো চেতনার দিকে মানুষকে আহ্বান করলো, অথবা কোনো চেতনার ভিত্তিতে সহযোগীতা করলো এবং মরে গেলো, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করলো।

-মুসলিম শরীফ।

এই হাদীস থেকে নীচের কথাগুলো জানা যায়; যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

১. যে ব্যক্তি এমন লড়াইয়ে যুদ্ধ করবে যার উদ্দেশ্য জানা নেই অথবা তার এই কথা জানা না থাকে যে, সে কেনো এবং কার জন্য যুদ্ধ করছে।

২. যেকোনো ধরনের চেতনা যেমন জাতীয়তা, ভাষা, দেশাত্মবোধ, খান্দানী ইত্যাদির কারণে উত্তেজিত হওয়া।

৩. এগুলোর কোনো একটির দিকে কাউকে দাওয়াত দেয়া অথবা দল বানানো।

৪. এসব চেতনার ভিত্তিতে কাউকে সহযোগীতা করা।

যদি কোনো মুসলমান উল্লেখিত অবস্থাগুলোর কোনো একটিতে মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যু আল্লাহর অবাধ্যতায় হবে। বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন চেতনার উপর যুদ্ধ করে এবং তাকে জিহাদ নাম দেয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। জিহাদ তাকেই বলে, যাতে আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করে। আর

এ জন্য জীবন দাতাকে শহীদ বলা হবে। অন্যথায় হিন্দুরাও তো কাশ্মিরের মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মারা যাওয়া সৈন্যদেরকে শহীদ বলে।

ঈমান এবং নেফাক

আলী রা. বলেন, নিশ্চয় অন্তরে ঈমান সামান্য সাদা বস্তুর মতো দৃশ্যমান হয়। অতঃপর যখনই ঈমান মজবুত হয়, সেই সাদা অংশ বাড়তে থাকে। এমনি ভাবে যখন ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, অন্তর পরিপূর্ণ সাদা হয়ে যায়। আর নিশ্চয় অন্তরে নেফাকী সামান্য কালো বস্তুর মতো দৃশ্যমান হয়। অতঃপর যখন নেফাকী বাড়তে থাকে, অন্তরের কালো অংশও বাড়তে থাকে। সুতরাং যখন নেফাক পূর্ণ আকার ধারণ করে, তখন পুরো অন্তর কালো আকার ধারণ করে। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা মুমিনের অন্তর ফেড়ে দেখো, তাহলে তা সাদা পাবে। আর মুনাফিকের অন্তর চিড়ে দেখো, তা কালো পাবে।

-বায়হাকী-শুআবুল ঈমান; হাদীস নং ৩৮, ইবনে মুবারক রহ.-যুহুদ; হাদীস নং ১৪৪০, ইবনে আবী শায়বা র.;হাদীস নং ৩০৩২১।

নেফাকের নিদর্শনসমূহ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, চারটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে সে খালেস মুনাফিক। যার মধ্যে এই বস্তুগুলোর একটি থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকির একটি নিদর্শন থাকবে, যতক্ষন না সে তা ত্যাগ করবে। যখন আমানত রাখা হবে তাতে খেয়ানত করবে। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে। যখন ওয়াদা করবে তা ভঙ্গ করবে। যখন ঝগড়া করবে গালি গুলুজ করবে।

-বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

ফায়দাঃ আল্লাহর সাথে যদি বান্দার এমন আচরণ হয়, তাহলে কী হবে? আল্লাহ তা'আলার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'র ওয়াদা করা হয়েছে। যদি কোনো মুসলমান এই ওয়াদার খেলাফ করে, তাহলে তাকে কী বলা হবে? আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, আমি কি তোমাদের রব নই? আল্লাহ ছাড়া আমেরিকা এবং

আই.এম.এফ'কে রব মানতে শুরু করলে তাকে শরীয়ত কী বলবে? আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক মানলে, অন্য কাউকে ভয় করলে, তা সেসব কথার অন্তর্ভূক্ত, বান্দা আপন রবের সাথে যেসবের ওয়াদা করেছে।

জিহাদ না করা এবং জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া নেফাকের একটি আলামত

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেলো যে, জিহাদ করেনি, নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতও করেনি, সে নেফাকের একটি অংশের উপর মৃত্যুবরণ করলো।

-মুসলিম শরীফ; হাদীস নং ১৯১০, মুসনাদে আহমদ; হাদীস নং ৮৮৫২, আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং ২৫০২, তারীখে কাবীরে ইমাম বুখারী রহ, নাসায়ী শরীফ; হাদীস নং ৩০৯৭, মুসতাদরাকে হাকিম; হাদীস নং ২৪১৮, বায়হাকী হাদীস; নং ১৭৭২০।

ফায়দাঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, সে সেসব মুনাফিকদের মতো হয়ে গেলো যারা জিহাদ থেকে পিছনে থাকতো। কারণ, জিহাদ ছেড়ে দেয়া নেফাকীর একটি অংশ।

আল্লামা সিন্দি রহ. 'হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানিন নাসাঈ' গ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখায় বলেন, নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতও করলো না, এই কথার অর্থ হলো, সে অন্তর থেকে এই কথা বলবে, হায়! যদি আমি গাজী হতাম। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে জিহাদের নিয়তও করলো না। আর জিহাদের নিয়তের নিদর্শন হলো জিহাদের সরঞ্জাম তৈরি করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যদি বের হওয়ার ইচ্ছে থাকতো তাহলে অবশ্যই এর কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতো।

মোল্লা আলী কারী রহ. মেরকাত গ্রন্থে বলেন, এর অর্থ হলো, জিহাদের ইচ্ছা করেনি এবং এ কথাও বলেনি, হায়! যদি আমি মুজাহিদ হতাম। এর অর্থের ব্যাপারে এটিও বলা হয়েছে যে, জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেনি। আর এই ইচ্ছার বাহ্যিক নিদর্শন হলো, জিহাদের সরঞ্জাম তৈরি

করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যদি তারা জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করতো, তাহলে অবশ্যই এর জন্য সরঞ্জাম তৈরি করতো। এই কথার সত্যায়নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সে নেফাকীর একটি নিদর্শনের উপর মৃত্যুবরণ করলো। অর্থাৎ যে এই অবস্থার উপর মৃত্যুবরণ করলো, সে সেসব মুনাফিকদের মতো হয়ে গেলো, যারা জিহাদ থেকে পিছনে থাকতো। আর যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুসরণ করলো সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার সাথে নির্দিষ্ট। অথচ এটাই অধিক স্পষ্ট যে, এটি ব্যাপক হুকুম।

কোনো মুসলমানকে মুনাফিক বলা

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফের বললে তাদের দু'জনের একজন কাফের। যাকে কাফের বলা হয়েছে, যদি সে সত্যিই কাফের হয়, তাহলে বলনে ওয়ালা সত্যবাদি। আর যদি সে কাফের না হয়, তাহলে বলনে ওয়ালার উপর কুফুরী প্রত্যাবর্তণ করবে।
-আদাবুল মুফরাদ; ইমাম বুখারী রহ.। আল্লামা আলবানী রহ. এটিকে সহীহ বলেছেন।

ফায়দাঃ এর উদ্দেশ্য হলো, যাকে কাফের বলা হয়েছে, যদি তার মধ্যে এমন কোনো বস্তু পাওয়া যায়, যার কারণে যে কোনো মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, যাকে ঈমান ভঙ্গকারী বলা হয়, তাহলে তো বলনে ওয়ালার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি থেকে এমন কোনো কথা বা কাজ না পাওয়া যায়, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তাহলে বলনে ওয়ালা অনেক বড় জুলুম করলো। এ কথা বলা হয়েছে যে, তার গুনাহ এবং শাস্তি বলনে ওয়ালার উপর ফিরে আসবে। কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে মুনাফিক বলার হুকুম এমনই। উমর বিন খাত্তাব রা. এর যুগে এক বিচারক নিজের এক সৈন্যকে মুনাফিক বলল। আমীরুল মুমিনীন তার বিরুদ্ধে আদালত বসালেন। যখন এ কথা প্রমাণিত হলো, যাকে মুনাফিক বলা হয়েছে সে মুনাফিক নয়, বরং বিচারক প্রমাণ ছাড়াই তাকে মুনাফিক বলেছে, তখন আমীরুল মুমিনীন সেই

বিচারককে চাবুক লাগানোর হুকুম দিলেন। কিন্তু সেই সৈন্য তাকে ক্ষমা করে দেন। সুতরাং এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। শুধু সন্দেহবশত এমন কোনো কথা বলা, যার শাস্তি নিজের উপরই ফিরে আসে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে, তা খুবই ক্ষতিকর কথা। দীনের বিজয়ের জন্য যোদ্ধাদেরকে প্রত্যেক ব্যাপারে শরীয়তের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো উত্তেজনাকে, কোনো প্রতিশোধ স্পৃহাকে, কোনো ব্যক্তিগত চাহিদাকে বিজয়ী হতে দেয়া যাবে না। আল্লাহর জন্য সবকিছু কুরবানকারীর সব ইচ্ছা আল্লাহ সন্তুষ্টির অনুগত থাকা উচিত। বিশেষত দায়িত্বশীলরা নিজের অনুগতদের সামনে এমন কোনো কথাই বলবে না। কারণ, অনুগতরা প্রত্যেক মজলিসে তা বর্ণনা করবে। এতে ফেতনা সৃষ্টি হবে। দীনের কোনো ফায়দা হবে না। এসব স্পর্শকাতর বিষয় শুধু দায়িত্বশীলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। সব সত্য কথা সবখানে বলা জরুরী নয়। মানুষের মধ্যে ততটুকুই বলবে যতটুকু তারা হজম করতে পারবে। জিম্মাদাররা মুক্ত, এ বিষয়েও সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা নেই। সুতরাং এই বিষয় অনুযায়ী হুকুম জারি করলে মানুষ তা মেনে নিবে না। তাছাড়া দুশমনদের সংখ্যা বাড়ানো তো কোনো জ্ঞানীর কথাও নয়, কোনো বাহাদূরীও নয়। মুজাহিদদের উচিত বালাকোটের আন্দোলন অধ্যয়ন করা। ইংরেজরা সায়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এবং শাহ ইসমাঈল রহ. এর বিরুদ্ধে ওহাবী হওয়ার প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে আন্দোলনের কোমড় ভেঙ্গে দিয়েছিলো। আর আজ আমেরিকা আপনার বিরুদ্ধে কাফের, খারেজী হওয়ার অপবাদ ছড়াচ্ছে। আপনার উচিত উলামায়ে হকের নেতৃত্বে থাকা। যাতে তারা এই চক্রান্ত মোকাবেলা করতে পারে। সেই সাথে এ ব্যাপারে পাকিস্তানী মুসলমানদের অবস্থা এবং মন মেজাযের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। এমন যেন না হয়, আপনার অসতর্কতার কারণে জিহাদের ক্ষতি হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে মিশে থাকার তাওফিক দিন। আমাদেরকে দীনের ব্যাপারে কল্যাণকামী করুন। সব ধরনের ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ইসলামী বিশ্বের নাছোড় মুনাফিকগুলো

জাফর বিন হায়্যান বলেন, হাসান বসরী রহ. কে বলা হলো, মানুষ তো বলে, এখন কোনো মুনাফিক নেই। তিনি এর জবাবে বললেন, যদি আমি এই সংবাদ পেয়ে যাই যে, আমি নেফাক থেকে মুক্ত, তাহলে তা আমার নিকট স্বর্ণে ভরপুর পৃথিবী থেকেও উত্তম।

-ছিফাতুন নিফাক ও যম্মুল মুনাফিক্বীন লিল ফারয়াবী।

হাসান বসরী রহ. লোকদেরকে এ কথা বুঝিয়েছেন, নেফাক শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং আজও মুনাফিকরা বিদ্যমান। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, সব যুগেই নেফাক বিদ্যমান এবং জীবিত। মুনাফিকদের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট যুগের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তার নিকট নেফাক দু‘ধরনের। এক. বিশ্বাসগত নেফাক। দুই. আমল ও আখলাকগত নেফাক। যদিও বিশ্বাসগত নেফাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু আমল ও আখলাকগত নেফাক এখনও বিদ্যমান।

শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. নিজের যুগের ব্যাপারে বলেন, বর্তমানে অধিক পরিমাণে নেফাক বিদ্যমান। আর তাই ‘আল ফাউযুল কাবীর’ গ্রন্থে নেফাকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, যদি আপনি মুনাফিকদের দেখতে চান, তাহলে প্রশাসনের লোকদের বৈঠকে উপবিষ্টদের দেখুন, তারা কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

-আল ফাউযুল কাবীর।

নেফাক কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওই হাদীসও দলীল; যা পিছনে বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে, দাজ্জালের কিছুদিন আগে মানুষ দুই তাবুতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক. খালেছ ঈমানদারদের তাবু। দুই. খালেছ মুনাফিকদের তাবু।

একদা হাসান বসরী রহ.কে একজন জিজ্ঞেস করলো, এখনো কি নেফাক আছে? তিনি বললেন, যদি মুনাফিকরা বসরার গলি থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে এখানে তোমাদের অন্তর বসবে না।

-ছিফাতুন নিফাক ও যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফারাবী।

নিজের ব্যাপারে নেফাককে ভয় কর

ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে 'নিজের অজান্তেই আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুমিনের ভয়' নামে পৃথক অধ্যায় রেখেছেন। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় 'হাশিয়ায়ে সিন্দি'তে মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্দি রহ. লেখেন, মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুমিন ভয় করবে।

ইমাম বুখারী রহ. এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, আবু মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৩০ জন সাহাবীকে পেয়েছি। তারা সকলেই নিজের ব্যাপারে নেফাকের ভয় করতেন। তাদের মধ্যে কেউ এমন বলতেন না যে, তিনি জিবরাঈল এবং মিকাঈল আ. মতো ঈমান রাখেন।

মুআল্লা বিন জিয়া রহ. বলেন, আমি মসজিদে হাসান বসরী রহ.কে কসম খেতে শুনেছি। তিনি বলেন, কোনো মুমিন এমন অতিবাহিত হয়নি, যিনি নিজের ব্যাপারে নেফাকির ভয় করেননি। আর কোনো মুনাফিক এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজেকে নেফাকের ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং নিরাপদ মনে করেনি। তিনি বলতেন, যে নিজেকে নেফাক থেকে মুক্ত মনে করে সে মুনাফিক।

-ছিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফারাবী।

আইয়ূব রহ. বলেন, আমি হাসান বসরী রহ.কে এ কথা বলতে শুনেছি, মুমিনের এমন কোনো সকাল বিকাল অতিবাহিত হয় না, যাতে সে নিজের ব্যাপারে মুনাফিক হওয়ার ভয় করে না।

-ছিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফারাবী।

নবী যুগের মুনাফিক অধিক ক্ষতিকর না বর্তমানের

হুযায়ফা রা. বলেন, নিশ্চয় নবী যুগের মুনাফিক থেকে বর্তমানের মুনাফিক অধিক ক্ষতিকর। কারণ, তখন তাদের নেফাকী গোপন রাখতো। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেদের নেফাক প্রকাশ করে।

ফায়দাঃ যদি হুযায়ফা রা. বর্তমানের মুনাফিকদের অবস্থা দেখতেন, যাদের নেফাক এতটা স্পষ্ট যে, তাদের মুখ থেকে নেফাকী লালার মত বের হতে থাকে, তাহলে তিনি কী বলতেন? তারা কুরআনের উপর ঈমানের কথা বলে, কিন্তু তাতে বর্ণিত বিধানগুলোকে মূর্খতা, মধ্যযুগীয়, পশুত্ব এবং মানবতার খেলাফ মনে করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে মুনাফিক থেকে রক্ষা করলো, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূল বলেছেন) আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন একজন ফেরেশতা পাঠাবেন যে তার গোশতকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

-সুনানে আবু দাউদ।

উমর ফারুক রা. বলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে দুই জনের কাউকেই ভয় করি না। এক. মুমিন ব্যক্তি। যার ঈমান প্রকাশ্য বিষয়। দুই. কাফের যার কুফুরী প্রকাশ্য বিষয়। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে সেই মুনাফিককে ভয় করি, যে ঈমানকে ঢাল বানিয়ে তার বিপরীত আমল করে।

-ছিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফারাবী।

বাস্তবতা এটাই যে, মুনাফিকরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং হিন্দুরা মিলেও করতে পারেনি। আজ ইসলামী বিশ্বে ইহুদী এবং হিন্দুদের প্রাধান্য কেবল সেসব মুনাফিকদের কারণেই। প্রত্যেক দেশে ইহুদীরা এমন মুনাফিকদের বসিয়ে রেখেছে, যারা কথাতো বলে আমাদের পক্ষ হয়ে কিন্তু তাদের অন্তর বাঁধা আছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনদের সাথে। তারা ইসলামী বিশ্বের বহু মূল্যবান সম্পদ কড়ির দামে বিক্রি করে শুধু মাত্র নিজের রাজত্বকে দীর্ঘায়িত করার জন্যে। উম্মতে মুসলিমাকে গলিতে গলিতে, শহরে শহরে এবং দুনিয়ার প্রতিটি ভূখন্ডে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব তারা নিজেদের কাধে নিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের ইযযত, আযাদী, ঈমানী চেতনা এবং দীনি আত্মমর্যাদা তারা টাকার বিনিময়ে নিলাম করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের অবস্থা পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ঈমানদারদের উচিত

কুরআন নিয়ে গবেষণা করা এবং নিজেদেরকে আল্লাহর দুশমন থেকে রক্ষা করা। তাদেরকে চিনে রাখুন। এরা কারা, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করে অথচ আল্লাহর বিধি বিধান তাদের ভালো লাগে না? এরা কারা, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী মনে করে অথচ, নবীর অবমাননাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে? নবীর দুশমন কাদিয়ানীদের সমান অধিকার দাবী করে? কারা সেসব লোক, যারা বলে, আমরা সেই কিতাবের উপর ঈমান এনেছি যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, কিন্তু তাতে বর্ণিত বিচার বিধানকে মধ্যযুগীয়, পশুত্ব, মূর্খতা এবং হিংস্রতা বলে?

খোদার কসম! সত্য বলার সময় এসেছে। যদি সত্য বলার সাহস না থাকে, তাহলে অন্তত সাদা দীলে শুনে রাখুন, আপনি কতদিন পর্যন্ত নিজের দল এবং নেতাদের পিছনে শুধু এজন্য ঘুরে ফিরবেন যে, তাদের প্রতি আপনার অন্তরে বিশ্বাসের মন্দির জন্মেছে? আপনার যে চেতনা ইসলামের মুকাবেলায় এসেছে, তা না জানি আপনাকে নিয়েই ডুবে যায়। এই চেতনা যদি মুহাম্মাদে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের মুকাবেলায় আসে, তাহলে আপনি কী করবেন? আপনি কার মান রাখবেন? নিজের দীল মন্দীরে সাজানো দল বা নেতার? নাকি আল্লাহ এবং তার রাসূলের? দীলকে প্রশ্ন করুন। দীলের দরজা জানালা খুলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ না করুন, যদি এমন সময় এসে যায়; এক দিকে ইমাম মাহদীর লশকর থাকে আর অন্য দিকে তারা থাকে, যাদের বিশ্বাস এবং মহব্বত আপনার দীল জুড়ে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তাহলে আপনি কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহণ করবেন? কার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর কার প্রতি রুষ্ট হবেন? সেসব সাহাবায়ে কেরামকে স্মরণ করুন, যাদের মহব্বত অন্তরে আছে বলে দাবি করেন। যুদ্ধের ময়দান। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের মাথার খুলিগুলো বর্শার ডগায় বিদ্ধ করা হচ্ছে। নবুওয়াতের মশালের দাবি আর ইশকে নবীর টানে সবকিছু কুরবানী দিয়ে বের হয়ে এসেছে। ছেলের সামনে বাবা এসে পড়েছে। একদিকে বাবা আর অপর দিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম; কাফেরদের পক্ষ নিয়ে যে আসবে তারই গর্দান উড়িয়ে দাও। নিজেকে প্রশ্ন করুন, নিজের ঈমান

যাচায় করতে উদ্ধত তলোয়ারের সামনে ওই ব্যক্তি, যার সাথে আপনার সবচেয়ে বেশি মহববত। কষ্ট নিবেন না, দীলকে ঝাকি দিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমিও নিজেকে প্রশ্ন করছি, হে নেফাকে ডুবে যাওয়া দীল! তখন তোর কী ভূমিকা হবে? যখন তোর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের মুকাবেলায় এমন একজন দাঁড়িয়ে যাবে যাকে তুই পূজার যোগ্য মনে করিস। হে আমার দু'মুখো দীল! সত্য কথা বল, আল্লাহর সাথে তোর অধিক মহব্বত নাকি তোর অন্তরে আবাদ করা মূর্তীর সাথে?

যখনই মাথা সেজদায় যেতে লাগলো,
যমীন থেকে আওয়াজ আসলো
তোর দীল তো মূর্তী পূজারী
নামাজে তুই কী পাবি?

মুমিন ও মুনাফিকের গুনাহ

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুমিন তার গুনাহকে পাহাড়সম মনে করে। ভয় পায়, না জানি এই গুনাহ'র পাহাড় আমার উপর ধ্বসে পড়ে। আর মুনাফিক নিজের গুনাহকে এমন তুচ্ছ মনে করে যেনো মাছি নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যায়।

-বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩০৮।

ফায়দাঃ মুমিনের যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সে তাওবা ইস্তেগফার করতে থাকে এবং ভয় পেতে থাকে। অথচ ফাজের এবং মুনাফিক গুনাহ হলে বলে, এমন কী গুনাহ করে ফেলেছি যে, আসমান ভেঙ্গে পড়বে? পবিত্র কুরআনেও মুনাফিকদের এই মন্দ স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা এসেছে; যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ইস্তেগফার করবেন, তখন তারা ঠাট্টা স্বরুপ মাথায় ইশারা করে। আপনি তাদেরকে দেখবেন তারা অহঙ্কারের সাথে প্রত্যাখ্যান করছে। মুনাফিকরা মনে করে, তারাতো এমন কোনো গুনাহই করেনি যার কারণে ইস্তেগফার করতে হবে। এটি তাদের মূর্খতা, আমিত্ব এবং চরম উদাসীনতা। তাদের এতটুকু অনুভুতিও নেই যে, তাদের ঈমান ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানেও এমন বহু লোক পাওয়া যাবে, যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ

করেও দাবী করে, সে তো সত্যিকারের পাক্কা মুসলমান। তাদের জন্য বায়তুল্লাহ'র দরজা খোলা হয়। ওই সত্তার কসম! যিনি বায়তুল্লার তওয়াফকারীদের অন্তরের খবর জানেন। ওই ব্যক্তি কিভাবে মুমিন হতে পারে, যে ইসলামের বিধান নিয়ে ঠাট্টা করে, পথভ্রষ্টদের নেতৃত্ব দেয়, আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমনদের সাথে মিলে নিস্পাপ মুসলমানদের খুন প্রবাহিত করে?

নেফাকের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ভয় এই পরিমাণ ছিলো। তাহলে আমরা গুনাহগার কোন দলের অন্তর্ভূক্ত? আমরাতো কাফেরদের বন্ধুত্বকেও গ্রহণ করে নেই। আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপমানও পেট ভরে সহ্য করি। উম্মতের কন্যাদের জীবন্ত পুড়ে ফেলা হোক কিংবা কাফেররা উঠিয়ে নিয়ে যাক, আমাদের ঈমানে কোনো প্রভাব পড়ে না। ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমনদের ঐক্য হয়ে যায় এবং কালেমা ওয়ালা মুসলমানদের গ্রাম কি গ্রাম উজাড় করে দেয়, তবুও আমরা পাক্কা মুসলমানই থেকে যাই। কখনো নিজের ব্যাপারে নেফাকীর ভয় তো দূরে থাক, অন্যকে নেফাকীর সার্টিফিকেট দিয়ে দেই। এমনকি তাদেরকেও মুনাফিক বলে ফেলি, যারা এমন সময় ইসলামের ইযযত বাঁচিয়েছে, যখন অধিকাংশ লোক ইসলামের ইযযত লুন্ঠিত হতে দেখেও খামুশী ভূমিকায় অবতীর্ন। আবার অনেকেই তো লুন্ঠনকারীদের সাথেই ঐক্যবদ্ধ। আমাদের তো নিজেদের ব্যাপারে এমন মজবুত একীন আছে যে, আমরা ঈমানের চূড়ায় বসে আছি। আমাদের ঈমান এত উচু দরজার যে, নেফাক কাছেও ভিড়তে পারবে না। এই পরিমাণ আত্মগড়িমা এবং অকোতভয়ী, মনে হয় আল্লাহর সাথে চুক্তি হয়েছে যে, তিনি আমাদেরকে জান্নাতেই রাখবেন। কোনো ছোটো খাটো কাজ করেছি নাকি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়েছি। সুতরাং জাহান্নামের আগুনের কী ক্ষমতা আছে যে, আমাদের কাছে ভীড়বে? নেফাকের ব্যাপারে ভয় না থাকা, সব ধরনের বদ আমল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে দীর্ঘ আশা, কুফুরের সূদী কানুনের অধীনে জীবন যাপন, মিথ্যা, হারাম উপার্জন, তাগুতের পূজা, কুফুরী শক্তির সামনে মাথা ঝুকানো, জিহাদ ফরজে আইন হওয়া সত্ত্বেও জিহাদকে অস্বীকার, অপব্যাখ্যা, বাহানা এমনকি মুজাহিদদেরকে গালি গুলুজ, বদ

দু'আ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনদের প্রতি নম্রতা, সহানুভূতি, যা মন চায় তাই করা, অন্তরে কোনো ভয় না আসা, এক সেজদায় সব গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস। এসবই কি এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ? আমাদের ঈমান এবং আল্লাহর রহমতের আশা সাহাবায়ে কেরামের চাইতেও উঁচু দরজার? আমাদের সেজদাতে কি আবু বকর রা. থেকেও অধিক শক্তি? আমাদের তাসবীহ, ইস্তেগফার, তাওবা কি সেই আশেক থেকেও বেশি কার্যকর, যিনি বাসর রাতে নব দুলহানকে ফেলে নিজের প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদের ময়দানে হাজির হয়েছেন এবং শহীদ হয়েছেন? যাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। এই আশেক নেফাকের ব্যাপারে এতো ভয় করতেন যে, তিনি মদীনার গলিতে চিৎকার করে ফিরতেন, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানের মুসলমানের অবস্থা; ভয়হীন, গুনাহে ধারাবাহিকতা, নফস যা চায় তা পুরা করা, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া, নফসের মুকাবেলায় দীনকে কুরবানী করা, গুনাহের উপর অটল থাকা, এক ইস্তেগফারে সব গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়া। নাউযুবিল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনকে কী বানিয়ে নিয়েছে? এটাই কি শেষ নবীর দীন? এটা তো ব্রাক্ষনের হিন্দু ধর্ম নয় যে, সারা বছর যা ইচ্ছা করলাম আর গঙ্গাতে এক ডুবেই এমন পবিত্র হয়ে যাবো, যেনো মায়ের পেট থেকে এখনই জন্ম নিয়েছি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি কারণ মনে হয় এমন যে, দীর্ঘ কাল থেকে আমাদের চাল চলন মিষ্টি মিষ্টি ফাযায়েল শুনতে শুনতে ডাইবেটিস রুগী হয়ে গেছে। হুঁশিয়ারী শুনানেওয়ালা খুবই কম। কোনো বিজ্ঞ হাকিম থাকতেন, তাহলে তিনি হুঁশিয়ারীর তিক্ত দাওয়াই দিয়ে ফুলে যাওয়া নফসের অবস্থা ঠিক করে দিতেন এবং সমাজে ছড়ানো ব্যাপক রুগের চিকিৎসা করতেন। নফসে এমন প্রহার করতে হবে, যেনো তার আকৃতি বিগড়ে যায়। আর তখনই এই নফসের হুঁশ হবে। অন্তরে ভয় পয়দা হবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে মুনাফিক

‘কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, আখেরাতের উপর। অথচ তারা ঈমান আনেনি।

-সূরা বাকারা।

‘তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারদের ধোকা দেয়। এতে তারা নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে। অথচ তারা তা অনুধাবন করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি, তাদের মিথ্যার পরিণামে।’

-সূরা বাকারা।

ফায়দাঃ মুনাফিকরা নিজেদেরকেই ধোকা দেয়, যদিও তাদের সেই অনুভূতি নেই। এতে বুঝা যায়, নেফাক মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে অথচ তারা তা অনুভবও করতে পারে না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে দারদা রা. বলেন, আবু দারদা রা. যখন কোনো মাইয়্যেতকে ভালো অবস্থায় মৃত্যু হতে দেখতেন, তখন তিনি বলতেন, তার মৃত্যু বরকতময় হোক। হায়! যদি তার স্থানে আমি মরে যেতাম। তখন উম্মে দারদা রা. তাকে বললেন, আপনি এমনটি কেনো বলছেন? তিনি জবাবে বলেন, আরে বোকা তোমার কি সেই যামানার খবর আছে, যখন মানুষ সকালে মুমিন হবে এবং সন্ধায় মুনাফিক হয়ে যাবে? উম্মে দারদা রা. প্রশ্ন করলেন, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, তার ঈমান চলে যাবে অথচ তার সেই অনুভূতিই থাকবে না। আর এজন্যই আমি নামায রোযা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এমন ভালো মৃত্যুর অধিক আশা করি।

-ছিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফারাবী।

কাফের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে সাক্ষাত

‘আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নির্জনে কাফেরদের (নিজেদের শয়তান) সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের সাথে আমরা কেবল ঠাট্টাই করেছি।

-সূরা বাকারা।

ফায়দাঃ ইসলামী বিশ্বের প্রশাসকরা সাধারণ মুসলমানদের সামনে এ ধরনের বক্তৃতাই দেয়; 'আমরা আমেরিকাকে দাদাগিরি করতে দিবো না। আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদীর জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমরা আমাদের ভূখণ্ডকে আফগানী মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দিবো না। আমরা ভারতকে আমাদের সমূদ্রে বাঁধ তৈরি করতে দিবো না। আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবী সহ্য করবো না। আমেরিকাকে ড্রোন হামলা করার অনুমতি দিবো না। আমরা মুসলমান। আমরা নিজেদের ভূখণ্ডে ভীনদেশী সেনা বাহিনী সহ্য করতে পারি না। কাশ্মিরীদের খুন নিয়ে কাউকে সওদা করতে দিবো না। আমরা পাক্কা মুমিন। সাচ্চা মুসলমান। কিন্তু এই লোকগুলোই যখন ভারত অথবা আমেরিকার শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরাতো আপনাদের সাথেই। আমাদের কওম বোকা, অবুঝ এবং উত্তেজনা প্রিয়। এজন্যই তাদেরকে বোকা বানানোর জন্য এই ভাষণ দিয়ে দিয়েছি।

জিহাদের বিরুদ্ধে বলতে সাবধান হোন

যাতে মুনাফিকরা চিহ্নিত হয়, যখন তাদেরকে বলা হলো, এসো আল্লাহর পথে কিতাল কর অথবা প্রতিরোধ কর, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম সেখানে কিতাল হবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম। তারা সেদিন ঈমানের তুলনায় কুফরের অধিক নিকটবর্তী ছিলো। তারা মুখে এমনসব কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। আর তারা যা কিছু গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা জানেন। যারা তাদের ভাইদেরকে বলল, (জিহাদে যেয়ো না) বসে থাক। যদি তারা (মুজাহিদরা) আমাদের কথা মেনে নিতো (জিহাদে না যেতো) তাহলে তারা নিহত হতো না। হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।

ফায়দাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুনাফিকরা কিতাল না হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসতো। কিন্তু

বর্তমানে তো মানুষ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে দেখছে, তারপরও মুজাহিদদের সাথে কিতালে বের হচ্ছে না। তাদেরকে সহযোগীতাও করছে না।

কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর মর্মান্তিক শাস্তি

'আপনি মুনাফিকদেরকে মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা মুসলমানদের ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধু বানায়, তারা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? নিশ্চয় সম্মানের মালিক তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই।

-সূরা নিসা/১৩৯।

'যারা তোমাদের কাজের ফলাফলের অপেক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো বিজয় এসে যায়, তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে নই? আর যদি কাফেরদের একটু প্রাধান্য এসে যায়, তাহলে তারা (কাফেরদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিনি? মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি?

-সূরা নিসা/১৪১।

মুনাফিক কেনো কাফেরদেরকে বন্ধু বানায়?

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আপনি তাদেরকে দেখবেন কাফেরদের নিকট দৌড়ে চলে যায়। তারা বলে, আমদের ভয় হয় না-জানি আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে যায়। হতে পারে মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিয়ে দিবেন অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা দিয়ে দিবেন। যারফলে মুনাফিকরা তাদের অন্তরে গোপন রাখা কথার ব্যাপারে লজ্জিত হবে।

-সূরা মায়েদা/৫২।

ফায়দাঃ আল্লামা তিবরী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি মুনাফিকদের ব্যাপারে সংবাদ যে, তারা ইহুদী নাসাদেরকে বন্ধু বানায় এবং ঈমানদারগণকে ধোকা দেয়। তারা বলতো, আমাদের ভয় হয় না-জানি ইহুদী নাসারাদের আযাব আমাদের উপর চলে আসে।

-তাফসীরে তিবরী।

কাফেরদের নিকট এজন্য যেতো, যেনো কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদ তাদের উপর না আসে। তাদের ভয়, যদি কাফেরদের সঙ্গ না দেয় তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

কাফেরদেরকে যারা বন্ধু বানায় তারা তাদেরই মতো

ইমাম তহাভী রহ. 'আকীদাতুত্তহাভী' গ্রন্থে বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, আমরা ইনসাফকারী এবং আমানতদারদের মহব্বত করি। জালেম এবং খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি।

-আকীদাতুত্তহাভী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, হে ঈমানদারগণ! ইহুদী নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।

-সূরা মায়েদা/৫১।

আল্লামা তিবরী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, যারা মুসলমানদের মুকাবেলায় ইহুদী নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলো, নিঃসন্দেহে তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা তাদেরকে বন্ধু বানালো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগীতা করলো, তারা তাদেরই দীন এবং মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ, যে কেউ কাউকে বন্ধু বানালে, সে তার বন্ধু এবং বন্ধুর দীনের অন্তর্ভূক্ত হয়। যেই দীনের উপর তার বন্ধু রাজি থাকে, সেও সেই দীনের অন্তর্ভূক্ত হয়। সুতরাং যখন তারা তাদের বন্ধু এবং তার দীনের উপর সন্তুষ্ট, তখন যে তার বন্ধু এবং বন্ধুর দীনের দুশমন হবে, সে তারও দুশমন হবে। ঠিক তেমনি ভাবে তার এবং তার কাফের বন্ধুরও একই হুকুম। আর এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

-তাফসীরে তিবরী ৬/২৭৭।

ইবনে কাইয়ূম যাওজী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে দিয়েছেন। আর তাঁর ফায়সালা থেকে উত্তম ফায়সালা হতেই পারে না। যে ব্যক্তি ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানালো সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যখন কুরআনের ফায়সালা অনুযায়ী ইহুদী

খ্রিস্টানদের বন্ধু তাদেরই অন্তর্ভূক্ত, তখন তাদের হুকুমও ইহুদী খ্রিস্টানদের মতই হবে।

-আহকামু আহলিয যিম্মাহ।

এছাড়াও অনেক আয়াত আছে, যেগুলোর মধ্যে কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি পিতা-মাতাও যদি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পছন্দ করে, তাহলে তাদের থেকেও বাধা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের পিতা-মাতা এবং ভাই-বোনেরা ঈমানের মুকাবেলায় কুফরকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। আর যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে তারা জালেম।

ইমাম আবু বকর যাচ্ছাছ রহ. বলেন, এই আয়াতে কাফেরদেরকে বন্ধু বানাতে, তাদেরকে সহযোগীতা করতে, তাদের সহযোগীতা নিতে এবং নিজের বিষয় তাদের হাতে সোপর্দ করতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি এই হুকুমও আছে যে, কাফেরদেরকে পবিত্র মনে না করা, বড় মনে না করা এবং সম্মান না করা ওয়াজিব। চাই সে কাফের নিজের মাতা-পিতা হোক অথবা বড় ভাই-বোন হোক। তবে কাফের পিতা-মাতার সাথে অনুগ্রহ এবং উত্তম ব্যবহার দেখানোর আদেশ করা হয়েছে। এই হুকুম মুসলমানদেরকে এজন্য করা হয়েছে যে, যাতে তারা মুনাফিকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। কারণ, মুনাফিকদের পরিচয় হলো, তারা কাফেরদেরকে বন্ধু বানায়। তারা যখন কাফেরদের সাথে মিলে, তখন তাদের প্রতি খুব সম্মান প্রকাশ করে। বন্ধুত্ব এবং গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করে।

-আহকামুল কুরআন লিল যাচ্ছাছ ৪/২৭৮।

অপর আয়াতে কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে এরশাদ হয়, মুমিনরা মুসলমানদের ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে না। আর যে এমনটি করবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুর ভয় কর। আর আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন।

-আলে ইমরান/২৮।

ইমাম শাওকানী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহর সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই। বরং সে সম্পূর্ণ বের হয়ে গেছে।

-ফাতহুল কাদীর।

ইমাম তিবরী রহ. বলেন, যে এমনটি করলো সে আল্লাহ তা'আলা থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুক্ত। কারণ, সে দীন থেকে ফিরে কুফুরীতে প্রবেশ করেছে।

-তাফসীরে তিবরী।

আল্লামা আলুছি রহ. তার প্রশিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মাআনীতে 'মুমিনদের ছাড়া' এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন, 'অথবা এতে এই কথার প্রতি ইশারা আছে যে, মুসলমানদের বন্ধুত্বের প্রকৃত হকদার কেবল মুসলমানই। আর মুসুলমানদের বন্ধুত্বের বিরোধী জিনিস হলো কাফেরদের বন্ধুত্ব। .... এতে এই কথার প্রতি ইশারা রয়েছে যে, কাফেরদের বন্ধুত্ব মুসলমানদের বন্ধুত্বের সাথে একত্রিত হতে পারে না।

-তাফসীরে রুহুল মাআনী।

মূর্তী পূজারীদের বন্ধু বানানেওয়ালা মুসলমানদের হত্যাকারী

আলী রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, শেষ যামানায় কিছু লোক আসবে যারা কম বয়সী এবং কম আকল বিশিষ্ট হবে। তারা সুন্নাতের কথা বলবে। তারা দীন থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর কামান থেকে বের হয়ে যায়। মূর্তী পূজারীদের ডাকবে এবং মুসলমানদের হত্যা করবে। সুতরাং যারাই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারী কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব পাবে।

-বুখারী শরীফ-কিতাবুল মানাকিব; হাদীস নং ৩৬১১, কিতাবু ফাযায়েলিল কুরআন; হাদীস নং ৫০৫৭, কিতাবু ইসতাতলাবাতিল মুরতাদ্দিন; হাদীস নং ৬৯৩০। এটি বর্ণনা করেন, আবু উমর দানি/২৮০।

মুনাফিক সবাইকে নিজের মতো বানাতে চায়

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাও? অথচ আল্লাহ তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের

কৃতকর্মের কারণে। তাহলে তোমরা কি তাদেরকে হেদায়াতের উপর নিয়ে আসতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য কোনো পথই পাবে না।

-সূরা নিসা/৮৮।

মুনাফিকদের দীলী তামান্না এটাই যে, তোমরাও কুফরী করে বসো যেমন তারা কুফুরী করেছে, যাতে তোমরাও তাদের বরাবর হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না, যতক্ষন না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে। সুতরাং যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও পাকড়াও কর এবং কতল কর। তাদেরকে বন্ধু এবং সাহায্যকারী বানিয়ো না।

-সূরা নিসা/৮৯।

ফায়দাঃ ইমাম তিবরী রহ. বলেন, এই আয়াত সেসব লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা কালেমা বলতো কিন্তু মুসলমানদের মুকাবেলায় মক্কার কাফেরদেরকে সহযোগীতা করতো। একবার তারা মক্কা থেকে আসলো এবং মুসলমানদের সামনে পড়ে গেলো। কিছু মুসলমান বললো, এই খবীসদের দিকে চল এবং তাদেরকে হত্যা কর। কারণ, তারা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের দুশমনদেরকে সহযোগীতা করে। তখন কিছু মুসলমান বললো, তোমরা কি সেসব লোকদেরকে হত্যা করতে চাও যারা তোমাদেরই মতো কালেমা পড়ে? তারা হিজরত করেনি এবং নিজের ঘর বাড়ি ছাড়েনি শুধু এজন্যই তাদের জান মাল হালাল করে নিবে? এভাবে ঈমানদাররা তাদের ব্যাপারে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। কোনো দলকে কিছু বললেন না। তখন এই আয়াত নাযিল হলো। যার মধ্যে এই লোকদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিলেন যে তারা মুনাফিক। যদি তারা ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে কতল করবে। এরা মন্দ লোক। তাদের দীলী তামান্না হলো তোমরাও তাদের মতো কুফুরী কর।

-তাফসীরে তিবরী।

এই মুনাফিকদের আন্তরিক ইচ্ছা এটাই যে সত্যিকারের মুসলমানরাও তাদের মতো হয়ে যাক। কেউ মর্ডারেট, কেউ বুদ্ধিজীবি, কেউ যুক্তিবাদী।

তাদের সকলেরই চেষ্টা মুনাফিকদের ধর্ম ছড়ানো হোক। যারা তাদের ধর্ম ছড়ায় তাদের খুব সম্মান দেয়া হয়। তাদেরকে টিভি চ্যানেলগুলোতে ডাকা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের দিকে মানুষকে ডাকে, যার মধ্যে জিহাদও আছে, সে সহনীয় নয়। তখন তাদের ধৈর্য এবং সহনশীলতা শেষ হয়ে যায়। উদারতা এবং সহিষ্ণুতা কাছেও আসে না।

আল্লাহর উপর ভরসা এবং মুনাফিক

যখন মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিলো, তাদের (মুসলমানদের) দীন তাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহান, প্রজ্ঞাময়।

-সূরা আনফাল/৪৯।

ফায়দাঃ তালেবানদের পিছনে হটার সময়কার সংবাদপত্র উঠিয়ে দেখুন। লেখকরা তালেবানদের ব্যাপারে কী কী লিখেছিলো। এরা আমেরিকার সাথে লড়াই করবে। মাদরাসার মোল্লা, যাদের দুনিয়ার কোনো খবর নেই, তারা মুকাবেলা করবে বর্তমানের উন্নত জাতি এবং নতুন টেকনোলজির একচ্ছত্র শক্তির সাথে। তারা বলতো, এটা কেমন ইসলাম? তালেবানরা ইসলামের অপব্যাখ্যা করছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো পাত্তাই নেই যে, ইসলামে কতটুকু নম্রতা আছে। তারা আমেরিকার সাথে কিভাবে লড়বে? কিন্তু এসব মুনাফিকদের জানা নেই, যারা প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ময়দানে বের হয়ে যায়, দুনিয়ার গোটা শক্তি তাদের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ে। এই জংলী, শয়তানী এবং মঙ্গল গ্রহের উপর নেতৃত্ব দানকারী কার্লচারের হিংস্র প্রাণীগুলোর লাশ আর কতো দিন কোলে নিতে থাকবে? বহনকারীরাও তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহান, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এখনও বুঝবে না।

মুনাফিকরা মুসলমানদের থেকে পৃথক

(মুনাফিকরা) তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলে, তারা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা তোমাদের দলভূক্ত নয়। বরং তারা অন্য জাতি।

-সূরা তাওবা/৫৬।

জিহাদ নিয়ে ঠাট্টাকারীরা মুনাফিক

যদি আপনি তাদের নিকট জানতে চান, তাহলে তারা বলবে, আমরা তো এমনি ঠাট্টা করছিলাম। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা কর?

-সূরা তাওবা/৬৫।

ইবনে জারির তবারী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। কিছু মুনাফিকও সাথে ছিলো। তারা পরস্পরে বলছিলো, বাহ! চমৎকার! দেখ এই লোক (মুহাম্মাদ) শামের মহল এবং কেল্লা বিজয় করতে যাচ্ছে। এই কথা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নিজের হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ কথা বলেছো? মুনাফিকরা বলল, আমরা এমনি ঠাট্টার ছলে বলছিলাম।

বর্তমানের মুনাফিকরাও মুজাহিদদের ব্যাপারে ঠাট্টা করে এবং এ ধরনের কথাই বলে। এই মোল্লা মৌলভীদের দেখ, তারা নাকি দিল্লি জয় করবে। লাল কেল্লার উপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াবে। তাদেরকে দেখ, ওয়াশিংটন জয় করতে বের হয়েছে।

জিহাদের আলোচনায় মুনাফিকদের প্রতিক্রিয়া

ঈমানদাররা বলে, কোনো সূরা কেনো অবতীর্ণ হয় না? সুতরাং যখন স্পষ্ট কোনো সূরা অবতীর্ণ হলো, যাতে কিতালের কথা আছে, তখন আপনি যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সেসব লোকদের দেখবেন, তারা আপনার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে, যেনো মৃত্যুর ভয়ে তাদের উপর নেশা সাওয়ার হয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য (আনুগত্যই) উত্তম।

-সূরা মুহাম্মাদ/২০।

ফায়দাঃ ইমাম তিবরী রহ. বলেন, যে সূরায় কিতালের আলোচনা এসেছে তা স্পষ্ট সূরা। আর এই জিহাদী সূরাগুলো মুনাফিকদের জন্য পুরো কুরআন শরীফে সবচেয়ে কঠিন।

-তাফসীরে তিবরী।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিজের ভিতরটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে যাঁচায় করা উচিত; তার ভিতরে এমন কোনো ব্যাধি তো প্রবেশ করেনি যেগুলোকে কুরআনে মুনাফিকদের আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে?

তারা (মুনাফিক) কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে?

-সূরা মুহাম্মাদ/২৪।

কাফেরদের জোটের সাথে মুনাফিকদের নানা চুক্তি

আপনি কি মুনাফিকদের দেখেননি, তারা তাদের আহলে কিতাবের কাফের ভাইদের সাথে বলে, যদি তোমাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়, তাহলে আল্লাহর কসম আমরাও দেশ ছেড়ে চলে যাবো। আমরা তোমারে ব্যাপারে কখনোই কারো কথা মানবো না। যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে খোদার কসম আমরা তোমাদের সহযোগীতা করবো। আর আল্লাহ সাক্ষি দিচ্ছেন, তারা মিথ্যা বলছে। যদি আহলে কিতাবের কাফেরদের দেশান্তরিত করা হয়, তাহলে তারা তাদের সাথে দেশ ছাড়বে না। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পিঠ প্রদর্শন করে ভাগবে। অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

-সূরা হাশর/১১-১২।

চটকদার কথায় ধোকা খাবেন না

যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদের দেহ আকর্ষণীয় মনে হবে। যখন তারা কথা বলবে, তখন আপনি তাদের কথা শুনুন। তারা যেনো টেক লাগানো লাকড়ি।

-সূরা মুনাফিকুন/৪।

হে নবী! আপনি কাফের এবং মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।

-সূরা তাহরীম/৯।

যাদুর ফেতনা

বর্তমান বিশ্বে হক বাতিলের চলমান লড়াইয়ে শরীক সকল শক্তি হককে মিটিয়ে বাতিলের বিজয় আনতে আপ্রান চেষ্টায় রত। এই যুদ্ধে ইবলিশ তার সকল শয়তানের পক্ষ থেকে সহযোগীতা প্রাপ্ত। বাতিল শক্তি সব ধরনের মৌলিক সরঞ্জামের পাশা পাশি শয়তানী অস্ত্রও ব্যবহার করছে। সেসব শয়তানী অস্ত্রের মধ্যে যাদুকে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যেমন কুরআনে কারীমের আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার দুশমন ইহুদীরা আল্লাহর শিক্ষার পরিবর্তে ইবলিশের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং তারা কল্যাণের জ্ঞান ছেড়ে শয়তানী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করলো। আল্লাহ তা'আলার এরশাদ, ইহুদীরা সেসব জিনিসের পিছনে পড়েছে, যেগুলো সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা পড়তো। কিন্তু সুলাইমান কুফুরী করেনি বরং শয়তানরা কুফুরী করেছে এবং মানুষকে যাদু শিখিয়েছে।

-সূরা বাকারা।

ইহুদীরা এই যাদু শিখেছে এবং প্রত্যেক যুগে হকের শক্তির ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। আল্লাহর এই দুশমনেরা যেমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে শেষ করতে চেয়েছে, তেমনি যাদুর মাধ্যমেও তার উপর হামলা করেছে। লাবিদ বিন আ'ছম নামক এক ইহুদী তার বোনদের সাথে মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করে। যার ফলে তিনি প্রায় ছয় মাস খুবই কষ্টে ছিলেন। এই ঘটনা ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং আহমদ রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনা, 'আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করা হয়েছে। (এমন কঠিন যাদু ছিলো

যে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন, তার স্ত্রীদের নিকট এসেছেন, অথচ তিনি আসতেন না। (বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, এই অবস্থা কেবল মারাত্মক ধরণের যাদুর কারণে হতো।) তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি স্মরণ আছে কোন বিষয়ে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে জানিয়ে ছিলেন? রাতে স্বপ্নে দু'জন লোক আমার নিকট আসলো। একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের নিকট বসে গেলো। যে আমার মাথার নিকট বসা ছিলো সে পায়ের কাছের লোককে বলল, তার কী অবস্থা? সে বলল, যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, তাকে কে যাদু করেছে? সে বলল, লাবিদ বিন আ'ছম। যে বনী যুরাইক গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। সে মুনাফিক এবং ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কোন বস্তুর মধ্যে যাদু করা হয়েছে? সে বলল, মাথার চুল ও চিরুনীর মধ্যে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় রেখেছে? দ্বিতীয়জন বলল, বনী যারওয়ানের কুপের মধ্যে পাথরের চাকতির নিচে ভিজা খেজুর গাছের ছালের মধ্যে। আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই কুপের নিকট আসলেন এবং তা বের করলেন। অতঃপর বললেন, এটা সেই কুপ যা আমাকে দেখানো হয়েছিলো। এর পানি মেহেদী পাতা গুলানো পানির মতো ছিলো। সেখানের খেজুর গাছগুলো শয়তানের মাথার মতো ছিলো। আমি বলেছি হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের থেকে বদলা নিন। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে আরোগ্য দান করেছেনই। আমি মানুষের মধ্যে খারাপি বিস্তার করা পছন্দ করি না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদীরা এই যাদুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তারা যাদুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি পর্যায়েও ব্যবহার করছে এবং সামষ্টিক ভাবেও উম্মতের উপর ব্যবহার করছে।

উলামায়ে হকের উপর যাদু করা

হিন্দু এবং ইহুদী, দুই দলই উলামায়ে হকের উপর যাদু করে। যাতে তাদেরকে শারীরিক অথবা মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত করে দিতে পারে। আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে কয়েকজন বুযুর্গের উপর দীনের দুশমনদের পক্ষ থেকে যাদু করা হয়েছে। যাদুকরদের আক্রমণ এবং সাহস এতটা বেড়ে গেছে যে, উলামায়ে কেরামের উপর তাদের মসজিদে এসে যাদুর আক্রমণ করছে। করাচীতে আমাদের এক মুহতারাম মুফতী সাহেবের সাথে এমন ঘটনা ঘটেছিলো। মুফতী সাহেব নিজের মসজিদে যিকিরে মশগুল ছিলেন। একজন অপরিচিত লোক আসলো এবং মুফতী সাহেবের সামনে এসে বসে পড়লো। সর্বপ্রথম সে পুরো মসজিদকে নযরবন্দি করলো। অতঃপর মুফতী সাহেবকে তার নাম ও মসজিদের নাম বললো। তারপর সে বলল, আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। সে তার বাতেনি তাসাররুফের মাধ্যমে মুফতী সাহেবের অন্তরে হামলা করলো এবং বলল আমি তোমার নবী। আমি তোমার খেদমত করতে এসেছি। মুফতী সাহেব দরুদ পড়তে লাগলেন। কিন্তু এই যাদুকর মুফতী সাহেবের অন্তরে ভালো ভাবেই হামলা করেছিলো। সে নিজেকে এভাবে উপস্থাপন করছিলো যে, আমি তোমার খেদমত করতে এসেছি। অনেক সময় পর্যন্ত মুফতী সাহেবের অন্তরের অবস্থা অন্যরকম ছিলো। মুফতী সাহেব ধারাবাহিক দরুদ শরীফ পড়ছিলেন। কিন্তু অন্তরের অবস্থা তেমন ছিলো না, যেমন অন্য সময় যিকির করলে থাকে। পরিস্কার এ কথা অনুভব হচ্ছিলো যে, সে যাদু দ্বারা বাতেনি হামলা জারি রেখেছে। মুফতী সাহেব বলেন, সেই লোক তিনদিন পর্যন্ত ছিলো এবং ধারাবাহিক কলবের তাসাররুফের মাধ্যমে তার আকীদা ধ্বংস করার চেষ্টা করতে থাকে। যখন তার বাস্তবতা বুঝে আসলো, তখন জানা গেলো সে ইজরাঈল থেকে এসেছিলো। তার এই যাদুর প্রভাব মুফতী সাহেবের ঘরেও পড়েছে। এমনকি সেই জালেম দোকান থেকে আনা সওদা পাতির উপরও যাদু করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের হেফাজত করুন।

পরস্পরের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি
যাদুর মাধ্যমে অন্তরসমূহে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা
মেধা হস্তগত করা

শহরগুলোতে বর্তমানে যাদুর অধীনে বিশাল অবস্থা। করাচী, ইসলামাবাদ, লাহোর, কুয়েটা, পেশোয়ার ইত্যাদি শহরে যাদু শিখা, শিখানো এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাদু করা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। করাচীতে একজন ডাক্তার যাদু শিখানোর এক ক্লাসে পনেরো হাজার রুপিয়া ফিস নিচ্ছে। বড় বড় হোটেলগুলোতে এই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মিউজিক শোনানো হয়। তারপর ধ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর যে কোনো ব্যক্তির মস্তিস্ক আয়ত্বে নেয়ার কৌশল শিখানো হয়। এটি নিরেট শয়তানী কাজ। মিউজিকের মাধ্যমে শয়তান আসে। অতঃপর শয়তান তাদের পক্ষে কাজ করে।

শয়তানী প্রভাবের ফলে মুসলমানদের ঘরে বরকতহীনতা

বিভিন্ন আলামত যেমন নক্ষত্র, ঢেউয়ের চিত্র, সাপের সিড়ি, কুকুর, শুকর এবং গাভীর কার্টুন ইত্যাদির উপর যাদু করে মুসলমানের ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল

এর জন্য ইহুদী এবং হিন্দুরা বিশেষ ধোকাবাজির মাধ্যমে কাজ করছে।

যাদুর প্রকারভেদ

যাদু দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো য কেবল ধারণা, ভেল্কিভাজি এবং নজরবন্দীর সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে কোনো বাস্তবতা নেই। দ্বিতীয় প্রকার যাদু বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক রাখে। হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ইমামগণের রায় অনুযায়ী এর প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরে পরিলক্ষিত হয়।

ইহুদী বড় যাদুকর

ইহুদীদের নিকট রুহানী জ্ঞানকে কাবালাহ বলে। কিন্তু এই রুহানিয়াত সেটি নয়, যা সম্পর্কে ইসলাম ধারণা দিয়েছে। ইহুদীদের রুহানিয়াতের বড় অংশ শয়তানী, নিকৃষ্টতা এবং যাদুর সাথে সম্পৃক্ত। কাবালাহ ওই জ্ঞান, যাতে মানুষের বিবেককে আয়ত্বে আনার সকল পদ্ধতি শিখানো হয়। আর তা হয়ে থাকে যাদু, ইলেক্ট্রিক তরঙ্গ, হেপনাটিজম (আকর্ষণী বিদ্যা) এবং টেলিপিথির মাধ্যমে। কাবালার বাস্তবতা ইহুদী ধর্মগুরুরাই জানে। অন্যদের থেকে গোপন রাখতে তারা একে কাছাকাছি বিভিন্ন নামে পরিচিত করিয়েছে। যেমন কবালাহ, কিবালাহ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কোনটি আসল তা চেনা সত্যিই বড় মুশকিল ব্যাপার। ইহুদীদের মধ্যে বড় থেকে বড় যাদুকর রয়েছে। তারা এই শয়তানী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেতনা ছড়িয়েছে। মুসলমানদের নানারকম ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। এই আলোচনা এখানে পেশ করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মুসলমানগণ সেসব আক্রমণকারীদের থেকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের হেফাজত করতে সচেষ্ট হন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনেরা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, মস্তিস্কের গোলামীতে লিপ্ত থাকার কারণে আমরা পৃথিবীতে ঘটমান নিত্য নতুন ঘটনাগুলোকে কেবল সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখি যেমনটি ইসলামের দুশমনেরা আমাদের দেখাতে চায়। যারফলে সেসব ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে উল্টো গবেষণার গোমরাহীতে চলে যাই। নিচে যেসব লোকের আলোচনা করা হচ্ছে, তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক রকম এবং বাস্তবে অন্যরকম। আমাদের উচিত দীনের দুশমন থেকে হুঁশিয়ার থাকা, চাই সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক। সেসব গোপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু নাম দেয়া হলো।

১. আবু ঈসা আস্পাহানী। ঈসায়ী অষ্টম শতাব্দির শুরুতে ছিলো। ইহুদীদের দাবী, খেলাফতে বনী উমাইয়ার যুগে মুসলমানদের পরস্পরে খুনাখুনি তারই বাতেনী তাসাররুফের ফলাফল।

২. ইবরাহীম আবুল আফিয়া। সে স্পেনের এক ধনী পরিবারের লোক। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফিরে এসে সে নিজেকে ঈসা মসীহ হওয়ার ঘোষণা করলো। সে এই পরিমাণ বাতেনী শক্তির মালিক ছিলো যে, নিজের যাদুবলে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় বড় আধ্যাত্মিক নেতা, তৃতীয় পোপ নেকোলাসকে তাসাররুফে কলবী দ্বারা ইহুদী বানানোর চেষ্টা করে। পোপ নেকোলাশ যখন এই চক্রান্ত সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন নিজের ঘোষণার দ্বারা লানত করলো এবং তাকে মৃত্যুর শাস্তি শুনিয়ে দিলো। কিন্তু আবুল আফিয়ার ফাঁসির তিন দিন আগে পোপ নেকোলাস নিজেই মারা যায়। পরবর্তীতে খ্রিস্টান আদালত তাকে জীবিত বলি দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে শাস্তি দানকারী সকল কর্মচারীকে যাদুগ্রস্ত করে ফেলে। ফলে তারা তাকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়।

৩. দশম লি মুলান। সে ষোড়শ শতাব্দিতে নিজের বাতেনী শক্তি দ্বারা খেলাফতে উসমানিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে থাকে। তার দাবি ছিলো, সে মুসলমানদেরকে শেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাস ফেরত যাবে।

৪. সাবাতাঈ জেভী (১৬২৬-১৬৭৬)। সে ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে সমরনা নামক জায়গায় (বর্তমানে তুর্কির আযমীর) এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা ইউরোপের বড় দুইটি ব্যবসায়ী সংগঠনের পৃষ্টপোষক ছিলো। সে নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী। আরবী এবং ইবরানী ভাষার বড় পণ্ডিত ছিলো। এমনকি কাবালারও দক্ষ সমঝদার ছিলো। ইহুদীরা তাকে খুবই দুনিয়া বৈরাগী আবেদ মনে করতো। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সে নিজেকে নবী হওয়ার দাবী করলো। তখন দুনিয়াতে তার প্রশিদ্ধতা ছড়িয়ে গিয়েছিলো। সে মিশরে গিয়ে পুলিণ্ডার এক যাযাবর, নির্লজ্জ নারীকে যখন বিবাহ করে, তখন এই সংবাদে বিশ্বের ইহুদীদের মধ্যে বিদ্যুত খেলে যায়। কারণ, কোনো দুনিয়া বৈরাগী আবেদ পণ্ডিত, যাযাবর নির্লজ্জ নারীকে বিবাহ করা ইহুদীদের নিকট মসীহ হওয়ার নিদর্শন ছিলো। সুতরাং তারা যে বিষয়টির অপেক্ষায় ছিলো, সে নির্লজ্জ ইহুদী নারীকে বিবাহ করে ফেলে। সেই নারীর ঘোষণা ছিলো, মসীহ ছাড়া আর কেউ তাকে বিবাহ করতে পারবে না। তাই তার খোদা তাকে অনুমতি

দিয়েছে যে, মসীহ আসা পর্যন্ত সে যার সাথে ইচ্ছা শারিরীক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। (যেই মসীহ এর স্ত্রী একজন ব্যভিচারিনী হবে সেই দাজ্জালের উপর আল্লাহ লানত।)

-মাউসুআতুল ইয়াহুদী ওয়াল ইয়াহুদিয়া, আব্দুল ওহ্হাব মুসাইরী।

সাবাতাঈ জেভী ইহুদীদেরকে সকল ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেয় এবং সকল শরীয়তকে খতম করার ঘোষণা দেয়। সাবাতাঈ জেভী ইহুদী ইতিহাসে এমন এক নাম, যে ইহুদিয়াতকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে এবং নতুন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। যা সকল ধর্মীয় বিধি নিষেধ এবং শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। নতুন যুগের সায়হুনি আন্দোলন যেটি থিওডর হার্জেল (১৮৬০-১৯০৪) প্রতিষ্ঠা করে, মূলত তার ভিত্তি সাবাতাঈ-ই রেখে গিয়েছিলো। হার্জেল নিজেই সাবাতাঈ এর ভক্ত ছিলো।

৫. ইয়াকুব ফ্রেঙ্ক (জেকভ ফ্রেঙ্ক ১৭২৬-১৭৯১)। সে ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনে জন্ম গ্রহণ করে। সেও অসাধারণ বাতেনী শক্তির অধিকারী ছিলো। সে ইউক্রেন ছেড়ে তুর্কীতে চলে যায় এবং ‘দুঁমাহ’ এর রুকন হয়ে যায়। ‘দুঁমাহ’ ইহুদীদের রুহানী শক্তির নেতৃবৃন্দের ওই দল, যারা যাদুশক্তি দিয়ে খেলাফতে উসমানিয়াকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। এই দলই উনিশ শতাব্দির শেষ দিকে খলিফা আব্দুল হামিদ ছানির নিকট ফিলিস্তিন বিক্রির সওদা নিয়ে গিয়েছিলো। এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলো আফন্দী। এই আফন্দী নগ্ন মিল্লাত, নগ্ন দীন, কামাল আতাতুর্কের মুরব্বী ছিলো। এই সেই আফন্দী, যে খলীফার নিকট খেলাফত শেষ করে দেয়ার ফরমান নিয়ে গিয়েছিলো। জেকব ফ্রেঙ্ক সেই ইহুদী, যে বিশ্ব ইহুদীদের জন্য যৌন স্বাধীনতাকে মৌলিক ধর্মীয় নিদর্শন করেছে। সে কৃত্রিম যৌনতাকে খোদাকে পাওয়ার পদ্ধতি বলেছে। সে খোদার নৈকট্য এবং সে পর্যন্ত তারাক্কি লাভের এই পদ্ধতি বলেছে যে, মানুষ যত নিকৃষ্ট হবে, শরীয়তের আঁচলকে যত টুকরো টুকরো করবে ততই খোদার নৈকট্য লাভ হবে।

-মাউসুআতুল ইয়াহুদী ওয়াল ইয়াহুদিয়া, আব্দুল ওহ্হাব মুসাইরী।

৬. সাঈদ আরমানী। ইতিহাসে তাকে সারমুদ নামে আখ্যায়িত করে। সে আলমগীর আওরঙ্গজেব রহ. এর যুগে ছিলো। তাকে বাতেনী শক্তিতে

দক্ষ মনে করা হতো। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব রহ. তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

৭. ইসরাঈল বিন ঈলীযর (১৭০০-১৭৬০)। বালশেম টভ নামেও সে পরিচিত। সে ইহুদীদের হাসিদিজম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনে জন্ম গ্রহণ করে। সে মারাত্মক ধরনের বাতেনী শক্তির অধিকারী ছিলো। স্পর্শ করে কঠিন রুগীদের ভালো করে দিতো। পানির উপর চলতো। দৃষ্টি দিয়ে গাছ এবং জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে ঝলসে দিতো। যাদুর মাধ্যমে অসম্ভব কাজ করে দিতো। সে দাবি করতো সে সরাসরি খোদার সাথে সম্পৃক্ত। তার সুপারিশে খোদা পাপী ইহুদীদের নাজাত দেন। তার সকল প্রচেষ্টা খেলাফতে উসমানিয়া ধ্বংস করার পিছনে ছিলো। সে ইহুদীদের অনেক উপকার করেছে। তার বিরোধীরা তাকে নারীপাগল কামুক বলত। তার ঘটনা ধারাবাহিক (মুতাওয়াতের) পর্যায়ের প্রশিদ্ধি লাভ করে। সেগুলোর একটি হলো, একবার এক যুবতী নারী তার পাশে বসা ছিলো। সে তার জন্য দু'আ করছিলো। দু'আ করা অবস্থায়ই সে গর্ভবতী হয়ে যায়।

-মাউসুআতুল ইয়াহুদ ওয়াল ইয়াহুদিয়া ১৪/৪৮৯।

মনে রাখতে হবে এটা কোনো সাধারণ আন্দোলন নয়। বরং এই আন্দোলন গোটা ইহুদী জগতকে তার আয়ত্বে নিয়ে আসে। এমনকি আজও তাদের একটি বড় অংশ এর উপর আমল করছে। সে মাদকাসক্ত এবং নেশা সৃষ্টিকারী ঔষধ সেবনে অভ্যস্ত ছিলো।

৮. জেভি হিরশ কালিশার (zevi Hirsch kalischer)। সে ১৭৯৫ সালে জন্ম গ্রহণ করে। সে পোল্যান্ড বংশদ্ভোত ছিলো এবং জার্মানিতে আত্মপ্রকাশ করে। ইহুদীবাদ প্রত্যাবর্তনের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের সকল ইহুদী এবং অনইহুদী গোটা শক্তিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে তার যাদুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। প্রশিদ্ধ ইহুদী পুজিবাদী মেয়ার এ্যামশল রুথশিল্ডকেও সে এই মিশনে কাজে লাগায়। খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে সকল বাতেনী শক্তিকে একত্র করা তারই কারসাজি। সে-ই ইহুদীদেরকে এই আধুনিক চিন্তা চেতনা দিয়েছে যে, মসীহ এর আগমনের জন্য আমাদেরই রাস্তা তৈরি করতে হবে।

তাদেরকে ছাড়াও বহু প্রশিদ্ধ ইহুদী যাদুকর ইতিহাসে বিদ্যমান। যারা এ পর্যন্ত পৌছতে নিজেদেরকে মসীহ দাবি করেছে। নিজেদের যাদুর তাসাররুফকে ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

রক ফেলার্জ মুকুটহীন বাদশাহ

রক ফেলার্জ বংশগত বিপটিস্ট হলেও মূলত ইহুদী এবং শয়তানের পুজারী। এই বংশ সেই পাঁচ কাবালাহ খান্দানের অন্তর্ভূক্ত, যারা ইহুদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জালের আগমনের সময় তার বিশেষ উপদেষ্টা হবে। রক ফেলার্জ গোটা পৃথিবীর নিকট এই ধারণায় পরিচিত থাকা সত্ত্বেও খুবই গোপনীয় ভাবে পর্দার আড়ালে থেকে বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং ধর্মীয় কলকাঠি নাড়ছে। তাদের জীবনের একটা অংশ; যা মানুষ অল্প বিস্তর জানে যে, তারা ব্যবসা, ব্যাংকিং, কৃষি, সাংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। অথচ তারা এসব কাজের আড়ালে ইহুদী শয়তানী মাকসাদকে এই পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌছাতে লিপ্ত যে, দুনিয়া থেকে ইসলামকে বিদায় করে শয়তানের নতুন ধর্ম 'নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড' দুনিয়াতে প্রচার করবে এবং মসীহে মাওউদ (কানা দাজ্জাল) আগমনের পথ সুগম করবে। এছাড়াও বাতেনী জ্ঞান (Mysticism) এর মাধ্যমে ইহুদী বিরোধী শক্তিগুলোকে ধ্বংস করা, হলিউড, বিশ্ব মিডিয়া এবং পৃথিবীকে যাদুর মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা চেতনা অনুযায়ী সাজানো। আই.এম.এফ. এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে বিশ্বের ধন দৌলতকে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে যাওয়া। স্বল্প কথায় এভাবে বলা যায়, এই নাপাক খান্দান, ইহুদীবাদ এবং দাজ্জালী মিশনের জন্য নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক মঞ্চে বিভিন্ন দেশে যে নাটক মঞ্চায়িত হচ্ছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে এর পিছনে আমেরিকার হাত রয়েছে, কিন্তু রক ফেলার্জ এমন এক নাম যাদের ইশারায় আমেরিকার হুকুমতও ভাঙ্গে গড়ে। আমেরিকার যে কোনো রাষ্ট্র প্রধান হোয়াইট হাউজে ততক্ষন পর্যন্ত সসম্মানে থাকতে পারে, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের লিখিত নাটকে তাদের দীক্ষা অনুযায়ী অভিনয় করে। কিন্তু

কেউ যদি সামান্যতম নিজের মর্জি অনুযায়ী নাটকে কোনো পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তার পরিণতি আমেরিকার ইতিহাসে কালো অথবা লাল পৃষ্টায় দেখা যায়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্র প্রধান আবরাহাম লিঙ্কন নিহত হয় ১৫ এপ্রিল ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ, জন এফ. কেনেডি নিহত হয় ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ। জন এফ. কেনেডির ভাই এবং তার ছেলেকেও হত্যা করা হয়েছে। এর কিছুটা সাবেক রাষ্ট্র প্রধান বিল ক্লিন্টনও অনুভব করেছে যে, কিভাবে হোয়াইট হাউজের মালিকরা তার জীবনের গোপন অধ্যায়কে পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে।

এই খান্দানকে আপনি পৃথিবীর মুকুটহীন বাদশা বলতে পারেন। আপনি হয়তবা এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করবেন, কারণ এ সম্পর্কে মানুষের তেমন একটা জ্ঞান নেই। কিন্তু বর্তমানে যেসব বিশ্ব সংস্থা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের সবকটির মালিক তারা। জি হ্যাঁ! আমি সত্য কথা উচ্চারণ করছি। পৃষ্টপোষক, চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর অথবা এ ধরনের যে কোনো শব্দ তাদের মুকুটহীন বাদশাহীর অর্থ বুঝাতে যথেষ্ট নয়। এই খান্দান আই.এম.এফ. এবং বিশ্ব ব্যাংকের মালিকদের অন্তর্ভূক্ত। জাতিসংঘ তাদের ঘরেই বানানো হয়েছে। আমেরিকা এবং গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কাউন্সিল আনফারেন রিলেশন (C.F.R) এর প্রতিষ্ঠাতা তারাই। আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ সি.আই.এ, মিডিয়া এবং হলিউড থেকে নিয়ে আমেরিকান সকল প্রতিষ্ঠানের উপর এই C.F.R এর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নাম হিসেবে যদিও এটি বাহ্যিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এটি সেই প্রতিষ্ঠান যা গোটা আমেরিকাকে চালায়। আমেরিকার রাষ্ট্র প্রধান থেকে নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ পর্যন্ত এর সদস্যদের যাতায়াত। রাষ্ট্র প্রধান যে দলেরই হোক না কেনো C.F.R এর সদস্য হওয়া আবশ্যক। এমনি ভাবে নতুন নতুন টেকনোলজির মালিকও তারাই। প্রাণীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা, ধ্বংসাত্মক রোগ, বিশেষত এইডস ছড়ানোর পদ্ধতি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, W.H.O. মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাশা ইত্যাদিতে রক ফেলার্জ কার্যকরী প্রভাব খাটায়। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা বড় ধরণের অর্থ প্রদান করে। মহাকাশ,

প্রতিরক্ষা এবং Genetic ময়দানে নতুন নতুন টেকনোলজি তাদেরই পরীক্ষাগার থেকে আবিস্কার হয়ে তাদেরই ফ্যক্টরীতে তৈরি হয়। তারপর আমেরিকার হুকুমতের কাছে বিক্রি করা হয়। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, যখন আমরা কোনো টেকনোলজি যেমন ড্রোন বিমান অথবা ব্যাংক ইত্যাদির ব্যাপারে এ কথা জানতে পারবো, এটি আমেরিকান তখন এ কথা জরুরী নয় যে, এটি আমেরিকার মালিকানাধীন। বরং সেটি সেই ইহুদীদের মালিকানাধীন, যারা সেখানকার প্রতিটা ইঞ্চির মালিক। এমনকি রক ফেলার্জ সম্পর্কে লেখকরা এ কথাও লেখেছেন, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা তাদের মালিকানাধীন। আমেরিকার হুকুমত এবং সাধারণ লোকেরাও তাদের ঋণের মধ্যে গর্দান পর্যন্ত ডুবে আছে। তেমনি ভাবে কোথাও ন্যাশনাল ব্যাংক অথবা ফেডারেলারিজ ব্যাংক দেখলে এ কথা জরুরী নয় যে, সেটি সে দেশের সরকারের অথবা কোনো গ্রুপের। ইহুদীরা এমনি ভাবে বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ধোকা দিচ্ছে। এমনকি তাদের গোপন আস্তানার নাম মসজিদের নামেও রাখে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্রের কারখানার মালিক তারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪৫-১৯৩৯) উভয়টাতে পশ্চিমা জোটকে তেল এবং অস্ত্র সরবরাহ করেছে এই খান্দানের কোম্পানী। ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকাকে জড়ানোর হোতা এই খান্দানই ছিলো। অথচ এরপর গোয়েন্দা রিপোর্টের ফলাফল তাই ছিলো, যেমনটি ছিলো ইরাক যুদ্ধের পর। গোটা বিশ্ব পেরেশান, কোন সে মহা শক্তি, যা সি.আই.এ এর মতো গোয়েন্দা সংস্থাকে ভুল তথ্য দিয়ে, সমগ্র বিশ্বকে মিথ্যা ধারণার উপর রেখেই ইরাকে হামলার ব্যাপারে তৈরি করে ফেলে। অথচ সি.আই.এ দাবী করে তারা নিজেদের স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে সব কিছু দেখতে পারে। মানুষ বুশকে অভিশাপ দেয়, গালি গুলুজ করে, কিন্তু তারা এ কথা জানে না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্বল প্রেসিডেন্ট হয়। যার হাতে কিছুই থাকে না। এমনকি তার বেডরুমেরও পুরো নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকে না। কারণ সেটাও ইহুদীদের গোপন ক্যামেরার সামনে থাকে। মধ্য এশিয়ার নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে নাস্তানাবুদ করার জন্য, রুশদের মধ্যে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের জন্য টাকার যোগান দিয়েছে ডেভিড রক

ফেলার। যার আলোচনা পরে আসছে। মডার্ণ দুনিয়ার পছন্দ অপছন্দ, চাল-চলন, উঠা বসা, খানা পিনার ধরন, মোটকথা গোটা লাইফ স্টাইল কেমন হবে তা সিদ্ধান্ত নেয় এই খান্দানের মেয়েরা। জি হ্যাঁ! হলিউড চালায় এই খান্দানের মেয়েরা।

-উপরের সকল তথ্য ফার্ডিনাণ্ড ল্যান্ডবুর্গ এর লিখিত পুস্তক The Rockfeller Syndrome থেকে নেয়া হয়েছে।

এই খান্দানের বিশেষত্ব হলো, তারা পর্দার আড়ালে থেকে আমেরিকাকে ব্যবহার করে। এমনকি এই খান্দানের মেয়েদেরও এ কথা শিখানো হয়, তারা যেনো বলে আমরা সাধারণ জীবন যাপন করি। যাতে মিডিয়ার দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকতে পারে। যদি তাদের কখনো কলেজ থেকে ফিরার পথে নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষাও করতে হয়, তাহলে কোনো এক আড়ালে দাঁড়ায়।

দাজ্জালের মিডিয়ার কারামতি দেখুন টেক্স ফাকিদাতাকে মানুষ বন্ধু এবং কল্যাণকামী বলে। পাকিস্তানের আমদানি মন্ত্রী শওকত আযীয, পচিশ বছর এই খান্দানের চাকরি করেছে। আফগানিস্থানে আমেরিকার হামলা, দখলদারি এবং সকল অপারেশন এই খান্দানের এক ২২ বছরের যুবক পরিচালনা করেছে। তালেবানের পিছু হটার পর সর্বপ্রথম সেই যুবকই কাবুল এসেছিলো। সে নিজস্ব বিমানে সেখানে পৌছে। পশ্চিমা ভাষায় তাকে মাষ্টার বলা হয়। কিন্তু একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে, রক ফেলারের এই অগ্রযাত্রা তাদের ব্যক্তিগত পরিশ্রমের চেয়ে দার্শনিক, শয়তানি ফেরকা এবং 'ফ্রি ম্যাশনের' সকল শাখা প্রশাখার সহযোগীতায় হয়েছে। সকল ইহুদীদের মিশন এক। যদিও বাস্তবায়নকারীরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী নিজের জায়গায় থেকে কাজ করা অবস্থায়, অন্যকে সহযোগীতা করে। যেমন, যদি কোনো অভিনেতা, লেখক, কবি অথবা সাহিত্যিক দাজ্জালের মিশনের জন্য একনিষ্ঠ হয়, তাহলে দুনিয়ার তামাম ইহুদী গোপন শাখাগুলো তাকে সাহায্য করবে। আর দেখতে দেখতে সেই লেখক অথবা সাহিত্যিক দুনিয়ার দিগন্ত জুড়ে প্রশিদ্ধি লাভ করবে। এই বিষয়টি আপনি এভাবেও বুঝতে পারেন যে, পৃথিবীর সকল ভালো শক্তিগুলো যেমন ভালো শক্তির সাথে থাকে, অর্থাৎ

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তিনি তা ফেরেশতাদের মধ্যে ঘোষণা করেন। সকল ফেরেশতা তখন তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। তারপর ফেরেশতারা দুনিয়াতে ঘোষণা করে, আসমান ওয়ালা ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসে সুতরাং হে দুনিয়া বাসী! তোমরাও তাকে ভালোবাস। এমনি ভাবে হকপন্থীদের অন্তরে তার ভালোবাসা জন্মে। রহমানী সকল শক্তি তার রক্ষনাবেক্ষণ এবং সহযোগীতার জন্য একত্রিত হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে ইবলিশ যার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে তার বিশেষ চেলাদের কাছে তা প্রকাশ করে। তার চেলারা পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার চেলাদের অন্তর্ভূক্ত সকল শয়তান, জিন এবং মানুষ তার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য তৈরি হয়ে যায়। সম্ভবত এসব কথা আমাদের নিকট খুব অশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। কারণ, একের পর এক আক্রমণের শিকার হওয়ার পরও আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের কোনো শত্রু আছে এ কথা মানতেই প্রস্তুত নই। আমাদের বিশ্বাস এমন হয়ে গেছে, ইহুদী, হিন্দু এবং খ্রিস্টান সবাই আমাদের ভাই। আমাদের এই অনুভূতিও নেই যে, আমাদের মুকাবেলা হচ্ছে এমন দুশমনের সাথে যারা দিন রাত এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত, কিভাবে আমাদেরকে তারা দীন থেকে বিমুখ করে দিবে। অধিকাংশ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে প্রশিদ্ধ ইহুদী খান্দানের কোম্পানিগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে যাচ্ছে। ব্যবসার জগতে যদিও তা একটি মামুলি তিজারতি ব্যাপার কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, তারা মুকুটহীন বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতির পাবন্দী করে থাকে এবং দাজ্জালের আগমনের পথ সুগমের ক্ষেত্রে সকলেই একই সূত্রে গাঁথা। উদাহরণত আপনি রুথ শিলার্ড খান্দানকেই দেখুন, তারা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। জি.পি. মর্গানও বিশ্ব ব্যাংকিংয়ে কারো থেকে পিছিয়ে নেই। কিন্তু আসল মিশনের ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে ঐক্য এবং একনিষ্ঠতা রয়েছে। অথচ ইহুদীদের পয়সা কামানোর ধান্ধা এ কথা দাবি করে যে, তাদের পরস্পরে নাছোড় হওয়া উচিত। বিশেষত যখন এক কোম্পানি অপর কোম্পানি ক্রয় করতে চায় এবং দ্বিতীয় কোম্পানি বিক্রি করতে না চায়। অথচ তখনও

তৃতীয় কোনো শক্তি এসে বড় বড় লেনদেনগুলো ঐক্যের মাধ্যমে সমাধান করে ফেলে। সম্ভবত এ থেকেই কোনো কোনো বিশ্লেষক এই সমাধানে পৌছেন যে, এসব কিছুর পেছনে তাদের গ্র্যান্ড মাষ্টার দাজ্জাল রয়েছে। যে সবকিছু দেখা শুনা করছে এবং তাদেরকে নিজের টার্গেট অনুযায়ী পরিচালনা করছে।

রক ফেলার্জ খান্দানের প্রধান বাহু সেই ব্যক্তি, যে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের মধ্যে বড় প্রভাব হলো ওই খান্দানের মা, জোহন ডি রক ফেলার জুনিয়রের স্ত্রী Abby Aldrich Rockfeller এর। ছোটবেলা থেকেই নিরেট ধর্মীয় ভিত্তির উপর বাচ্চাদের তারবিয়াত দেয়া হয়েছে। তাদের ইহুদী হওয়ার কারণে তারা দুনিয়ার সকল জাতি থেকে উত্তম হওয়ার ধারণা তাদের অন্তরে বসানো হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ঘরে প্রভাতি দু'আর আয়োজন হচ্ছে। প্রত্যেক বাচ্চার জন্য তাতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। যদি কোনো বাচ্চা শরীক না হয়, অথবা দেরিতে আসে, তাহলে তার উপর জরিমানা করা হয়। যা তাকে নিজের পকেট খরচ থেকে দিতে হয়। সেসব বাচ্চাদেরকে ইজরাঈলের হেফাজত এবং প্রশস্ততম ইজরাঈলী বসতির গুরুত্ব ছোটবেলা থেকেই বুঝিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং রক ফেলার্জ পরিবার আমেরিকাতে এমন বহু সংগঠনকে অর্থ সরবরাহ করছে যারা তাদের মসীহে মাওউদ কানা দাজ্জালের Anti Christ আগমনের পটভূমি তৈরির জন্য কাজ করছে। যা শয়তানের পূজাকারী দলের Sanatist টার্গেটের অন্তর্ভূক্ত। রক ফেলার্জের ব্যাপারে ইংরেজ লেখকগণ ইহুদীবাদী গোপন সংগঠন নূরানিয়্যীন Illuminati এর সাথেও তাদের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত: এই খান্দান ওই পাঁচটি কাবালা খান্দানের সাথে সম্পর্ক রাখে, যারা তাদের ধারণা অনুযায়ী সরাসরি দাজ্জালের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং তার বিধি বিধান অনুযায়ী পৃথিবীর রাজনৈতিক দাবা নিয়ে খেলবে। সুতরাং নূরানিয়্যীন, কাবালাহ ও ফ্রী মেশনের সকল শাখা এবং ইহুদীবাদী অন্যান্য গোপন সংগঠনের পৃষ্টপোষকতা রক ফেলার্জ ও অন্যান্যরা করে।

জোহন ডি রক ফেলার

রক ফেলার্জ খান্দানের সবচেয়ে বড় দাদা, জোহন ডি রক ফেলার ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে জন্ম গ্রহণ করে। ষোল বৎসর বয়সে সে কেরানীর কাজ শুরু করে। ১৮৬২ সালে সে তেলের ব্যবসা শুরু করে এবং Standard Oil Company গঠন করে। দেখতে দেখতে একজন কেরানী, গোটা আমেরিকার শতকরা ৯০ ভাগ তেলের মালিক হয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিকে জোহন রক ফেলারের মেহনত, চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তা এবং ভাগ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে অন্য কিছুই বের হবে। এই উন্নতির মধ্যে প্রতারণা, বাটপারি, বেঈমানি, ঘুষ, অবৈধ কমিশন, হুকুমতে ইহুদীদের প্রভাব এবং সবচেয়ে বেশি ইহুদী মৌলিক চক্রান্তের বড় দখল রয়েছে। কারণ, এ কাজে সে নিজেই সবচেয়ে বড়। এর মধ্যে কিছু অনিয়ম এবং অবৈধ কমিশনের কথা সাধারণ মানুষের সামনেও প্রকাশ পায়। কিন্তু রক ফেলার দিন বদিন উন্নতিই করতে থাকে। জোহন রক ফেলার ভবিষ্যতে যেসব দাজ্জালি টার্গেট পূরণ করতে চেয়েছিলো, সেগুলোর জন্য সে চারটি সাহায্য সংস্থা (যা বস্তুত: ডাকাতি সংস্থা) প্রতিষ্ঠা করে। সেগুলোর মধ্যে 'রক ফেলার ফাউণ্ডেশন' এবং 'রক ফেলার ইনষ্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্স' প্রশিদ্ধ। রক ফেলার ফাউণ্ডেশন কেবল সেসব কাজের জন্য অর্থ যোগান দেয়, যেগুলো দাজ্জালি টার্গেটের সাথে সম্পৃক্ত। এমনি ভাবে রক ফেলার ইউনিভার্সিটিতে সেসব বিষয়ে গবেষণা করা হয়, যা ভবিষ্যতে দাজ্জালের কাজে আসবে। এমনি ভাবে সাহায্য সংস্থাগুলোর আড়ালে এই খান্দান গোটা পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করেছে। তাছাড়া নিজেদের অগণিত কালো অর্থ টেক্স থেকে আড়াল করে নেয়। তাদের অর্থের পরিমাণ, আপনি এ থেকেই করতে পারবেন যে, সমগ্র পৃথিবীর সোনা বর্তমানে আই.এম.এফ. এবং বিশ্ব ব্যাংকের আয়ত্বে। আর আগেই বলা হয়েছে এদুটোই তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তাই ১৯৮১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড র‍্যাগন এ কথা জানার চেষ্টা করে যে, আমেরিকার খাজানাতে কী পরিমাণ সোনা আছে? সে তা জেনে খুবই পেরেশান হয়ে

যায়। আপনারও অবাক হওয়া প্রয়োজন। আমেরিকার খাজানায় কোনো সোনাই ছিলো না। আমেরিকারই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যান্য দেশের কী অবস্থা তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। জোহন ডি রক ফেলার ২৩ মে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ফ্লোরিডাতে মৃত্যুর মুখে চলে যায়। জোহন ডি রক ফেলার জুনিয়র (১৮৭৪-১৯৬০) জোহন ডি রক ফিলারের ছেলে ছিলো। সে নিউ ইয়র্কে জাতি সংঘের জন্য জমি দিয়েছিলো। তার পাঁচ ছেলে ছিলো।

১. তৃতীয় জোহন ডি রক ফেলার। (১৯০৬-১৯৭৮)
২. নেলসন রক ফেলার। (১৯০৮-১৯৭৯)
৩. লার্নাস এইস রক ফেলার। (১৯১০)
৪. ভেন থ্রপ রক ফেলার। (১৯১২-১৯৭৩)
৫. ডেভিড রক ফেলার। (১৯১৫)

এই পাঁচ জনই পৃথক পৃথক শাখায় ইহুদীবাদের সেবা করেছে। তৃতীয় জোহন ডি রক ফেলার আর্টের ময়দান চালিয়েছে। এই আর্ট, মুসলিম সমাজে যে ধ্বংস ডেকে এনেছে, তার প্রভাব আপনি যিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখতে পারেন। কিভাবে মুসলিম সমাজ অমুসলিম রঙ্গে রঙ্গীন হচ্ছে। আর্টিশ জগতের খবর জানতে হলে ‘ন্যাশনাল কলেজ অফ আর্টিশ’ এর সাথে অথবা যেসব এন.জি.ও আর্ট নিয়ে কাজ করে, সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেখতে পারেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিরীহ এই ময়দান প্রকৃত পক্ষে যে কোনো সমাজকে পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য ইহুদী বিশেষজ্ঞরা বেছে নিয়েছে।

জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা নেলসন রক ফেলার

নেলসন রক ফেলার রাজনৈতিক ময়দান বেছে নিয়েছে। সে এই ময়দানে এমন সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছে যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যকার রাজনীতিকে ইহুদীদের বাদী বানিয়ে নিয়েছে। এই কাজটি সে ১৯২১ সালে C.F.R. প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করেছে। তাছাড়া জাতিসংঘ গঠনে তার মূল ভূমিকা ছিলো। জাতিসংঘ তার ঘরে বসেই তৈরি হয়। সে-

ই জাতিসংঘের অফিস তৈরির জন্য নিউ ইয়র্কে জায়গা দেয়। নেলসন রক ফেলার আমেরিকার হুকুমতের বিভিন্ন বিভাগে সেক্রেটারি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। যেখানে বসে হুকুমত নিয়ে সহজেই খেলা যায়, সে নিজের কাজের জন্য সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই বেছে নেয়। সে আর্টের পৃষ্টপোষকতা করেছে। গর্ভপাতের (Abortion) ধারণা বিস্তারে তার দেমাগের বড় ভূমিকা রয়েছে। ডাক্তার হেনরি কেসেঞ্জার যে মিটিংয়ে পৃথিবী কম আবাদ করার টার্গেট নির্দারণ করেছে, নেলসন সেসব মিটিংয়ের মধ্যমণি ছিলো। ১৯৬৬ সালে রিপাবলিকান পার্টির টিকেটে সে নিউ ইয়র্কের গভর্নর হয়। ১৯৭৪ সালে তাকে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৯ সালে নিউ ইয়র্কে তার মৃত্যু হয়।

লার্নাস রক ফেলার

লার্নাস রক ফেলার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে জন্ম গ্রহণ করে। সে প্রাকৃতিক মাধ্যম এবং মেডিকেল রিসার্সকে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। সে সেসব নতুন বাণিজ্যের ময়দানে পুজিওয়ালাদেরকে অবসরে দিয়েছে, যেগুলোর ভিত্তি নতুন টেকনোলজির উপর ছিলো। সে 'জাযিরায়ে সেন্ট জোহন' এর জন্য আমেরিকার হুকুমতকে পাঁচ হাজার একর জমি দিয়েছে। আমরা যখন ন্যাশনাল পার্ক, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, আর্ট এন্ড কার্লচার সেন্টার, এধরনের নাম শুনি, তখন অধিকাংশই তার নাম শুনে অবাক হই। অধিকাংশ মানুষই এসব ব্যাপারে কোনো আগ্রহ রাখে না। ফ্রী মেশন এবং অন্যান্য ইহুদীবাদী সংগঠন এসব জায়গা থেকেই দাজ্জালী হুকুমতের মাটিতে বাস্তবতার রং ছড়িয়ে রেখেছে। এই জায়গাগুলোই সেই পরমাণু চুল্লি, যেখানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এটম বোম তৈরি হয় এবং পুরো পৃথিবীর দেমাগ ও দেহে দাজ্জালের কর্মীরা রাজত্ব চালায়। যেমন মিউজিয়ামের কথা চিন্তা করুন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে কোথাও ফেরাউনী কার্লচার পবিত্র মস্তিস্কগুলোতে বসিয়ে দিচ্ছে, কোথাও আবার

উপজাতি এবং আদিবাসীদের জাহেলি সংস্কৃতি দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

ভেন গ্রুপ রক ফেলার

সে ১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত আর্কেনাস এর গভর্ণর ছিলো। কিন্তু কিছু মস্তিস্কপ্রসূত অভ্যাসের কারণে অথবা পরবর্তীতে কেউ এ কথা বলবে যে, গোপন মিশনে বাধাঁ সৃষ্টি করে, এজন্য সে এই খান্দানকে একদমই পছন্দ করতো না।

বড় যাদুকর এবং বড় ব্যবসায়ী ডেভিড রক ফেলার

রাজকীয় সম্রাট ডেভিড রক ফেলার আমেরিকার বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহ আদায় করে নেয় এবং পর্দার অন্তরালে থেকে ইহুদীবাদের গোপন মিশন বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে। ১৯১৫ সালে নিউ ইয়র্কে সে জন্ম গ্রহণ করে। হারোর্ড এবং শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে লেখা পড়া করে। খুব দ্রুতই ডেভিড রক ফেলার বিশ্ব ব্যাংকার হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে চীজ ম্যানহটন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হয়। তাকে C.F.R. এর চেয়ারম্যান হিসেবেও নির্বাচন করা হয়। ডেভিড কোনো সরকারী দায়িত্ব পালন না করা সত্ত্বেও আমেরিকার পক্ষ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। সেগুলোর মধ্যে আমেরিকার পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য নতুন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে যেতো।

The Rockfeller Syndrome এর লেখক ফার্ডিনাণ্ড ল্যান্ডবার্গ লেখেন, 'ডেভিড যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রোগ্রাম নিয়ে যেতেন, তখন তার সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য কাজের তালিকা একটি বইয়ের আকার ধার করতো। সে যখন কোনো রাষ্ট্রে সফর করতো তখন সেই রাষ্ট্রের প্রধান তার সাথে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করতো, যেনো সে কোনো এক রাষ্ট্রের প্রধান। এমনি ভাবে তার সাক্ষাতের সিডিউল ঠিক করা হতো। ডেভিড রক ফেলার নিজের সফরে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতেন।'

লেখক তার পর লেখেন, ‘সে প্রত্যেক বছর তার ঘরে কয়েক দেশের অর্থমন্ত্রী, উচ্চ পদস্ত সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ. এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মেহমানদারী করতেন। .... সে তার নিউ ইয়র্কের বাড়িতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে আনন্দ ফুর্তী করতেন এবং অধিকাংশ সময় তারা সেখানে রাত্রি যাপনও করতেন।’

ফার্ডিনাণ্ড আরো লেখেন, ‘ডেভিড এমন এক অবস্থানে আছেন, যেখানে থেকে পৃথিবীর যে কোনো অংশের খবর এক মিনিটে নিতে পারেন।’

ডেভিড নিজেই বলেন, আমি মনে করি না আমার কাজের চেয়ে উপকারী কোনো কাজ হতে পারে। ব্যাংক সবার সাথেই লেনদেন করে থাকে। পৃথিবীর এমন কোনো শাখা নেই যা ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত নয়।’

ল্যাণ্ডবার্গ আরো লেখেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধের পিছনে শতকরা একশো ভাগ ডেভিড রক ফেলার এবং তার ভাইদের হাত ছিলো।’

ইরাক এবং আফগানিস্তানের উপর হামলা করতে ইহুদীদের এই খান্দানেরই হাত ছিলো। এই জি রক ফেলার চতুর্থ, যার আলোচনা সামনে আসছে। সে যেমনি ভাবে দক্ষিন পশ্চিম এশিয়ার উপর ইহুদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভিয়েতনামে যুদ্ধ করিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে ইজরাঈলের রাস্তার কাটা দূর করার জন্য এবং জাযিরাতুল আরবে ইহুদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইরাকে যুদ্ধ করিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ডেভিড রক ফেলার বানিয়েছিলো। ডেভিড নিজেই আর্কিটেক্ট। আর্কিক্টের জগতে সে এমন সব ডিজাইন পরিচিত করিয়েছে, যেগুলো ইহুদীদের পুরাতন সংস্কৃতিক নিদর্শন। ঘরের ভিতরে গালিচা, দেয়ালে ছয় এবং আট কোন বিশিষ্ট তারকা, সাপের মতো প্যাঁচানো সিড়ি, শয়তানের শিং এবং এমনি আরো বহু ডিজাইন এবং নিদর্শন, যেগুলো স্থাপনা শিল্পে ব্যবহার করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড অয়েল, চীজ ম্যানহটন ব্যাংক, ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক, ইউনাইটেড স্টেট টুরিস্ট কোম্পানী, Equitale Life and Mutual of New York. এর মতো নামিদামি প্রতিষ্ঠান তার হাতে। ডাক্তার হ্যানরি ক্যাসেঞ্জারের পিছনেও রক ফেলার্জ ছিলো।

ডেভিড রক ফেলারের ধর্মের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ফার্ডিনান্ড ল্যান্ডবার্গ লেখেন, সে খোদার এতো নিকটবর্তী; যেমন, পোপ অথবা গীর্জার আর্ক বিশপ।

ল্যান্ডবার্গের এই আলোচনাই ধর্মের সাথে এই খান্দানের সম্পর্ক আন্দাজ করতে যথেষ্ট। ইহুদীদের নিকট এই স্তরের ধার্মীক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে কাবালার জ্ঞানও রাখে। এই খান্দান সম্পর্কে এতো বিস্তারিত আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তাদের এই গোপন যাদুর ক্ষমতা। মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য এতে বড় শিক্ষা রয়েছে যে, আল্লাহর দুশমনরা কিভাবে দীনে হককে শেষ করার জন্য বংশ পরম্পরা প্রত্যেক ময়দানে মেহনত করছে। যেখানে আমাদের ব্যবসায়ীগণ শুধু এ জন্য মুজাহিদীনকে সহযোগীতা করে না যে, তাদের ব্যবসা ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। অথচ তাকদীরে যতটুকু লেখা হয়েছে, তা পৃথিবীর কোনো শক্তি কমাতে পারবে না।

ডেভিড রক ফেলার নিজের আত্ম জীবনীতে লেখেন, 'মানুষ দাবী করে আমরা আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর হাত রাখি। কিছু লোক এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আমরা গোপন কাবালার অংশ, যারা আমেরিকার স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করি। আমাকে এবং আমার খান্দানকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষাকারী মনে করে। তারা এটাও মনে করে যে, আমরা দুনিয়ার অন্যান্যদের সাথে মিলে এমন এক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামো দাঁড় করতে চাচ্ছি, যা বর্তমানের চেয়ে অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। যদি এতটুকুই দাবি হয়, তাহলে আমি অপরাধী এবং এর উপর আমি গর্ব করি।'

ডেভিড রক ফেলার জুনিয়র

১৯৪১ সালে জন্ম গ্রহণ করে। তার ব্যাপারে বলা হয়, সে তার পিতা ডেভিড রক ফেলার সিনিয়রের অবস্থানে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে। বর্তমান পৃথিবীতে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, সে সবগুলোর পিছনের হোতা। বিশ্ব ইহুদী নিরাপত্তা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইহুদীদের চাহিদা

অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যাবতীয় লেনদেনের ময়দানে পর্দার আড়ালে থেকে রাজনৈতিক টাই-কোটগুলোকে ব্যবহার করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে।

জি রক ফেলার ইরাক ও আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের খুনী

জি রক ফেলার ১৮জুন ১৯৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করে। সে জোহন ডি রক ফেলারের নাতি, তৃতীয় জোহন ডি রক ফেলারের ছেলে এবং ডেভিড রক ফেলারের ভাতিজা। ১৯৮৫ সাল থেকে আমেরিকার সিনেটের সদস্য। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গভর্ণর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। সে সিনেটের গোয়েন্দা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করে। ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়। ইরাকের উপর হামলা করার জন্য বুশ প্রশাসন এবং পেন্টাগনকে উদ্বুদ্ধকারি ব্যক্তি সে। সি. আই. এ. থেকে নিয়ে মিডিয়া পর্যন্ত নিজের খান্দানের হাত থাকার সুবাধে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে রায় নিতে সহজেই ব্যাপক সমর্থন আদায় করে নেয়। ২০০২ সালে সে পূর্ব মধ্যপ্রাচ্য সফর করে। এই সফরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে ইরাকে হামলার ব্যাপারে নিজস্ব রায়ের উপর আলোচনা পর্যালোচনা করে। সেই বছরই সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (Weopons of Mass Destruction) বিরুদ্ধে তার সন্দেহ প্রকাশ করে। আমেরিকার সিনেটকে খেতাব করে সে বলে, ইরাকের ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের আশঙ্কা খুবই নিকেটে এসে গেছে। আমরা তার অপেক্ষা করতে পারবো না। সে এক টিভি সাক্ষাতকারে বলে, 'আমি ২০০২ সালের জানুয়ারীতে সউদী আরব, জর্ডান এবং সিরিয়া সফর করেছি। আমি সেসব দেশের প্রেসিডেন্টদের বলেছি আমার ব্যক্তিগত রায় হলো প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে হামলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছেন। আর এই সিদ্ধান্ত ৯/১১ এর পর আকস্মিকই করা হয়ে গেছে।'

গুয়ান্তানামু বে, বাগরাম এবং আবু গরীব কারাগারে অমানবিক শাস্তি

গুয়ান্তানামু বে, বাগরাম এবং আবু গরীব কারাগারে বন্দী মুজাহিদীন এবং সাধারণ মুসলমানদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে, তা জি রক ফেলারের হুকুমে হয়েছে। আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনিও এতে জড়িত। কিন্তু সি.আই.এ. নির্যাতনের নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে কেবল দুজনকে চিহ্নিত করে। যাদের মধ্যে একজন জি রক ফেলারও ছিলো। নির্যাতনের দৃশ্যের ভিডিও সি.আই.এ. বানিয়ে ছিলো। সেগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এর জন্য যখন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, তখন জি রক ফেলার তা এ কথা বলে বাতিল করে দেয় যে, এটি গোয়েন্দা কমিটির কাজ।

সুসজ্জিত লোকের আড়ালে কালো সাপ

ঈসায়ী বিংশ শতাব্দিতে পৃথিবী যেসব অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হয়েছে, তা রক ফেলার এবং অন্যান্য ইহুদী খান্দানের পরিকল্পিত মিশন ছিলো। যাতে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রকে নিজেদের সামনে অক্ষম করে ইহুদী বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ করানোর ইস্যু তৈরি করতে তাদেরকে বাধ্য করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ এটাই ছিলো যে, খেলাফতে উসমানিয়াকে ভেঙ্গে একক 'বিশ্ব ইহুদী হুকুমত' প্রতিষ্ঠা করে দাজ্জালের বিশ্ব হুকুমতের জন্য একটা মডেল দাঁড় করানো। এই খান্দানের ব্যাপারে অধ্যয়ন করে আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, পৃথিবীর এমন কোন বিভাগ আছে যাতে এই খান্দানের হাত নেই? নিঃসন্দেহে অনেক বিভাগ আছে যেগুলোতে তারা সরাসরি অংশিদার নয়, কিন্তু সম্ভবত সেগুলো তাদের আয়ত্বের বাহিরেও নয়। কেননা অন্যান্য বিভাগ, যেগুলো অন্য খান্দানের হাতে সেসব খান্দানে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়েছে। যেমন জে.পি. মর্গান, রুথ শিল্ড ইত্যাদি। পৃথিবীতে যতগুলো অপকর্ম আছে অথবা প্রত্যেক ওই কাজ যাতে বনী আদমের অপমান হয় এমন কাজের আবিস্কারক এই পরিবার। কিন্তু শিক্ষিত

সমাজকে ধোকা দেয়ার জন্য সেসব নিকৃষ্ট কাজের উপর সুসজ্জিত লেবেল লাগিয়েছে। কোথাও মেডিকেল রিসার্চের নামে কোথাও সাইন্স ও টেকনোলজির নামে। কখনো বিল্ড লাইফ এবং লাইভ স্টক নামে আবার কখনো মানবতার নামে চলমান এনজিওর লেবেলে। পৃথিবীর সকল লাশ ঘর থেকে বাচ্চা এবং নারীদের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তাদের গোপন পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। যেখানে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালানো হয়। আর এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের বংশ শেষ হয়ে যায়, তাহলে যাতে ইহুদী জিনের মাধ্যমে নতুন করে ইহুদী বংশ তৈরি করতে পারে। এই কাজ অধিকাংশ কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো করে থাকে। যাদেরকে এই খান্দান বিভিন্ন নামে বাৎসরিক কোটি কোটি ডলার সহযোগীতা করে। বিভিন্ন জীবানু অস্ত্র আবিস্কার করে বিপদগ্রস্ত এলাকায় তা পরীক্ষা করে। তাদেরই তত্বাবধানে উলঙ্গপনাকে শিল্পের মান দেয়া হয়েছে। তাদের গোপন পরীক্ষাগারগুলোতে জীবানু অস্ত্র বানানো হয়েছে। আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশগুলোতে সেসব জীবানু ছড়িয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে সেসব জীবানু ধ্বংস করার জন্য নিজেদেরই ঔষধ কোম্পানীগুলোতে সেগুলোর ঔষধ তৈরি করে রাখা হয়। অপর দিকে ডাক্তারদের মাধ্যমে তাদের কোম্পানীর ঔষধ লিখিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়া কয়েকটি বিপদজনক রোগের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, এই রোগ কুদরতি নয় বরং এগুলোর জীবানু কোনো ল্যবরেটরীতে তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এইডসের ভাইরাস উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার ভিতরে এফ.বি.আই. এবং সি.আই.এ. আমেরিকার বাচ্চাদেরকে ফুসলিয়ে শয়তানের পুজারীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। যাদেরকে তাদের ধর্মীয় উপাসনায় শয়তানকে খুশী করতে জবাই করা হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রন অথবা অন-ইহুদীদের নির্বংশীকরণ

দাজ্জালের আগমনের পূর্ব মূহুর্তে রক ফেলার্জ খান্দানের টার্গেট হলো, পৃথিবীতে বিদ্যমান অন-ইহুদী জাতিগুলোর আবাদী কম থেকে কম করে

দেয়া। যাতে ভবিষ্যতে কোনো জনসংখ্যা আধিক্যের মুখোমুখি না হয়। এ জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে মানবতাকে হত্যার যে পশুত্ব চলমান রয়েছে, তার আসল রুপ যদি সাধারণ মানুষজনকে দেখানো হয়, তাহলে ইহুদী এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন কর্মীদেরকে চৌরাস্তায় ঝুলাবে। কিন্তু দাজ্জালী মিডিয়ার কৃতিত্ব যে, তারা শুধু সেসব বিষয়গুলোই প্রকাশ করে, যাতে দাজ্জালী শক্তিগুলো খুশী হয় এবং পরবর্তীতে তাদের স্বার্থের উপর কোনো কথা না উঠে। সুতরাং সত্যবাদীর দাবীদার তারকা এবং টিভিতে আগত বুদ্ধিজীবিরা সবকিছু জানা সত্ত্বেও কওমের বংশ নিয়ন্ত্রণ নিজ চোখে দেখেও চুপ থাকতে বাধ্য। কেননা যবান খুললে তাদের প্রভুরা তাদের উপর নারাজ হয়ে যাবে। ইউরোপ আমেরিকার দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বরং তাদের নিজেদের দেশের যমীনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। মানব বংশকে ধ্বংস করতে পৃথিবীতে যতগুলো প্রোগ্রাম চলছে, সবগুলো মিশনের পিছনে রক ফেলার্জ। এই খান্দান দ্রুততার ভিত্তিতে পৃথিবীর শাষকদের বাধ্য করছে, তারা যেনো নিজেদের দেশে এই পলিসিকে শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করে। মোটকথা হলো, তারা সেই লোক যারা পৃথিবী থেকে কল্যাণকে বিদায় করে পূর্ণ শয়তানী রাজত্ব কায়েম করতে চায়। তা এমন এক দুনিয়া, যেখানে মানুষ শয়তানের পুজা করবে। এমন সব কাজই করবে, যাতে মানবতার অপমান হবে। আল্লাহ তা'আলার গযব নাযিল হবে। ইবলিশ খুশী হবে।

গ্যারী এলেন রক ফেলার্জের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, রক ফেলার্জের মিশন হলো, আবাদী, শক্তি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। যা ধারাবাহিক এবং পরিকল্পিত মিশনের সাথে এক বড় সংযোজন। অর্থাৎ যা একক বিশ্ব হুকুমতের দিকে যাবে।

এই খান্দান খেলাফতে উসমানিয়া ভাঙ্গা থেকে নিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মূল নেতৃত্ব দেয়। আরবের শাসকগোষ্ঠীকে নিজেদের যাদুর জালে আবদ্ধ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারাই বসনিয়ার মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে। ইরাকে পশুত্বের নতুন ইতিহাস রচনা করে। আবু গরীব কারাগারে মানবতাকে

অপমান করে ইবলিশকে তারাই খুশী করে। আফগানিস্তানে পৃথিবীর সকল অস্ত্র তালেবানের উপর প্রয়োগ করে। নিস্পাপ বাচ্চা, নারী এবং বৃদ্ধদের উপর নতুন নতুন বোমের পরীক্ষা চালায়। আল্লাহর ওলীদেরকে গুয়ান্তানামু বে কারাগারে তাদেরই হুকুমে অপদস্ত করা হচ্ছে। কুরআনের অবমাননা এসব খবীশ, ইতর এবং শয়তানের পুজারীদের হুকুমেই করা হয়েছে। আমার প্রিয় নবীজির বিরুদ্ধে কাআব বিন আশরাফের এই সন্তানেরাই পত্রিকাতে অপমানজনক সংবাদ ছাঁপিয়েছে।

একটি প্রশ্ন

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই লোকগুলো যদি এতই ক্ষমতাধর হয়, তাহলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনো হয় না? এর প্রকৃত জবাব তো কুরআনে কারীমেই রয়েছে।

‘তাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। হ্যাঁ তবে আল্লাহর নিয়ম অথবা মানুষের হাত ধরে।’

দ্বিতীয় জবাব, ইহুদীদের নির্বংশ হয়ে যাওয়ার ভয় তাদের জাতের সাথে মিশে আছে। যা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বুঝে আসবে। কিন্তু এখানে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে সবচেয়ে সহজ উত্তর হলো, যে বাদশাহীর স্বাদ জানে সে বাদশাহ হওয়া পছন্দ করে না। এছাড়াও যেহেতু তাদের আসল কাজ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের নাপাক মিশন বাস্তবায়ন করা, তাই বাস্তবতা এটাই দাবি করে যে, সামনে না এসে কাউকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজের কাজ আদায় করা। তাদের কেউ যদি সামনে আসতে চায়, তাহলে তাদেরই লোক তাকে সবক শিখিয়ে দেয়। এমনকি নিজের সন্তানকে হত্যা করতেও তাদের অন্তর কাঁপে না। তবে ১৯৯২ সাল থেকে ইহুদীরা সামনে আসতে শুরু করেছে। আর এটাই তাদের ধ্বংস এবং নির্বংশ হওয়ার পূর্বাভাস।

রুথশিল্ড খান্দান (Ruthschild)

এই রুথশিল্ড শব্দটি জার্মানী। যার অর্থ লাল ঢাল। জার্মানী ভাষায় লালকে রুথ এবং ঢালকে শিল্ড বলে। শিল্ড শব্দের অর্থ নিদর্শনও ব্যবহার হয়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ঢাল। কেননা ইহুদীরা সুলাইমান আ. এর ঢালকে শক্তির নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করে। ইহুদীদের এই খান্দানও কাবালাহ গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখে। তারাই ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। তাদের সবচেয়ে বড় দাদা হলো মেয়ার এমশ্যাল বাউর। সে ১৭৪৩ সালে জার্মানীর ফ্রেঙ্কফোর্টে জন্ম গ্রহণ করে। তার পিতা মানুষকে সুদের উপর ঋণ দিতো। তার ঘরের দরজায় লাল রঙ্গের ছয় কোন বিশিষ্ট দাউদী তারা ঝুলানো ছিলো। তার পাঁচ ছেলে। যারা পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাংকিং জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

১. এমশ্যাল মেয়ার রুথশিল্ড।

২. স্যালোমন মেয়ার রুথশিল্ড।

৩. নাথান মেয়ার রুথশিল্ড।

৪. কালমান চার্ল মেয়ার রুথশিল্ড।

৫. জেকব জেমস মেয়ার রুথশিল্ড।

তারাই সে লোক যারা ১৭৭০ সালে ইহুদী গোপন সংগঠন ইলুমিনাতি প্রতিষ্ঠার মিশন হাতে নেয় এবং সেজন্য এ্যাডম ও ভাইজাতকে ব্যবহার করে। রক ফেলার এবং রুথশিল্ড খান্দানের সামনে বড় বড় হুকুমতের কী অবস্থান তা সেই কথাবার্তা থেকেই অনুমান করতে পারবেন, যা ১৮১১ সালে নাথান মেয়ার রুথশিল্ড এবং আমেরিকার ভাবি প্রেসিডেন্ট এন্ডর ভিউ জেকশনের মধ্যে হয়েছিলো। আমেরিকাতে রুথশিল্ডের ইউনাইটেড স্ট্যাট ব্যাংকের নবায়নের বিল আমেরিকান কংগ্রেস ফিরিয়ে দিয়েছিলো। তখন সে বলেছিলো, হয়তো চার্টারের নবায়নের দরখাস্ত মঞ্জুর করবে নতুবা আমেরিকা নিজেকে খুবই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িত পাবে।

এই কথার জবাবে এন্ডর ভিউ জেকসন বলেছিলো, তুমি সাপ এবং ডাকাতদের টার্গেটে পরিণত হবে। আমার ইচ্ছা তোমাকে বাহিরে নিক্ষেপ করবো। কসম চিরস্থায়ী খোদার! আমি তোমাকে বহিস্কার করবো।

রুথশিল্ড জবাবে বলে, সেসব নির্লজ্জ আমেরিকানদের সবক দিয়ে দাও, তাদেরকে আদিযুগে ফিরিয়ে দিবো।

নাথান রুথশিল্ড যা বলেছে তা বাস্তবায়নও করেছে। ১৮১২ সালে ব্রিটেনের মাধ্যমে আমেরিকার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, আমেরিকার আগে ব্রিটেনে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিলো। ফ্রান্স বিপ্লব নিরেট ইহুদী বিপ্লব ছিলো। যার প্রাণ সঞ্চালক ইলুমিনাতির এডম ভাইজাত ছিলো। আর সকল খরচ বহন করে রুথশিল্ড। স্যার ওয়াল্টার স্কট তার ‘দি লাইফ অফ নেপোলিয়ন’ গ্রন্থে এ কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন।

অন-ইহুদী জাতির নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে ইবলিশি কার্লচারের জালে ফাঁসানেওয়ালা ইহুদীরা নিজেদের নারীদেরকে কেনো ঘরে বন্দী করে রাখে? নারী স্বাধীনতার আন্দোলনে কোটি টাকা বাজেট প্রদানকারীরা নিজের ঘরের নারীদেরকে কেনো পুরুষের সমান অধিকার দেয় না? মুসলিম দেশগুলোতে সাপ বিচ্ছুর মতো মেরুদণ্ডহীন এন.জি.ও‘রা তাদের প্রভুদের কাছে এই দাবী কেনো পেশ করে না যে, আপনাদের বোন বধুকেও তেমনি ভাবে রাস্তায় ফুটপাতে ছেড়ে দিন, যেমনটি আপনারা আমাদের কাছে চাচ্ছেন। রুথশিল্ড নিজের মেয়েদের জন্য যে জীবনবিধান নির্ধারিত করেছে, তার একটি নীতি ছিলো, পরিবারের কেবল পুরুষ সদস্যদেরকে খান্দানী ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মেয়ার এ্যমসল রুথশিল্ডের পাঁচজন মেয়েও ছিলো। ১৯৮০ সাল থেকে তারা পৃথিবীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে Privatization ব্যক্তিকেন্দ্রীক করার প্রতি চাপ দিতে থাকে। তারপর দেখতে দেখতে ব্রিটেনের মতো রাষ্ট্রের বড় বড় কোম্পানীগুলো তারা কিনে নেয়। ১৯৯৫ সালে সাবেক পারমাণবিক বিজ্ঞানী ড. কিটি লিটল দাবি করেন, রুথশিল্ড পৃথিবীর ৮০ পার্সেন্ট ইউরেনিয়াম সাপ্লায় নিয়ন্ত্রণ করে। যারফলে নিউক্লিয়ার শক্তির উপর তাদের একক ঠিকাদারী বিদ্যমান।

ইহুদী ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে একটি আলোচনা

আপনি যতগুলো ইহুদী ব্যক্তিত্বের জীবনী অধ্যয়ন করবেন, প্রত্যেকটি পড়ার পর আপনার মনে হবে ইহুদীবাদের সবচেয়ে বড় খেদমত সে-ই করেছে। এর কারণ কী? এর একটি কারণ হলো, ইহুদীরা নিজেদের জীবনের একটি উদ্দেশ্য ঠিক করে নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বংশ পরম্পরায় কুরবানিও করে আসছে। এই কাজ গোটা পৃথিবীতে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুরো পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সবকিছু একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। সেগুলোর কেউ কেউ এমন আছে যারা মিশন ঠিক করে। আবার কেউ সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতি ঠিক করে। আবার কেউ সবার সামনে এসে সেসব মিশনকে বাস্তবতার জামা পরিধান করায়। সুতরাং আমরা জানি, ইহুদীদের জন্য সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে ইলুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা এডম ভাইজাত। রক ফেলারের ব্যাপারে পড়লে এমন মনে হয় যে, সকল কাজ এই খান্দানই করেছে। একই ব্যাপার রুথশিল্ড এবং অন্যান্য ইহুদী খান্দানের ক্ষেত্রেও। এর কারণ এটাই যে, মিশনের ক্ষেত্রে বহু বড় বড় ইহুদী ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথক কাজ করে থাকে।

ইসমাঈলী ফেরকা এবং আগাখান পরিবার

ইসমাঈলী ফেরকা গোপন ফেরকাগুলোর একটি। যারা বাহ্যিক ভাবে ইসলামের নাম নিয়েছে এবং মূলত কাফের। যেমন নুসাইরী, ইসমাঈলী, কারামেথাহ, কাদিয়ানী, বাহায়ী ইত্যাদি। ইমাম গাযালী রহ. গোপন ফেরকা প্রতিরোধে 'ফাযায়েহুল বাতেনিয়াহ' নামে পৃথক গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে তাদের ধর্মের ব্যাপারে লেখেন, তারা ধর্মের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে রাফেজী এবং ভিতরগত কেবলই কাফের।

ইসমাঈলীদের বিশ্বাস

ইমাম গাযালী রহ. তাদের ব্যাপারে লেখেন, তারা ইহুদীদের সাথে ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সাথে খ্রিস্টান হয়ে যায়। এখনো আগাখানীদের এই অবস্থা। হাসান বিন সাব্বাহার পর ৫৫৯ হিজরীতে তার এক খলিফা; হাসান বিন মুহাম্মাদ ছানি পিছনের সকল শরীয়তকে রহিত করার ঘোষণা করে। কিয়ামত এবং দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার ঘোষণা করে। সে বলে, যে তার ডাকে সাড়া দিবে তাকে জীবিত উঠানো হবে। আর যে তার ডাকে সাড়া দিবে না সে চির দিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দিবসকে সে 'ঈদে কিয়াম' নাম দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত ইসমাঈলীরা নিজেদেরকে সকল ধর্মীয় বিধি বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছে। নামায, রোযা, হজ্ব সবকিছু মাফ। শুধু নিজের উপার্জনের একদশমাংশ তাদের প্রভু আগাখানকে দিলেই তা সারা জীবনের আমল এবং গুনাহের কাফফারা হবে। আর তাদের মাবুদের এই মহব্বত এবং পরিচয়ই নাজাতের মাধ্যম। তারা আলী রা.কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম মনে করে। তাদের ধারণা অনুযায়ী আলী রা. এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নূর প্রবেশ করেছে তাই তিনিও আল্লাহ। ইসমাঈলীদের নিকট তাদের সকল ইমাম আলী রা. এর অবতার। তাই আলী রা. এর অবস্থান যেমন তাদের অন্যান্য ইমামদের অবস্থানও তেমন। এমনি ভাবে তারা আগাখানকেও খোদার মর্যাদা দেয়। আগাখানও এ বিষয়ে সন্তুষ্ট।

ড. মুহাম্মাদ কালেম হুসাইন তৃতীয় আগাখানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখেন, আমি অধিকাংশ সময় তার সাথে দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা করতাম। বিশেষত ইসমাঈলী আকীদার উন্নতি সম্পর্কে। আমি এ কথা জেনে খুব পেরেশান হলাম যে, সে এ সকল বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখে। একদিন আমি তার নিকট একটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলাম, যেটি শুনলে সে রাগান্বিত হওয়ার কথা। আমি তার থেকে রাগান্বিত না হওয়ার ওয়াদা নিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জ্ঞান গরীমা আমাকে পেরেশানীতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি তাদেরকে এই অনুমতি কিভাবে দেন যে, তারা আপনাকে মাবুদ বলে ডাকে? আগাখান

এই কথা শুনে অট্টহাসি দেয়। সে এই পরিমাণ হাসে যে, তার চোখে পানি এসে যায়। সে আমাকে বলল, আপনি এই প্রশ্নের জবাব চান! হিন্দুস্তানে এমন লোকও আছে যারা গাভীর পূঁজা করে। আমি কি গাভী থেকে উত্তম নই?

আগাখানের নতুন কুরআন

তৃতীয় আগাখানের নাম স্যার সুলতান মুহাম্মাদ শাহ। সে ১৮৯৯ সালের ৩০ জুলাই তানজানিয়ার এক শহর জানযিবারে এক ফরমান জারি করে। তাতে সে বলে, খলীফা উসমান রা. কুরআনের কিছু অংশ বাতিল করে দিয়েছিলো। আমি আসল কুরআন লিখতে শুরু করবো। এতে ছয় বছর সময় লাগবে। তারপর আমি তোমাদের নিকট তা পাঠাবো। তখন তোমরা দেখতে পারবে উসমান কুরআন থেকে কী বাদ দিয়েছিলো।

-মাজাল্লাতুর রাছিদ, নবম সংখ্যা।

ইসমাঈলীদের মধ্যে বিভাজন; বুহারী ও নাযারী

মিসরে 'ফাতেমী শিয়া' হুকুমতের হাকিম মুসতানছার বিল্লাহ ফাতেমী (৪২৭-৪৮৭ হিজরী/১০৩৫-১০৯৫ সাল পর্যন্ত) তার বড় সন্তান নাযারকে খলিফা নিযুক্ত করে। কিন্তু মুসতানছার মারা যাওয়ার পর তার ওযীর আফযাল বিন বদর জামালী মুসতানছারের ছোট ছেলে এবং তার নিজের ভাগ্নি মুসতা'লাকে ইমাম বানিয়ে দেয়। এ কথাও প্রশিদ্ধ যে, জামালী নাযার এবং তার ছেলেকে হত্যা করায়। ইসমাঈলী ফেরকার অনেক মুবাল্লিগ এবং অনুসারী মুসতা'লাকে ইমাম হিসেবে মেনে নেয়নি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রশিদ্ধ নাম হলো হাসান বিন সাব্বাহ। সে নাযারী ছিলো। সে নিয়মিত নাযার এবং তার ছেলের ইমামতি দাবী করত। এভাবেই ইসমাঈলীদের মধ্যে দুই ফেরকা হয়ে যায়। এক. মুসতা'লা আর দ্বিতীয় ফেরকাকে নাযারী বলতে থাকে। বুহারীদের সম্পর্ক ইসমাঈলী মুসতা'লাদের সাথে। আর আগাখানীদের সম্পর্ক ইসমাঈলী নাযারীদের সাথে।

টার্গেটিংয়ে দক্ষ হাসান বিন সাব্বাহ

হাসান বিন সাব্বাহ (৪৩০-৫১৮ হিজরী/১০৩৮-১১২৪ সাল পর্যন্ত) ইরানী ইসমাঈলী শিয়া ছিলো। সে ইরানের উত্তর পশ্চিম এলাকায় এসে বিভিন্ন কেল্লা দখল করে নেয়। নিজের যাদুর মাধ্যমে বোকা লোকদেরকে নিজের মুরীদ বানাতে শুরু করে। সে ইরানের কযভীন শহরের নিকটবর্তী 'কেল্লাতুল মাউত' এর মধ্যে তার কেন্দ্র স্থাপন করে। সেখানকার হাশাশিয়্যিনরা মুসলমানদেরকে কতল করার ব্যাপারে প্রশিদ্ধি লাভ করে। তাদের কাজ ছিলো মুসলমানদের রাজনৈতিক ও দীনি নেতৃত্বকে হত্যা করা। তারা বহু আলেম এবং মুজাহিদ নেতৃত্বকে হত্যা করে। কয়েকবার সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীকেও হত্যা করতে চেষ্টা করে। সলীবি যুদ্ধে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সলীবিদেরকে (খ্রিস্টানদেরকে) সাহায্য করে। তারা হাজিদের লুট করে হত্যা করতো। কিন্তু শ্লোগান এটাই দিতো যে 'আমরা সত্যিকারের পাক্কা মুসলমান।' হাসান বিন সাব্বাহ 'কেল্লাতুল মউত' এর মধ্যে নিজের জন্য জান্নাত বানিয়ে রেখেছিলো। সেখানে সুন্দরী দুই নতর্কী ছিলো। তাদেরকে সে হুর বলতো। নিজের শিষ্যদের খেদমতের বিনিময়ে এদেরকে পেশ করতো। শিষ্যদেরকে সবসময় নিজের যাদু এবং হাশীশের নেশায় ডুবিয়ে রাখতো।

আল্লামা আবুল ফরয বিন জাওযী রহ. লেখেন, যখন হাসান বিন সাব্বাহার নিকট আমীরের দূত পৌছলো এবং তাকে সালাম করার পয়গাম দিলো, তখন হাসান বিন সাব্বাহ নিজের এক শিষ্যকে ডাকলো। তাকে হুকুম করলো নিজেকে হত্যা করতে। সে তখনই খঞ্জর নিয়ে শাহরগ কেটে ফেলল এবং ছটফট করতে করতে প্রাণ দিলো। তারপর অন্য এক শিষ্যকে হুকুম করলো কেল্লার প্রাচীরের উপর থেকে লাফ দিতে। সাথে সাথে সে নিচে লাফিয়ে পড়লো। তারপর দূতের দিকে ফিরে বলল, তোমার আমীরের কাছে গিয়ে বলো, আমার নিকট এমন বিশ হাজার জানবাজ আছে। এটাই আমার জবাব।

-আল মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ৭/৬৪।

এখানে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে গোটা পৃথিবীতে ফেদায়ী হামলা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে এই

প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যে, তারা ফেদায়ী (আত্মঘাতি) হামলাকারীকে কৃত্রিম জান্নাতে রাখে এবং জান্নাতের টিকেট দিয়ে তাকে ফেদায়ী হামলা করতে পাঠায়। এই প্রোপাগান্ডা মিডিয়াতে অবস্থানরত কিছু গোপন ফেতনাবাজদের কাজ। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের জন্য জান কুরবানকারীকে সেসব বদ বখতদের সাথে তুলনা করছে, যারা হাসান বিন সাব্বাহার হাশিশের নেশায় বুঁদ হয়ে নিজেদের জান নষ্ট করতো। হাসান বিন সাব্বাহ নিজেকে পাক্কা এবং সাচ্চা মুসলমান দাবি করতো। সে বলতো, আমি মুসলমান। আর আমি যেই দীনের উপর আছি সেটাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (মুনাফিকদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।)

মুহাম্মাদ হামিদ আন নাসেরী 'আল জিহাদ ওয়াত তাজদীদ' গ্রন্থে লেখেন, তাদের কাজ ছিলো ক্রুসেডারদের সহযোগীতা করা। তারা সেসব লোকদেরকেই কতল করতো যারা ক্রুসেডারদের জন্য বিপদজনক ছিলো।

৫৫২ হিজরীতে তারা ইরানের নিসাপুর এলাকায় হাজীদের কাফেলার উপর হামলা করে এবং সকল হাজিকে কতল করে তাদের মাল ও আসবাব-পত্র লুটে নেয়। সেই কাফেলাতে উলামায়ে কেরাম, সালেহীন এবং ওলীগণ শরীক ছিলেন। ইসলামের দুশমনরা কাউকেই ছাড় দেয়নি। যখন সকাল হলো তখন এক শিয়া এসে নিহতদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিতে লাগলো, হে মুসলমানগণ! নাস্তিকরা চলে গেছে। যদি কারো পিপাসা লেগে থাকে আমি তাকে পানি পান করাবো। ঘোষণা শুনে কোনো যখমী মাথা উঠালে, এই অভিশপ্ত সেখানে গিয়ে তাকে কতল করে দেয়। এভাবে যে ক'জন বেঁচে ছিলো সবাইকে সে শহীদ করে দেয়।

-আল কামেল ফিত তারীখ ইবনে আছীর।

হাসান বিন সাব্বাহার অনুসারিরা ইস্পাহান এবং কযভীন অঞ্চলের আশেপাশেই ছিলো।

হিন্দুস্থানে ইসমাঈলীদের আগমন

ইসমাঈলী ফেরকার প্রথম মুবাল্লিগ এই উপমহাদেশে হিজরী চতুর্থ শতাব্দির শুরুর দিকে আসে এবং পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সর্বপ্রথম

ইসমাঈলী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার নাম ছিলো জালম বিন শায়বান। জালমের পর ইসমাঈলী হুকুমতের প্রধান হয় হুমাইদ নামক এক ইসমাঈলী। সুলতান সবকতগীন (মাহমুদ গজনভী রহ. এর পিতা) মুলতানের যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। তারপর তার নাতি আবুল ফাতাহ দাউদ করামত্বী তাদের হাকিম নিযুক্ত হয়। যখন সুলতান মাহমুদ গজনভী রহ. (৯৯৮-১০৩১হিজরী) ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন, তখন দাউদ করামত্বী মাহমুদ গজনভী রহ. এর সাথে চুক্তি করে। কিন্তু সে পর্দার আড়ালে তার বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজাদের সাথে চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে মাহমুদ গজনভী রহ. ৪০১ হিজরীতে তার উপর আক্রমণ করেন এবং তাকে এক কেল্লায় বন্দী করেন। হিন্দুস্তান বিজয়ের পর তিনি সর্বপ্রথম ইসমাঈলী নেতৃত্ব সমূলে খতম করে দেন। তাদের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে দেন। তখন তারা পালিয়ে ভারতের গুজরাটে চলে যায়। সেখানে ইয়ামান, মিশর এবং বাহরাইন থেকে আগত ইসমাঈলীরা আগে থেকেই বসবাস করত। গুজরাটে গিয়ে তারা বুহেরা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় যুগ

তারপর তাদের হিন্দুস্তানে আগমন সবচেয়ে বড় আকারে ঈসায়ী তেরো শতাব্দির তখন শুরু হয়, যখন হালাকু খান ১২৫২ সালে হাসান বিন সাব্বাহার কেল্লাতুল মাউত এবং ইরানের অন্যান্য কেল্লাগুলো ধ্বংস করে দেয়। ইরান থেকে পালিয়ে তারা এই উপমহাদেশে এসে বসবাস শুরু করে। এই ধারাবাহিকতা ঈসায়ী ষোলো শতাব্দি পর্যন্ত চলতে থাকে। ইরান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম শাহ যখন ইসমাঈলীদের ইমাম নিযুক্ত হয়, তখন তারা তাদের ফেরকার জন্য এমন একটি ভূখন্ড তালাশ করছিলো, যেখানে অবস্থান করে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাদের দৃষ্টি পশ্চিম হিন্দুস্তানে (পাকিস্তানে) পড়লো। সুতরাং তারা পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্দ, কাশ্মির এবং করাচির উপকুলীয় এলাকাকে বেছে নেয়। সম্ভবত এর কারণ এটাই হয়ে থাকবে যে, এই এলাকাগুলো

মুসলিম হুকুমতের কেন্দ্র দিল্লি থেকে দূরে অবস্থিত ছিলো। যেখানে তাদের গোপনে কাজ করা সহজ ছিলো। সে তার প্রশিদ্ধ মুবাল্লিগদের হিন্দুস্তানে পাঠায়। যাদের মধ্যে পীর সদরুদ্দীন ও পীর শামসুদ্দীন তাবরিযী প্রথমে আসে। পীর সদরুদ্দীন চূড়ান্ত পর্যায়ের ধোকাবাজ ও মেধাবী লোক ছিলো। সে হিন্দি ভাষা শিখে নিজের নামও হিন্দুস্তানীদের মতো করে রাখে। সিন্দ প্রদেশের শহর কোটরীকে নিজের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। হিন্দি ভাষায় সে 'দশ অবতার' নামক কিতাব লেখে। এতে সে লেখে, আলী রা. আল্লাহর আকৃতি সমূহের একটি আকৃতি। হিন্দুরা তার প্রতি খুবই বিশ্বাসী হয়। ৮১৯ হিজরী মুতাবেক ১৪১৬ সালে সে পাঞ্জাবে মৃত্যুবরণ করে। ইসলাম শাহের পর তাদের ইমাম নির্বাচিত হয় গরীব মির্যা। ঈসায়ী ষোড়শ শতাব্দিতে তাদের কেন্দ্র ইরান থেকে হিন্দুস্তানে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু তারপর ইতিহাস নীরব। না তাদের কোনো মুবাল্লিগের কথা পাওয়া যায়, না কোনো ইমাম। মনে হচ্ছে তারা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে মুসলমানদের মধ্যে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘ সময় পর্দার আড়ালে অতিবাহিত করার পর ঈসায়ী উনবিংশ শতাব্দিতে আগা খান আওয়াল নামে তাদের অস্তিত্ব সামনে আসে।

ইসমাঈলীদের খোদা আগা খান

ইহুদী খান্দানের মধ্যে এই খান্দানও রুহানী, যাদু এবং কাবালা পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে। তারা ইস্পাহানী ইহুদী। যদিও তারা নিজেদের বংশধারা এটি বর্ণনা করে যে, আলী, হাসান, হুসাইন, সাজ্জাদ, বাকের, সাদেক, ইসমাঈল, মুহাম্মাদ আহমদ, তকী, যকী, মাহদী, কায়েম, মানসুর, মুঈয, আযীয, হাকেম, জাহের, মুসতানছার, নায্যার, মুসতা'লা, আমীর, কাসেম, আগা খান আওয়াল, আগা খান দুওম, আগা খান চুওম, আগা খান চাহারাম, হাসান আলী শাহ আগা খান আওয়াল (১৮০০-১৮৮১ সাল)

আগা খান আওয়ালের পিতার নাম ছিলো শাহ খলিলুল্লাহ আলী। তাকে ১৮১৭ সালে ইরানে হত্যা করা হয়। যার ফলে ইসমাঈলীরা গোটা

ইরান জুড়ে গন্ডগোল শুরু করে দেয়। আগা খান আওয়াল ইরানের কিরমান প্রদেশের গভর্নর ছিলো। ১৮৪০ সালে সে বিদ্রোহ করে এবং গোটা ইরান দখল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে ব্যর্থ হয়। হুকুমত তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে মুক্তি পায়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিজের মুরীদদের একত্রিত করে আফগানিস্তানের কান্দাহারে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তারপর সেখান থেকে করাচীতে আসে। এখানে করাচীর উপকূলীয় এলাকা দখল করার জন্যে ইংরেজরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করছিলো। সে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই খেদমতের বদলায় ইংরেজরা তাকে পূর্ণ আর্থিক সহযোগীতা করে এবং মুম্বাইয়ে তাকে কেন্দ্র নির্মাণ করে দেয়। মুম্বাইয়ে এসে খোদ ইসমাঈলী দাবীদাররাই আগা খানকে পেরেশানীতে ফেলে দেয়। তারা তাকে ইমাম মানতে অস্বীকার করলো। তারা বলল, সে আমাদের বংশ (আলী বিন তালেব রা. এর) থেকে নয়। (এখানে চিন্তার বিষয় ইসমাঈলী ফেরকার দাবীদাররা আগা খানকে আলুভী হওয়া অস্বীকার করলো) আর এই মুকাদ্দামা ইংরেজদের আদালতে গেলো। ইংরেজরা তাকে পূর্ণ রক্ষনাবেক্ষন করলো এবং আগা খানের বংশের উপর হক্কানিয়াতের সীল লাগিয়ে দিয়ে বলল, সে নায্যারী। তার বংশ পরম্পরা আলী বিন আবু তালেব রা. এর সাথেই মিলেছে। সুতরাং তাকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হলো।

-মাজাল্লাতুর রাসেদ, নবম সংখ্যা।

সে সারহাদ প্রদেশ এবং সেখানকার কবীলাগুলো দখল করতেও ইংরেজদেরকে সহযোগীতা করে। যেহেতু সে বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তাই সে আযাদীর আন্দোলনে মুসলমানদের কাতারে এসে দাঁড়ায় এবং খুব অল্প সময়ে মুসলমানদের সকল দিক জেনে নেয়।

আগা আলী শাহ আগা খান দুওম

আগা খান প্রথম এর পর তার ছেলে আগা আলী শাহ আগা খান দুওম (১৮৩১-১৮৮৫ সাল) পর্যন্ত ছিলো। সে পিতার মিশনকে সামনে

এগিয়ে নিয়ে যায় এবং মুসলিম সমাজকে অন্তসারশূন্য করার কাজ চালিয়ে যায়। তার কর্মপদ্ধতি ছিলো ইহুদীদের মতো। আর তা হলো হুকুমতের কর্মচারীগুলো খরীদ করে তাদের নিজের মিশনে ব্যবহার করা।

স্যার সুলতান মুহাম্মাদ শাহ আগা খান তৃতীয়

তারপর ইসমাঈলীদের ইমাম নির্বাচিত হয় তৃতীয় আগা খান সুলতান মুহাম্মাদ শাহ। তার বয়স তখন কেবল সাত বছর ছিলো। তার মা শামসুল মুলুক এর সম্পর্ক ছিলো কজর খান্দানের সাথে। আগা খান তৃতীয় ১৮৭৭ সালের ২ নভেম্বর করাচীতে জন্মগ্রহণ করে। ভারত উপমহাদেশে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এর চেয়েও বেশি তার গুরুত্ব বুঝা যায় এই কথা দিয়ে যে, সে ১৯৩৭ সালে লীগ অফ ন্যাশন এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। বৃটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে তাকে কয়েকটি খেতাব দেয়া হয়। যখন সে বৃটেন সফর করে, তখন তাকে এগারো তোপধ্বনীর মাধ্যমে সালাম জানানো হয়। ইসমাঈলিয়াতের প্রকৃত উন্নতি তার যুগেই হয়েছে। আযাদীর লড়াইয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব তার হাতে নিয়ে নেয়। ১৯৩০ সালে গোল টেবিল বৈঠকের জন্য হিন্দুস্তানের সর্বস্তরের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেয়া হয়। ফিলিস্তিনের আযাদী সম্পর্কীত গোল টেবিল বৈঠকে বৃটেনের হুকুমত যেসব শর্ত আরোপ করে সেগুলো আরবরা অস্বীকার করে। যারফলে ১৯৩৯ সালে বৃটেন হুকুমত আরবদের রাজি করাতে তৃতীয় আগা খানের খেদমত নেয়। সেই সাথে মুসলমানদের সরলতা দেখুন। সেই মূহুর্তে ফিলিস্তিনী মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো। মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছিলো। তখন হিন্দুস্তানের মুসলমানরা বৃটেন হুকুমতকে নিজেদের উৎকণ্ঠার ব্যাপারে অবগত করলো এবং তদন্ত কমিটি গঠন করে ফিলিস্তিন পাঠাতে আবেদন করলো। যারা সেখানকার মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে কারা ভুল করছে তা খতিয়ে দেখবে। যেই কমিটির সাথে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে তৃতীয় আগা খান।

নিজেদের সরলতাও দেখ
অন্যদের প্রতারণাও দেখ।

হিন্দুস্তান ভাগের পর এই খান্দান করাচী চলে আসে। ১১ জুলাই ১৯৫৭ সালে তৃতীয় আগা খান মারা যায়। তার অসীয়ত অনুযায়ী তাকে মিশরের পুরাতন শহর আসওয়ানে দাফন করা হয়। তার এই অসীয়তের কারণ সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি যে, ফেরাউনের যুগে এই শহরকে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। এখানে ফেরাউনদের যুগে বড় বড় মন্দির ছিলো। তৃতীয় আগা খান নিয়মের উল্টো নিজের ছেলের পরিবর্তে নিজের নাতীকে ইসমাঈলী ফেরকার ইমাম নিযুক্ত করে। এই নতুন ইমাম চতুর্থ আগা খান প্রিন্স করীম ছিলো।

চতুর্থ আগা খান করীম আল হুসাইনী

চতুর্থ আগা খান করীম আল হুসাইনী ১৯৩৬ সালে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করে। সে দুইটি বিবাহ করে। প্রথম বিবাহ, বৃটেনের সেলী ক্রোকার পোল নামক এক মডেলকে (টাকার বিনিময়ে দেহ প্রদর্শনী) করে। সে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কর্ণেলের মেয়ে। বিয়ের পর তার নাম রাখা হয় শাহজাদী সালিমা। ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় বিবাহ, জার্মানী শাহজাদী গব্রিল জুলিয়েঞ্জনকে করে। তার নাম রাখা হয় শাহজাদী ঈনারা। পরবর্তীতে সে আগা খানকে তালাক দেয়। নতুন শিক্ষার সাথে মিশ্রিত ইসমাঈলীদের নির্বুদ্ধিতা, সনাতন চিন্তা-চেতনা এবং গুমরাহীর ধারনা এ থেকেই পাওয়া যায় যে, তাদের বর্তমান ইমামের স্ত্রী হলো এক দেহ প্রদর্শনকারী নারী। তার ইমামতকে অতিরিক্ত খেতাব দিতে বৃটেনের রাণী ১৯৫৭ সালে তাকে হাইনেস Highness উপাধী প্রদান করে। প্রিন্স করীম আগা খানের ছেলে প্রিন্স হুসাইন আগা খানও ২০০৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার এক খ্রিস্টান নারী জি ওয়েটকে বিবাহ করে।

হাসান বিন সাব্বাহ এবং আগা খান

বর্তমানের ইসমাঈলীদের ঝান্ডা দেখুন। এটি সবুজ রঙ্গের। যাকে লাল রঙ্গের একটি রেখা এক কোন থেকে অপর কোন পর্যন্ত কাটছে। এর আগে ইসমাঈলীদের ঝান্ডা সবুজ রঙ্গের ছিলো। হাসান বিন সাব্বাহ যখন কেল্লাতুল মউত দখল করে, তখন তাতেও সবুজ রঙ্গের ঝান্ডা উড়িয়ে ছিলো। সে বলতো, লাল ঝান্ডা তখন উড়ানো হবে, যখন আমাদের গায়েব ইমাম প্রকাশ হবে। হাসান বিন সাব্বাহার জান্নাত 'কেল্লাতুল মউত' যখন হালাকু খান ১২৫৬ সালে ধ্বংস করে, তারপর ইসমাঈলীরা তাদের ইমামদের মাযারের উপর সবুজ এবং লাল দুই ধরনের ঝান্ডা উড়ায়। উনবিংশ শতাব্দিতে এসে এই দুইটি ঝান্ডাকে এক করে দেয়া হয়েছে। আর সেটাই ইসমাঈলীদের ঝান্ডার স্বীকৃতি পায়। যাকে তারা 'আমার ঝান্ডা' বলে।

এই খান্দানের কথা এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক দৃষ্টিতে পূর্ণ নিরাপদ লোক কিভাবে এই উপমহাদেশে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে, তা বুঝানো। বর্তমানেও নিরবতার সাথে পাকিস্তানের মুসলমানদের দীন ও ঈমান ছিনতায় করতে চাচ্ছে। তাছাড়াও যেহেতু আগা খান খান্দান আমাদের এই ভূমির সাথে সম্পৃক্ত, তাই প্রয়োজন হলো, আমরা অতীত ইতিহাসের আয়না সামনে রেখে নিজেদের অবস্থা দেখা এবং আমাদের কাতারে অনুপ্রবেশ করা বর্তমানের আগা খানকে তালাশ করা। হাসান বিন সাব্বাহার চিন্তা-চেতনা ছিলো, হত্যা করা। আর আগা খানীরা বাহ্যিক ভাবে পূর্ণ নিরাপদ হিসেবে প্রশিদ্ধ। অথচ তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ম-নীতি খুবই গোপন। হাসান বিন সাব্বাহার হাশীশিয়্যীনদের মতো তাদের মধ্যেও একটি গোপন গ্রুপ আছে। তারা ঠিক হাশীশিয়্যীনদের মতই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। তাছাড়াও যে কোনো খুনী চক্রকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করা এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে সামনে রাখা, তাদের জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার ময়দানে আগা খানের প্রবেশ যদিও পূর্ণ নিরাপত্তার সীমানায়, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতারণা, ধোকাবাজি

এবং লোভও রয়েছে। আগা খান ফাউণ্ডেশনের কাজ করার পদ্ধতি হুবহু রক ফেলার ফাউণ্ডেশনের মতই। সহযোগীতা, লোভ, মিডিয়া এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকে নিজেদের হাতে রাখা। তার সবচয়ে বড় প্রমাণ, পাকিস্তানের শিক্ষা নীতি আগা খান ফাউণ্ডেশনের অধীনে দেয়ার প্রচেষ্টা। কোন সে শক্তি, যারা প্রশাসনে বসে আগা খানের জন্য কাজ করছে? সাবেক স্পীকার জাতীয় এ্যসম্বলী মিয়া মুহাম্মদ সোমরু কিসের ভিত্তিতে কয়েক হাজার হেক্টর সরকারী সম্পত্তি আগা খান ফাউণ্ডেশনকে ফ্রী দিয়ে দেয়? এর বিনিময়ে সে কী পেয়েছে? প্রিন্স করীম আগা খান পাকিস্তানে এলে তার সাথে সাক্ষাতকারীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে নিয়ে সেনা বাহিনীর জেনারেলরাও থাকে। এই খান্দানের পূর্ণ গোপনীয়তা, গোপন মিশন এবং ইহুদীদের নিকট তাদের গুরুত্ব এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, বৃটেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন ফাইলগুলো প্রত্যেক পঞ্চাশ বছর পর সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম এশিয়ার গোপন ফাইল যেগুলো আগা খান খান্দানের গোপন মিশনের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো অতিরিক্ত একশত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আফগানিস্তানে এখনও আগা খান বড় বড় মিশন চালু করে রেখেছে। ২০০২ সালে আগা খান আফগানিস্তানের জন্য পচাত্তর মিলিয়ন ডলার সহযোগীতা করে। যেটি যে কোনো একক সহযোগীতার চেয়ে বেশি অর্থ। আফগানিস্তানে চলমান মোবাইল নেটওয়ার্ক ‘রওশন’ও আগা খানের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, গিলগিট এবং বেলুচিস্তানকে চুপিসারে পৃথক প্রদেশ করে দেয়া কি আগা খান রাষ্ট্রের মানচিত্রে রঙ্গ ঢেলে দেয়া নয়? এই আগা খানী রাষ্ট্রের রাস্তায় সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো গিলগিট এবং কুহেস্তান প্রদেশের সিনাই পর্বত। আসল ব্যাপার হলো গিরগিটের সিনাই পর্বত। যেটি প্রত্যেক যুগেই পাকিস্তানের অনুগত থাকে। কিন্তু সেটিকে দ্বিখণ্ডিত করার অবস্থায় কুহেস্তানের লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং রেশমের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এমনি ভাবে আগা খান রাষ্ট্রের পথে রেশমের রাস্তাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল সমস্যা দূর করার জন্য আগা খান খুব দ্রুততার সাথে দুটি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। এক. নারান থেকে

বাবুসারটাপ হয়ে চালাছ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। তারপর এই ভয় দূর হয়ে যাবে যে, কুহেস্তানীরা রেশমের রাস্তা বন্ধ করে দিবে। নারান থেকে চালাছ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ পাকিস্তানী হুকুমত প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে করেছে। এমনটি-ই হোক। কিন্তু যেখানে শাসক শ্রেণি নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, ইসলামের দুশমনদের শক্তির সজ্জিত বাসরে পড়ে আছে, তারা যদি হাজারো রাস্তা নির্মাণ করে এবং বিমান ঘাটিও নির্মাণ করে, তাহলেও সেগুলোতে দুশমনদের সৈন্য এবং বিমান অবতরণ করে। তা না হলেও কুহেস্তান এমনিতেই ভাশা ড্যাম (বাঁধ) নির্মাণের কারণে খালি হয়ে যাবে।

যাদুকর বিজ্ঞানী

ইতিহাসে যতগুলো ইহুদী বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি এবং জ্ঞানী অতিবাহিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই আধ্যাত্মিক নেতা এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। এটাকে মুসলমানদের সরলতা বলা হোক অথবা অন্য কিছুই বলা হোক, যখন আলবার্ট আইনষ্টাইন, ইসহাক নিউটন, চার্লস ডারউইন অথবা লর্ড মেক্লের নাম নেয়া হয়, তখন কেবল এই নামগুলো দ্বারা মুসলমানরা একজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং বুদ্ধিজীবি-ই উদ্দ্যেশ্য নেয়। অথচ এই পরিচয় হলো তাদের যিন্দেগীর একটা অংশমাত্র। আর তাদের আসল যিন্দেগী হলো সেটি, যেখানে তারা একজন যাদুকর এবং অধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে কাটিয়েছে। বরং যদি এ কথাও বলা হয় তাহলেও ভুল হবে না যে, তাদের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে সেই ‘তেলেসমাতি দুনিয়ার’ বড় দখল রয়েছে, যেখানে তারা ইবলিশ ও শয়তানের সাথে মিলে কাজ করেছে। ‘বার্মোডা ট্রায়েঙ্গেল’ নামক বইয়ে মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের বরাত দিয়ে এই কথা লিখেছিলাম যে, আলবার্ট আইনষ্টাইন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে দাজ্জালের সহযোগীতা করছে। মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের এই ধারণার ভিত্তি, তার সেই দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, বর্তমান নতুন টেকনোলজির জ্ঞান ইহুদী বিজ্ঞানীদের আগে ইবলিশ, দাজ্জাল এবং তার জিনদের ছিলো।

আমার নিকট এই উদ্বৃতি ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ ছিলো না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। যেটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতওয়াতে উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. সেই অধ্যায়ে বর্ণনা করেন, কিভাবে শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়। শায়খ এবং মুরীদকে কিভাবে ধোকায় ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া কোনো বান্দাকে প্রয়োজন পূরণকারী মনে করতে থাকে, তখন শয়তান তার সামনে সেই বুযুর্গের আকৃতিতে আসে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। এভাবে মুরীদ মনে করে বাস্তবেই আমার শায়খ আমার প্রয়োজন পূরণ করেছেন। এমনি ভাবে কোনো মুরীদ যখন দূর থেকে তার শায়খ ডাকে, তখন শয়তান তার আওয়াজকে শায়খ পর্যন্ত পৌছে দেয়। যদি শায়খ শরীয়তের পাবন্দ না হয়, তাহলে সে তাকে চিনতে পারে না এবং তার ডাকে সারা দেয়। সেই জবাবকে শয়তান সেই মুরীদ পর্যন্ত পৌছে দেয়। এভাবে মুরীদ ধোকায় পড়ে এবং এ কথা মনে করে যে, আমার শায়খ দূর থেকেই আমার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এধরণের একটি ঘটনা ইবনে তাইমিয়া রহ. লেখেছেন। যেটি ইবনে তাইমিয়া রহ.কে এক শায়খ শুনিয়েছেন, যার সাথে এই ঘটনা ঘটেছিলো। সেই শায়খ বলেন, জিনেরা আমাকে সাদা আলোকিত একটি বস্তু দেখালো। যেটি পানি এবং কাঁচের মতো ছিলো। সে আমাকে যে বিষয়ে সংবাদ দিতে চাইতো সে বিষয়টি এই বস্তুর মধ্যে ছবির মতো দেখা যেতো। সুতরাং মানুষজন এর মাধ্যমে সংবাদ দেয়। জিনেরা আমার কাছে আমার মুরীদদের কথা পৌছে দিতো, যারা আমার কাছে সাহায্য চাইতো।

-মাজমুউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া রহ.।

এই ঘটনার মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষ্যনীয়। এক. ওই বস্তু যেটি পানি এবং কাঁচের মতো দেখতে। যাকে আপনি সহজেই টিভি, কম্পিউটার মনিটরের স্ক্রীন মনে করতে পারেন। টিভি স্ক্রীনে যদি বিদ্যুত সংযোগ করা হয় এবং তাতে কোনো সিগনাল না থাকে, তাহলে সেটি সাদা আলোকিত এবং পানি ও কাঁচের মতই মনে হয়। নতুন এল.সি.ডি স্ক্রীনে তো এ বিষয়টি আরো বেশি পরিস্কার হয়। জিনেরা তার মধ্যে ছবির আকৃতিতে সংবাদ দেখায়। দুই. মুরীদদের আওয়াজ শায়খ পর্যন্ত পৌছানো। এটি

রেডিও জাতীয় কোনো বস্তু হবে। তাছাড়া দুনিয়াবী কাজ-কর্মে জিনদের পারদর্শীতার কথা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে, 'জিনেরা সুলাইমান আ. এর জন্য বড় উঁচু ইমারত, আকৃতি, হাউজের মতো বড় বড় পাত্র এবং জমাট ডেকচি যেমনটি সে চাইতো তৈরি করতো।

-সূরা সাবা/১৩।

বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের শিক্ষিত সমাজ, আইনষ্টাইন, নিউটন, ডারউন, এবং লর্ড মেক্লের যাদুতে এমন ভাবে মজে আছে যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথাই তারা সহ্য করে না, চাই যতো যুক্তি-ই পেশ করা হোক না কেনো? একটি বড় ভুল ধারনা এটাও যে, টেকনোলজি হিসেবে কেবল বর্তমান যামানা-ই উন্নত। আগের যুগের মানুষ উন্নত ছিলো না। আগের উম্মতেরাও নিজেদের যুগে টেকনোলজির উঁচু স্তরে পৌছেছিলো। তবে বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ছিলো। যেমন বর্তমান বিজ্ঞান দ্রুত ভ্রমনের জন্য উড়োজাহাজকে অনেক বড় সফলতা বলে। কিন্তু পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে অনেক কওম যমিনে আমাদের চেয়েও দ্রুত ভ্রমন করতো। তবে সেটা ভিন্ন কথা যে, তাদের বিমানের প্রয়োজন ছিলো না। বরং সেই কাজটাই তারা যমীনের Gravitation ভূমধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে করেছিলো। যা এখন পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞানের আয়ত্বের বাহিরে। যেটি অত্যাধুনিক টেকনোলজির কাজ। মিশরের ফেরাউনরা বড় বড় স্তম্ব কোনো প্রকার মেশিন ছাড়াই উপরে উঠাতো। অথচ আমরা সেটা করার জন্য দৈত্যের মতো বিশালাকার মেশিনের মুখাপেক্ষি। সুতরাং এটা কোনো অবাক হওয়ার কথা নয় যে, ইহুদী বিজ্ঞানীদেরকে তাদের আবিস্কারের মধ্যে ডজন এবং শয়তানরা সহযোগীতা করছে। কারণ, এই কথা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে, ইসহাক নিউটন, ডেভিড রিকার্ডো, কার্ল মার্কস, ফ্রেউড জাং কেবল বিজ্ঞানী নয় বরং ইহুদী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলো। তারা কাবালার জ্ঞান রাখতো। তাদের ছাড়াও কপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, বিকন, ডিসকার্টেজ, ভোল্টাইর, রুশু, এ্যাবট সেইজ, ডেন্টন, টলস্টয় এদের সকলেই ফ্রি ম্যাশন এবং কাবালায় দক্ষ ছিলো।

শয়তানী নেযামের মুকাবেলায় রহমানী নেযাম

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগণিত শয়তান কাজ করে। প্রত্যেক শয়তানের কাজ এবং দায়িত্ব পৃথক পৃথক। তার মুকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হেফাজতের জন্য তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে রহমানী নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। কিন্তু এই রহমানী নেযাম নেহায়তই স্পর্শকাতর বিষয়। তার স্পর্শকাতরতার অনুমান নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম না করার হুকুম থেকে করা যেতে পারে। নামাযী নামায পড়ছে। তার সামনে দিয়ে যদি কেউ চলে যায়, তাহলে নামাযের কী ক্ষতি হবে? নামাযী তো আগের মতই নামায পড়ছে। কিন্তু হাদীসে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কতো শক্ত নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এই রুহানী নেযাম পাক-পবিত্রতা, সত্য-সততা, এখলাস-একনিষ্টতা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই এই সম্পর্ক দূর্বল হয়ে পড়বে, তখন মুসলমানের রহমানী প্রতিরক্ষা নেযামও দূর্বল হয়ে পড়বে। ইসলামের দুশমনরা আমাদের এই রহমানী নেযামকে গভীরতার সাথে পর্যবেক্ষন করেছে। তারা জানে মুসলমানদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে দূর করার জন্য কোন কোন বিষয় থেকে বিরত রাখতে হবে এবং কোন কোন বিষয়ে লিপ্ত রাখতে হবে। আল্লাহর এই দুশমনেরা রুহানী নেযামে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে যে, রহমতের জায়গাগুলোও তাদের শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ নয়। সাধারণ ব্যবহারিক জিনিসগুলোও নষ্ট করে মুসলমানের সামনে পেশ করছে। নতুন শিক্ষা, সাইন্স, টেকনোলজি এবং সভ্যতার মধ্যেও তাদের বিষাক্ত ছোবল স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রহমানী নেযামের সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো বিষয়ে আগাম সতর্ক করেছেন। কোন আমল করে, কোন কথা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে আমরা শয়তান, জিন এবং যাদু থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ওই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যার মধ্যে কুকুর অথবা কোনো প্রাণীর ছবি আছে। মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় জুনুবী (নাপাক ব্যক্তি) লোকের কথাও উল্লেখ আছে। আর আবু

দাউদ শরীফের বর্ণনায় ঘন্টির কথাও উল্লেখ আছে। হাদীসে বর্ণিত এই রহমানী নেযামকে দেখুন এবং বর্তমান মুসলমানদের ঘরের অবস্থা দেখুন। ছবি দিয়ে তো আগেই ঘর ভর্তি ছিলো, আর এখন কুকুর এবং শুকরের কার্টুন ঘরগুলো এমন ভাবে দখল করেছে যে, বাচ্চারা তো কোলে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। হিন্দুদের মতো ঘরের দরজায় ঘন্টি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা সেই ঘন্টি যেটি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং হাতে বাজানো হয়, কলিং বেল নয়। যাতে করে কোনো ফেরেশতা যদি দরজায় এসেও যায়, তাহলে সে দূর থেকেই পালায়। সুতরাং আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা নিজেদেরকে, বাচ্চাদেরকে এবং আমাদের ঘরকে কিভাবে যাদু, জিন এবং শয়তান থেকে রক্ষা করবো। যে কোনো কাজ শুরু করার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, সকাল-সন্ধ্যায় অথবা সফরে বের হওয়ার সময় মাসনুন দু'আসমূহ শিখিয়েছেন, যাতে রহমানী প্রতিরক্ষা নেযাম শক্তিশালী থাকে। রাতে ঘুমানোর দু'আ, বাথরুমে প্রবেশের দু'আ, বাজারে প্রবেশের দু'আ সবগুলোই হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। আপনি সেসব দু'আগুলোতেই ফিকির করুন, তাহলে আপনিই জানতে পারবেন শয়তান কোন কোন জায়গায় থাকে এবং তাদের থেকে কিভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়। আল্লাহর দুশমন শয়তান তো এতটুকুনও সহ্য করে না যে, কোনো মুসলমানের খাবারটাও সঠিক ভাবে পেটে চলে যাক। যদি বিসমিল্লাহ না পড়া হয়, তাহলে তাতেও সে শরীক হয়ে যায় এবং খাবারকে নষ্ট করে দেয়।

শয়তান সন্তানাদির মধ্যেও শরীক হয়

যদি বিসমিল্লাহ না পড়া হয়, তাহলে শয়তান মানুষের সাথে তার সন্তানের মধ্যেও শরীক হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন সন্তানের মধ্যেও তাদের সাথে শয়তান শরীক হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটিও

হবে? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, আমরা শয়তান এবং আমাদের সন্তানের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করবো? তিনি বললেন, কম লজ্জা এবং কম দয়ার মাধ্যমে।

-এটি ইমাম সূয়ূতী রহ. এর জামউল জাওয়ামি'অ এর বরাতে ইমাম দাইলামী রহ. বর্ণনা করেন।

এটাও রুহানী নেযাম যে, একজন মানুষের দৃষ্টি অপরজনের শরীরে প্রতিক্রিয়া করে। সুস্থ-সবল একজন মানুষ, কোনো একজন মানুষের দৃষ্টি দেয়া এবং প্রশংসা করার কারণে চলতে চলতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কারো দৃষ্টি লাগার দ্বারা পরিস্কার চেহারায় সাদা কালো দাগ পড়ে যায়। সুস্থ-সবল যুবকের অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কোনো নেয়ামত পেলে তাতে মাশাআল্লাহ, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলা উচিত। দৃষ্টি লাগার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দৃষ্টি লাগা সত্য। শরীরে ট্যাট্টু লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

-বুখারী শরীফ, বাবুল আইনি হাক্কুন।

মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় রহমানী নেযাম এবং তার ক্ষতি করার নানা চেষ্টা

মানবতার দুশমনেরা এই ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করেছে যে, তারা মানুষকে কুদরতী নেযাম থেকে দূরে সরিয়ে কুদরতের খেলাফ নির্মিত, শয়তানী নেযামের অনুগত করে দিবে। সুতরাং তারা এই পরীক্ষা প্রথমে ইউরোপে করে। ইউরোপবাসীকে কুদরতী জীবন-যাপন থেকে সরিয়ে পূর্ণ শয়তানী জীবন-যাপনে বন্দি করে ফেলেছে। কুদরতের খেলাফ জীবন-যাপনের ফলে যে ক্ষতি মানবজাতির হয়েছে, তা বুঝার জন্য ইউরোপ-আমেরিকার জীবন-যাপন অধ্যয়ন করা-ই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। আমাদের জীবন-যাপনও একই পথে লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটে চলছে। আর এর জন্যই সকল যুদ্ধ এবং শ্লোগান ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম শুধু এজন্যই হচ্ছে যে, মুসলমানদেরকে

রহমানী নেযাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হোক। যাতে তাদের উপর শয়তানী হামলা বেশি থেকে বেশি কার্যকর হয়।

হাদীসসমূহে মুরগের গুরুত্ব

বুঝার জন্য এখানে খুব সহজ উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। কিছু দিন আগেও দেশী মুরগ প্রত্যেক ঘরে থাকতো। যেগুলো সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত সময়ে-অসময়ে বাগ (আযান) দিতো। দেশী মুরগের যেমন বাহ্যিক ফায়দা রয়েছে, তেমনি রুহানী ফায়দাও রয়েছে। কিন্তু নতুন সমাজে পা রাখার সাথে সাথে মানুষ নিজের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ লাভ-ক্ষতি থেকে এমন ভাবে গাফেল হয়ে যায় যে, যেমন কারো উপর জিন আছর করে ফেলে। না তার কোনো অনুভূতি থাকে, না নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে তাই পছন্দ করে, যা নতুন সমাজ চায়। এর হাজারো উদাহরণ আমাদের সমাজে রয়েছে। কিন্তু শুধু মুরগের উদাহরণ দিয়েই শেষ করছি।

দেশী মুরগের ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশী মুরগের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা মুরগের বাগ শুনবে, তখন আল্লাহর করুণা চাইবে। কারণ, এই মুরগ ফেরেশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কারণ, গাধা শয়তানকে দেখেছে।

-বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

ফায়দাঃ কাজী ইয়ায রহ. বলেন, মুরগের বাগ দেয়ার সময় ফেরেশতা থাকে। সে ফেরেস্তা দু'আকারীর সাথে আমীন বলে, তার জন্য ইস্তেগফার করে এবং তার এখলাস ও একাগ্রতার সাক্ষ্য দেয়। এজন্য সেসময় দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, মুরগকে গালি দিয়ো না। কারণ, সে নামাযের জন্য জাগ্রত করে।

-মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ শরীফ, আলবানী রহ. এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩. উবায়দা ইয়ানী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা মুরগ পছন্দ করতেন। নামাযের সময় জানতে এবং জাগ্রত হওয়ার জন্য তিনি সাদা মুরগ রাখতেন। এই মুরগ নামাযের আযান দেয়। ঘুমন্তদেরকে নামাযের জন্য জাগ্রত করে। নিজের বাগ (আযান) দিয়ে জিন দূর করে।

-ইতহাফুল খিয়ারাতুল মুহরাহ লিল বুসিরী, আল মাতালিবুল আলিয়া লি-ইবনে হাজার আসকালানী রহ.।

ফায়দাঃ এই শেষ বর্ণনাটি যদিও দূর্বল কিন্তু এর বিষয়বস্তুর বর্ণনা বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন শব্দে এসেছে। যেগুলোতে এই বর্ণনা আছে যে, সাদা মুরগ ঘরে থাকলে সেই ঘরের কাছেও শয়তান এবং যাদু আসে না। কিছু কিছু মুহাদ্দিস এ ধরণের বর্ণনাকে দূর্বল এবং জাল বলেছেন। ইমাম শাওকানী রহ. 'আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসীল মাউজুআহ' গ্রন্থে এমনই এক হাদীস 'ঝুটিতে ডোরাকাটা দাগওয়ালা সাদা মুরগ আমার বন্ধু।' এর ব্যাপারে উল্লেখ করেন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এই হাদীসকে জাল বলার কারণ আমার নিকট স্পষ্ট নয়। তারপর লেখক বলেন, এই হাদীস বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনায় সাদা বড় মুরগের কথা এসেছে। সুতরাং হাদীস দূর্বল হবে জাল নয়।

- আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসীল মাউজুআহ ১/১৭২।

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ. মুরগের ফাযায়েলের ব্যাপারে 'আল ওদীক ফি ফাযলিদ্দীক' নামক পুস্তিকা লেখেন। হাফেজ আবু নুআইম রহ. মুরগের ফাযায়েলের উপর একটি পুস্তিকা লেখেন।

-কাশফুয যুনুন।

হাদীসে বর্ণিত মুরগ দ্বারা কি শুধু দেশী মুরগ উদ্দেশ্য নাকি ফার্মের মুরগও উদ্দেশ্য? যেসব বৈশিষ্টের কারণে মুরগ পছন্দ করা হয়েছে, সেগুলো তো কেবল দেশী মুরগেই পাওয়া যায়। ফার্মের মুরগ ভোর রাতে আযান দেয় না। অন্যকে জাগ্রত করা তো দূরে থাক, নিজেই সারাক্ষন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। এই পার্থক্য তারা ভালো করে বুঝবেন, যারা দেশী এবং ফার্মের মুরগের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখেন। মনে হচ্ছে খুবই মূল্যবান

এক বস্তু থেকে আমাদেরকে সরিয়ে ফার্মের মুরগের উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফার্মের মুরগের খাদ্য ক্যামিকেল ভর্তি ইনজেকশন আর বিভিন্ন ঔষধ। কুদরতী নেযামের মুকাবেলায় কৃত্রিম নেযামের মাধ্যমে ফার্মের মুরগ তৈরি করা হয়। এমনকি উভয়টির স্বাদ এবং প্রতিক্রিয়াও একদমই সুস্পষ্ট। ঘরে মুরগ থাকলে যতবার বাগ দিবে ততবার শ্রবনকারীরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ চাইবে। ফেরেশতা আসার সংবাদ পাবে। আরো অনেক ফায়দা রয়েছে, যেগুলো থেকে নতুন সমাজব্যবস্থা মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করেছে। আমরা মুরগের উদহরণ দিয়েছি সহজে বুঝার জন্য। অন্যথায় রহমানী নেযামকে ধ্বংস করার জন্য এবং ফেরেশতাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দীনের দুশমনেরা নিয়মিত মিশন ঠিক করে আমাদের উপর আক্রমণ করে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে এমন অসংখ্য জিনিস আপনি পাবেন যেগুলোতে মুসলমানদেরকে লিপ্ত করা হয়েছে। যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে এগুলোর দুনিয়াবী কোনো উপকারও পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারপরও মানুষ সেগুলোই বেছে নিচ্ছে। মানুষ তার বাস্তবতাও জানে না আবার এ কথাও জানে না যে, সে এই কাজ করার দ্বারা নিজের কতো বড় ক্ষতি করছে। খাবারজাতীয় দ্রব্যের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম এবং ক্ষতি করছে। সুতরাং খাবার এবং পানীয়ের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষত যেসব পণ্য মিডিয়ার মাধ্যমে খুব দ্রুত প্রশিদ্ধ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে। যেমন আগে বলা হয়েছে, ইসলামের দুশমনরা আমাদের প্রতিরক্ষার কুদরতী ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করেছে, যারফলে আমাদের সমাজে এমন কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে যে, দুনিয়ার সবধরণের শয়তান আমাদের ঘর, গলি এবং মহল্লায় উপস্থিত থাকে। যতটুকু কমতি ছিলো, তা থাকার ঘরের সাথে এটাচ বাথরুম এসে পূর্ণ করে দিয়েছে। একই অবস্থা মসজিদের সাথে পাবলিক টয়লেটের। যার প্রতি উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

মসজিদের সাথে টয়লেট

মসজিদের ভিতর টয়লেট বানানোর যে প্রথা ব্যাপক আকার ধারন করেছে, সে ব্যাপারে কিছু কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেঁয়াজ ইত্যাদি খেয়ে নামাযে এবং মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। কারণ, পেয়াঁজ খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। পেশাবখানা এবং টয়লেট থেকে যে দুর্গন্ধ আসে তা ফেরেশতারা কিভাবে সহ্য করবে?

২. পেশাবখানা এবং টয়লেট নাপাকীর জায়গা। প্রত্যেক নোংরা জায়গা ইবলিশ এবং তার সন্তানাদির ঠিকানা। মসজিদেও যদি তাদের ঠিকানা বানিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বেচারা মুসলমানরা কোথায় যাবে?

৩. কিছু মসজিদের পেশাবখানার দুর্গন্ধ এতই মারাত্মক হয় যে, মানুষ মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়তে মুখ খুললে দু'আ পড়া মুশকিল হয়ে পড়ে। বড় বড় শহরেও আমি এমন পরিস্কার মসজিদ দেখেছি যে প্রবেশ করতেই পেশাবের দুর্গন্ধ ছুটতে থাকে। এতে নামাযীদের খুবই কষ্ট হয়।

৪. কোনো অফিসার কী তার অফিসে পাবলিক টয়লেট রাখতে রাজি হবে? এই পঁচা কাজের জন্য কি আল্লাহর ঘরই বাকি থাকলো? পথিকের মন চাইলো আর মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে সেখানে কাজ সেরে চলে গেলো?

৫. আপনার এই বাক্যটি কেমন লাগবে যে, কেউ জিজ্ঞেস করলো, 'পায়খানা কোথায় করবো?' আর তাকে বলা হলো, উদাহরণত, এস.পি সাহেব, সম্মানিত মন্ত্রি সাহেব অথবা মুহতারাম প্রেসিডেন্ট সাহেবের ঘরে করে আসুন। অথবা কোথাও লেখা দেখলেন, মসজিদ/টয়লেট।

৬. অধিকাংশ মসজিদের পেশাবখানা ওযুখানার সাথেই হয়। যেখান থেকে বিশ্রি দুর্গন্ধ ওযুখানাতে আসতে থাকে। ওযুখানাতে আগত ফেরেশতাদের কী অবস্থা হবে?

৭. দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় ফেরেশতা বেশি আসবে নাকি শয়তান?

৮. আপনি এ কথা বলতে পারেন যে, সবগুলোই অক্ষমতার কারণে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলে এই অক্ষমতা মসজিদ থেকে ১০/১৫ মিটার

দূরে নিয়ে যেতে পারলো না? তাছাড়া উলামায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন, ওয়াজিব বলেননি।

৯. যদি এতই অক্ষমতা থাকে, তাহলে কোনো বাণিজ্যিক কেন্দ্র, কোনো সরকারি অফিস অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নামাযীদের জন্য টয়লেট বানানো যেতে পারে।

১০. এই স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী, জায়েয না জায়েযের প্রশ্ন করছি না। মসজিদের পবিত্রতা, ইসলামের রুহানী নেযাম এবং শয়তান থেকে হেফাজতের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

মুসলমানদের রহমানী নেযামকে ধ্বংস করার আরো একটি উদাহরণ জুমার দিন। জুমার দিন ছুটি শেষ করা, সেদিন জুমার নামাযের পূর্বে মানুষকে বাজার এবং অফিসে ব্যস্ত রাখা এতো বড় ক্ষতি যে, মুসলমান যদি গোটা দুনিয়ার দৌলতও হাত করে নেয়, তাহলেও জুমার দিনের রুহানী ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

জিন লাফিয়ে রহমানী কেল্লায় এসে যাবে!

সবগুলো কথার প্রতি লক্ষ্য করে আমাদেরকে নিজেদের ঘর, বিশেষ করে নিজেদের বাচ্চাদের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ, ফেতনা চারপাশ থেকেই আক্রমণ করছে। এই আক্রমণ বাচ্চাদের স্কুলেও আছে। সেখানে তাদেরকে কার্টুন বানানো এবং রাখা, শরীরে উল্কি আঁকা ইত্যাদি শিখানো হয়। আমাদের উচিত মহল্লাবাসীরা মিলে স্কুলের দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাত করা এবং ইসলামের রহমানী নেযাম সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা। এটা কোনো জ্ঞানীর কথা নয় যে, মাসিক বেতনও দিবো আবার নিজের বাচ্চাদের উপর শয়তান এবং জিনও বয়ে আনবো। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রত্যেক জায়গাতে, প্রত্যেক মজলিসে, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনকে তৈরি করা উচিত। মানুষদেরকে এর বিরোধীতা করতে উদ্ধুদ্ধ করা উচিত। বাচ্চাদের কাপড়ে কার্টুনের ব্যাপারটাও এমনি। এ বিষয়টিও আমাদের পোষ্টমর্টেম করা উচিত। এর ক্ষতি প্রত্যেক ঘরেই দেখা যেতে পারে। ঘরে ঘরে জিন এবং যাদুর প্রভাবের শেকায়াত

বাড়তেই আছে। নিজের এবং বাচ্চাদের চারপাশে রহমানী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে মাসনুন দু'আসমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নেক আমল, (যার মধ্যে জিহাদ হলো সর্বোচ্চ চূড়া) হালাল রিযিক এবং সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতে হবে। রহমানী নেযাম থাকা অবস্থায় শয়তানী হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। শয়তানরা ফেরেশতাদের সামনে থাকতে পারে না। জিহাদের প্রস্তুতি, ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমেও শয়তানী শক্তি পালিয়ে যায়। এমনি ভাবে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের দেখেও শয়তান পালায়ন করে। তাই আল্লাহর এমন নেক বান্দার সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে, যার আকীদা কুরআন-হাদীসের অনুগত। ঘর থেকে ছবি, মিউজিক, গান-বাদ্যের ঘন্টা এবং ওইসব জিনিস, যার কারণে ঘরে ফেরেশতা আসে না সেগুলো বাহিরে নিক্ষেপ করুন। কারণ, মিউজিকের প্রত্যেক বাদ্যের সাথে পৃথক পৃথক শয়তান থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের এ কথা বুঝা উচিত যে, সে প্রতিটি মূহুর্তে যুদ্ধরত আছে। তার দুশমন প্রকাশ্য শত্রু, যে প্রতি মূহুর্তে তার গাফেল হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। আমাদের এ কথা বলা উচিত নয় যে, এই যুগে এসব বস্তু থেকে কিভাবে বাঁচবো? এই বাক্য ঈমানের দূর্বলতা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকার আলামত। যার যিন্দেগীর মাকসাদ আখেরাত সুসজ্জিত করা, সে সর্বদাই তা বাঁচানোর ফিকির করে। কখনো হাতিয়ার ফেলে দেয় না। দুশমনও তার কাজে লেগে আছে আপনিও লেগে থাকুন। আল্লাহর সহযোগীতায় আপনি-ই বিজয়ী হবেন। মনে রাখতে হবে, জিন এবং শয়তানদের প্রভাব তাদের উপরই চলে যারা তাদেরকে বন্ধু বানায়, অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী করে। ইবলিশ নিজে আল্লাহ তা'আলাকে বলেছিলো, আমি তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া গোটা মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করবো।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, নিশ্চয় শয়তান তাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। তার প্রভাব কেবল তাদের উপর থাকবে, যারা তাকে বন্ধু বানাবে এবং তার সাথে শরীক হবে।

-সূরা নাহল/১০০।

এজন্যই সকল মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য, নামাযের পাবন্দী, কুরআন তেলাওয়াত, হারাম মাল থেকে বেঁচে থাকা, গান-বাদ্য থেকে দূরে থাকা এবং যিকির-আযকারে মশগুল থাকা উচিত। যদি কোনো পেরেশানী আসে, তাহলে কোনো পেশাদার পীরের কাছে না গিয়ে এমন কোনো আলেমের কাছে যাবেন, যিনি শরীয়তের ইলম রাখেন এবং কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে আপনাকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন। তাছাড়া আল্লাহর নেক বান্দাদের নিকট সেসব যাদুকরের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নেয়া উচিত, যারা সাধারণ মুসলমানের যিন্দেগীকে আযাবে পরিণত করেছে। যারা আমাদের উলামায়ে কেরামের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ করে যাচ্ছে। প্রথমে উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করবেন, সেসব যাদুকরের ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম? আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে হেফাজত করুন। দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিন। আমীন।

চলমান ফেতনার মধ্যে কি চুপ থাকা উচিত?

বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্বের সামনে যে পরিস্থিতি দৃশ্যমান, এমতাবস্থায় একজন মুসলমানের কী করা উচিত? কার সঙ্গ দেয়া উচিত? নাকি চুপ করে বসে থাকবে? কিছু লোকের ধারণা, এটা ফেতনার যুগ। ফেতনার সময় কারো সঙ্গ দেয়া উচিত নয়, বরং চুপ থাকা উচিত। প্রশ্নগুলোর জবাব জানার আগে আমাদের জানা উচিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক যুগের ফেতনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক ফেতনা বর্ণনা করার সাথে সাথে তা থেকে বাঁচার পদ্ধতিও বলেছেন। এমন নয় যে, প্রত্যেক ফেতনা থেকে একই পদ্ধতিতে বাঁচা যাবে। এক ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য অন্য ফেতনা থেকে বাঁচার পদ্ধতি অবলম্বন করলে চলবে, এমনটিও নয়। সহজে বুঝার জন্য আমরা এখানে কিছু হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলোতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ফেতনা বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তা-ও বলে দিয়েছেন।

১. আবু যর গিফারী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, তোমাদের তখন কী হবে যখন তোমাদের উপর এমন শাসক হবে, যারা নামাযকে আপন সময় থেকে পিছনে নিয়ে আদায় করবে? অথবা নামাযকে তার আপন সময় থেকে সরিয়ে বরবাদ করে আদায় করবে? আবু যর রা. জিজ্ঞেস করলেন, তখন আপনি আমাকে কী করতে আদেশ করেন? তিনি বললেন, তোমরা নামাযকে তার ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করবে। যদি শাসকদের সাথে পড়তেও হয়, তাহলে পড়বে। সেটা তোমাদের জন্য নফল হয়ে যাবে।

-মুসলিম শরীফ।

ফায়দাঃ এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের ওয়াক্তকে বরবাদ করার ফেতনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার সমাধানও বলেছেন। এখন এখানে যদি কেউ এ কথা বলে, এটি একটি ফেতনা। ফেতনার সময় ঘরে চুপ করে বসে যাওয়া উচিত, তাহলে কি এটি সঠিক হবে? না। চিকিৎসা সেটি-ই করতে হবে, যেটি নবুওয়াতের যবানে বাতলে দিয়েছেন। সুতরাং বনু উমাইয়ার যুগে এই ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষত হাজ্জায বিন ইউসুফের সময়। যেসব উলামায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছেন তার কারণসমূহের একটি হলো, নামাযের ওয়াক্ত নষ্ট করা।

২. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ফেতনার যুগে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজের ঘোড়ার লাগাম অথবা নাকের রশি ধরবে এবং আল্লাহর দুশমনদের পিছনে ধাওয়া করবে। আল্লাহর দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে এবং ভীতি প্রদর্শন করবে। অথবা সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের বাসগৃহে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে থাকবে এবং আল্লাহর হকসমূহ আদায় করবে।

-ইমাম হাকিম রহ. এই হাদীসকে বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.ও এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ফায়দাঃ এই হাদীসে ফেতনার সময় জিহাদকারীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, এমন একটি সময় খুবই নিকটবর্তী যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম মাল হবে সেসব বকরী, যেগুলোকে নিয়ে ফেতনা থেকে দীন বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বিরানভূমিতে পালায়ন করবে।

-বুখারী শরীফ ১/১৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৭/৪৪৮, মুসনাদে আবু ইয়ালা ২/২৭১।

ফায়দাঃ এই হাদীসের শব্দগুলো যদিও ব্যাপক, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রা. এর একটি দল এই হাদীসের উপর তখন আমল করেছেন, যখন উসমান রা. এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য প্রকাশ পায়। সুতরাং কিছু সাহাবায়ে কেরাম রা. মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে দূর গ্রামাঞ্চলে চলে যান। এই হাদীস এমন যুগের কথাও বর্ণনা করছে, যখন সব ধরণের ফেতনা হবে। সেসব ফেতনা থেকে সে-ই বাঁচতে পারবে, যে পাহাড়ের চূড়ায় পালায়ন করবে। কেননা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে নিলেও সেসব ফেতনা থেকে বাঁচা সম্ভব হবে না। ফেতনা ঘরে প্রবেশ করে আক্রমণ করবে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. 'আত তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানিদ' গ্রন্থে বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় 'ফিতান' বহুবচনের শব্দ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সব রকমের ফেতনা।

সেসব ফেতনারই একটি বড় ফেতনা হলো, দুনিয়া জুড়ে সুদী নেযামের সয়লাব। যেটিকে সূদের হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে। যখন হারামখুরী ব্যাপক আকার ধারণ করবে। মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য সূদী অর্থনৈতিক নীতিমালার উপর চলবে। মানুষের সাথে লেনদেনের সময় মুসলমান হারাম খাওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না। তখন হারাম থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় পালায়ন করবে এবং সেখানে হালাল রুজী অর্থাৎ বকরীর আয় থেকে খাবে। এমন সময় যদি কেউ ঘরে থাকে, তাহলে সে সেখানে সূদী নীতিমালার অধীনে উপার্জিত কামায় থেকেই খাবে। সুতরাং যা সে খাবে, সবই সূদ অথবা সূদের ধূলো-বালি খাবে।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার, ইবনে রজব রহ. 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, সেই ফেতনার সময় সর্বোত্তম মাল বকরী হবে। কারণ, সেগুলো নিয়ে লোকালয় থেকে দূরে চলে যাবে, সেসব বকরীর গোশত খাবে, দুধ পান করবে এবং সেগুলোর পশমের কাপড় পরিধান করবে। আর বকরীগুলো পাহাড়ের ঘাস খাবে, পানি পান করবে। এই ফায়দা বকরী ছাড়া অন্য কিছুতে পাওয়া যাবে না। এজন্যই পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতে বলেছেন। কারণ, পাহাড়ের চূড়া দুশমন থেকে আশ্রয়ের জন্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

-ফাতহুল বারী।

৪. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের আগে এমন ফেতনা আসবে, যা আধাঁর রাতের টুকরোর মতো হবে। তখন মানুষ সকালে মুমীন হবে এবং সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। আবার সন্ধায় মুমিন হবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। সেসব ফেতনার সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। চলমান ব্যক্তি ছুটন্ত ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। সুতরাং তোমরা তখন নিজেদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে। ধনুকের তারগুলো কেটে ফেলবে। তলোয়ারগুলো পাথরে আঘাত করবে। (ভোঁতা করে দিবে) তারপরও তোমাদের নিকট যদি কেউ আসে তাহলে আদম আ. এর দুই সন্তানের মধ্যে উত্তম সন্তানের মতো হয়ে যাবে। (হাবিলের মতো কতল হয়ে যাবে)

-এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ শরীফ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকিম এবং বায়হাকী শরীফ।

ফায়দাঃ এই হাদীসের মধ্যে এমন সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন যুদ্ধরত উভয় দল হকপন্থী হবে। তখন কারো বিরুদ্ধেই হাতিয়ার উঠানো যাবে না। এই হুকুম তখনও হবে, যখন কোনো মুসলমানকে আহলে হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হুকুম করা হবে।

৫. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা.কে তরবারি দিলেন এবং বললেন, এই তরবারী দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষন তারা যুদ্ধ

করবে। অতঃপর যখন মুসলমানরা আপসে যুদ্ধ করবে, তখন এই তরবারীকে উহুদ পাহাড়ের কাছে নিয়ে আসবে। তারপর পাহাড়ের উপর আঘাত করতে করতে তাকে ভোঁতা করে দিবে এবং ভেঙ্গে ফেলবে। তারপর ঘরে এসে চুপ করে থাকবে। যতক্ষন না তোমার কাছে কোনো যুদ্ধ অথবা হত্যাকারী এসে যাবে। আবু দাউদ শরীফের অপর একটি বর্ণনায় শেষ শব্দ এমন; সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আমাদেরকে আপনি কী আদেশ করেন? তিনি বললেন, ঘরের কোনে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ঘর থেকে বের হবে না।

-ইবনে আসাকিরের সূত্রে কানজুল উম্মাল।

সাহাবায়ে কেরাম রা. উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর ৩, ৪ ও ৫নং হাদীসে বর্ণিত ফেতনাগুলো দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধগুলোকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর একটি দল সেই ফেতনার সময় সেসব ক্ষেত্রে একাকিত্ব অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস, উসামা বিন যায়েদ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব, আবু হুরায়রা, সাঈদ বিন যায়েদ, সোহাইব বিন সিনান রুমী, মুগীরাহ বিন শুবা, আব্দুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবি সারাহ, সাঈদ বিন আস, যায়েদ বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম শামিল ছিলেন।

-সিয়ারে আ'লামুন নুবালা লিযযাহাবী, আল ইসাবাহ লি-ইবনে হাজার রহ.।

সুতরাং কিছু সাহাবায়ে কেরাম মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে দূরের গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইহুদী সরদার কাআব বিন আশরাফকে কতলকারী মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা.ও ছিলেন। তিনি এবং সালামা বিন আকওয়া রা. উভয়ে 'রবযাহ' (মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিনপূর্বে ১০০ কি.মি. দূরের একটি গ্রামে) নামক গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।

হুযায়ফা রা. বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যাকে ফেতনা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি হলেন, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রা.

-উসদুল গবাহ।

ইমাম তাউস রহ. বলেন, আমরা রবযাতে এসে একটি তাবু টানানো দেখলাম। তাতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রা. ছিলেন। আমরা তাঁকে

কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি তাদের শহরের কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করবো না, যতক্ষন না ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

-উসদুল গবাহ।

সালামাহ বিন আকওয়া রা. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় যখন ফিরে এলেন, তখন হাজ্জাজ বলল, আপনি তো হিজরত থেকে ফিরে গিয়েছিলেন এবং গ্রামে গিয়ে বসেছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, না। আমি হিজরত ত্যাগ করিনি বরং আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন।

-বুখারী শরীফ।

তরবারী ভেঙ্গে ফেলার হুকুম কেনো দেয়া হয়েছে?

এটাও দেখা উচিত যে, কেনো তরবারী ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেয়া হয়েছে। কারণ, তরবারী আল্লাহর কালেমার বুলন্দী এবং মুসলমানের জান ও মাল হেফাজতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিলো। কিন্তু যদি এমন যুগ আসে, যখন একজন সৈন্য অথবা মুজাহিদকে এই তরবারী দিয়ে এমন কাজ করতে হয়, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্টি রয়েছে, তখন এই তরবারী চালানোর চেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলা-ই উত্তম। আল্লাহর দীনের বুলন্দীর জন্য চলার পরিবর্তে যদি আল্লাহর দীনের খেলাফ চলতে শুরু করে, আল্লাহর দীনের কল্যাণে লড়াইরতদের বিরুদ্ধে চালাতে হুকুম করে অথবা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনের হেফাজতের জন্য চালাতে বলা হয়, তাহলে এ কথা প্রকাশ্য যে, তলোয়ার চালানোর ফযীলত তো দূরের কথা ঈমান থেকেও হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। তাই এমন যুদ্ধে শরীক হওয়ার চেয়ে তরবারী ভেঙ্গে ফেলা-ই উত্তম। এখন এখানে এই প্রশ্ন হবে যে, একজন লোক সেনা বাহিনীর সদস্য। তার উপার্জনের মাধ্যমই হলো গণীমত অথবা নির্ধারিত বেতন। এখন সে খাবে কোথা থেকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বকরী নিয়ে পাহাড়ে চলে যাও এবং হালাল রিযিক খাও।

আবু বকর রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে একে অপরের মুকাবেলায় আসবে, তখন নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী দু'জনই জাহান্নামে

যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হত্যাকারী জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপার তো বুঝে আসলো, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেনো জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন, সে-ও তার মুসলমান ভাইকে কতল করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো।

-বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

মোল্লা আলী কারী রহ. মেরকাতে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীসের উদ্দেশ্য মুসলমানদের সেই যুদ্ধ, যা কোনো চেতনা, ব্যক্তিত্ব এবং মূর্খতার ভিত্তিতে হয়। যেমন, দুই এলাকার মুসলমানের মধ্যে, দুই গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে শরয়ী এমন কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, যার কারণে কোনো এক দল শরীয়তের বুলন্দীর জন্য বের হয়। তাছাড়াও এই হাদীসে মুসলমানদের মধ্যকার যে কোনো রকমের যুদ্ধকে গযওয়ায়ে সিফ্‌ফনের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়।

-মেরকাত শরীফ।

যদি একদিকে আমেরিকার পক্ষে লড়াইরত ইরাকী সেনা বাহিনী থাকে আর অপর দিকে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ থাকে, তাহলে কি নিহত এবং হত্যাকারী উভয়জনই জাহান্নামে যাবে? (নাউযুবিল্লাহ) এমনি ভাবে তালেবান এবং হামীদ কারজাইয়ের সেনা বাহিনী সামনা সামনি হয়, তাহলেও? কক্ষনো নয়।

সারকথাঃ উল্লেখিত সকল আলোচনার মূলকথা হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে যুদ্ধে কারো পক্ষ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এই যুদ্ধ নয়, যার একদিকে গোটা বিশ্বের কুফরী শক্তি এবং অপরদিকে আল্লাহর দীনের বুলন্দি ও মুসলমানদের জান ও মাল হেফাজতের জন্য লড়াইরত তালেবান মুজাহিদীন। বরং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো, যেটি মোল্লা আলী কারী রহ. বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ দেশত্ববোধ, জাতীয়তা, ভাষাপ্রেম এবং যে কোনো চেতনার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ। অর্থাৎ তলোয়ার ভাঙ্গার হুকুম আমেরিকার পক্ষে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াইরতদের জন্য। যদি তাদেরকে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তারা অস্ত্র ছেড়ে ঘরে চলে আসবে। যদি ঘরেও বাধ্য করার ভয় হয়, তাহলে এমন কোনো পাহাড়ে চলে যাবে যেখানে কেউ তাকে এই গুনাহের উপর বাধ্য করতে না পারে।

এই একই হুকুম ভারতী সেনা বাহিনীতে কর্মরত মুসলমানদের জন্য। বরং সমস্ত মুসলমানের জন্য এই হুকুম। তারা ইসলামের বুলন্দির জন্য যারা লড়াইরত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।

অচিরেই এমন ফেতনা হবে যা বধির, বোবা এবং অন্ধ হবে। তার কাছে যে আসবে তাকেই টেনে নিবে। সেসময় যবান খোলাও তলোয়ার চালানোর মতো হবে।

-আবু দাউদ শরীফ; হাদীস নং ৪২৬৪, তিবরানী ফিল আউসাথ; হাদীস নং ৮৭১৭।

ফায়দাঃ মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, সেটি এমন ফেতনা হবে যার মধ্যে হক ও বাতিল চিহ্নিত করা যাবে না। উপদেশ, কল্যাণকামী, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের কথাও কেউ শোনবে না।

-আউনুল মাবউদ।

এই হাদীসে যে ফেতনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে যবান হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো আলী রা. এবং মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যকার যুদ্ধ। তাতে চুপ থাকার কথা বলা হয়েছে। দু'জনের কাউকেই দোষারোপ করতে বারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, ফেতনার সময় এমন কোনো কথা বলবে না যার দ্বারা ফেতনা আরো বেড়ে যায়। মোল্লা আলী কারী রহ. দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে বেশি উপযুক্ত বলেছেন। আল্লামা তীবি রহ. প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বর্তমান যামানায় এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মিডিয়া মানুষকে এমন অন্ধ, বধির এবং বোবা বানিয়েছে যে, মিডিয়া যা বলছে তা ছাড়া কিছু বুঝছেও না শোনছেও না। মিডিয়া সোয়াতের এক বানানো ভিডিও দেখিয়ে লোকদেরকে এমন অন্ধ ও বধির বানিয়েছে যে, অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত ইসলামী শাস্তির বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং নিজের ঈমান নষ্ট করছে। তারা সত্য কোনো কথা শুনছিলোও না আবার সত্য বুঝার চেষ্টাও করছিলো না। এর একটি বড় উদাহরণ হলো লাল মসজিদ এবং জামিয়া হাফসার ব্যাপারটা। প্রশাসন ব্যাপারটাকে মানুষের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করেছে যে, মানুষ অন্ধ, বধির এবং বোবা হয়ে যায়। এই ফেতনায় একটা বিড়াট সংখ্যক লোক হকের বিরোধী হয়ে যায়।

তখন যারা কথা বলছিলো, তাদের কথায় ছিলো নিরাপত্তা এবং হেফাজতকারীর ধোয়া। এমনকি বহু লোকের কথা নিস্পাপ ছাত্রীদের কতলের কারণ হয়েছিলো। তাই ফেতনার সময় যখন মানুষ বাতিলকে হক মনে করে নেয়, সবার যবান হকের বিরুদ্ধে চলে এবং বাতিলকে শক্তিশালী করে, তখন যবান খোলা হাতিয়ার চালানোর মতো। আপনি সেসময়ের কথা স্মরণ করুন, মানুষ কিভাবে অন্ধ, বধির এবং বোবা হয়েছিলো; সবার মুখে কেবল সেসব কথাই ছিলো, যা মুশাররফের দরবার থেকে বয়ান করা হতো। এখনো জিহাদ এবং মুজাহিদদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যতো প্রশ্ন তার সবগুলো এই দাজ্জাল মিডিয়া তাদের মনে বসিয়েছে। বাস্তবপক্ষেই মানুষকে হেপনাটাইজ অর্থাৎ অন্ধ, বধির এবং বোবা বানিয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এই আলোচনার দ্বারা এই কথাও স্পষ্ট হয়েগেছে যে, প্রত্যেক ফেতনা অন্যটি থেকে পৃথক। তেমনি ভাবে প্রত্যেকটির চিকিৎসাও তাই হবে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু ফেতনার ব্যাপারে যদিও এ কথা বলেছেন যে, তোমরা ঘরে বসে থাকবে, কারো সঙ্গ দিবে না, নিজের তলোয়ার ভোঁতা করে দিবে এবং ধনুক ভেঙ্গে ফেলবে, কিন্তু এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য সেই অবস্থা যেটি মোল্লা আলী কারী রহ. বর্ণনা করেছেন।

বর্তমান যুদ্ধ কি মুসলমানদের আপসে লড়াই?

যদি কেউ উল্লেখিত হাদীসগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমান যামানায় এমন করতে চায়, তাহলে তা কখনোই সহীহ হবে না। যেমন ইরাকীরা বলবে ইরাকে মুসলমান মুসলমান যুদ্ধ করছে, তাই এটি ফেতনা। সুতরাং ফেতনার সময় কারো সঙ্গ দেয়া যাবে না। আফাগানীরা বলবে তালেবানরাও মুসলমান এবং কারজাই ও তার সেনা বাহিনীও মুসলমান। সুতরাং এটি জিহাদ নয় ফেতনা। এমনটি ভাবা সুস্পষ্ট কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা। কারণ, কুরআন কাফেরদের পক্ষে লড়াইরতদের ব্যাপারে সেই হুকুমই বর্ণনা করেছেন যেটি কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য।

মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম এমন লোকদের ব্যাপারে খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা ইসলাম এবং কুফরের যুদ্ধ। প্রত্যেক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা জানেন যে, আমেরিকা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মুসলমানদের কাছে কী চায়। সুতরাং এমন সময়ে যদি কোনো মুসলমান একক ভাবে অথবা দলবদ্ধ হয়ে অথবা প্রশাসনিক ভাবে আমেরিকার সঙ্গ দেয় এবং তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে কি তাকে মুসলমানদের পরস্পরের যুদ্ধ বলবো? কক্ষনো নয়। এসব লোক যদি নিজের মাথার উপর কুরআন নিয়েও ঘুরে, তাহলেও তাদের জন্য সেই হুকমই হবে যা কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। ইরাকে নূরী মালিকী এবং তার রাফেজী পুলিশ সবক্ষেত্রে প্রথম আমেরিকার হাত হয়েছে। যারা আমেরিকার সাথে মিলে আমেরিকানদের সামনে থেকে মুসলমানদের উপর জুলুমের পাহাড় ভাঙ্গছে। তাদের ব্যাপক ভাবে হত্যা করছে। কালেমা ওয়ালা মা বোনদেরকে পশুত্বের নিশানা বানিয়েছে। নামাযীদের উপর মসজিদের ছাদ ভেঙ্গে দিয়েছে। ধন-সম্পদ লুট করেছে। আরব বিশ্বের হকপন্থী উলামায়ে কেরাম আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া জারি করেছেন। মুজাহিদীন জিহাদ শুরু করেছেন। যেহেতু নুরী মালিকীর সেনা বাহিনী আমেরিকার প্রথম হাত, তাই প্রথম লড়াই তাদের সাথেই হয়। এখন যদি কেউ বলে, এটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ, কারো সঙ্গ দেয়া যাবে না, তাহলে এই কথা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের শাস্তি তো আমেরিকার কাফেরদের চাইতেও কঠিন। একই ব্যাপার আফগানে হামিদ কারজাই এবং তার মুরতাদ মিলিশিয়াদের; যারা আল্লাহর যমীন থেকে আল্লাহর আইন মিটিয়ে দিয়ে দাজ্জালের বাহিনীকে এনে বসিয়েছে। তারপর তালেবানরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে। এটিকে কি মুসলমানদের পরস্পরের যুদ্ধ বলা হবে? তারা কিভাবে মুসলমান হতে পারে, যারা আল্লাহর দীনের উপর সন্তুষ্ট নয়, আমেরিকার দীনের উপর সন্তুষ্ট এবং কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? সুতরাং আমেরিকানদের যে হুকুম তাদেরও একই হুকুম। চাই তারা নামায পড়ুক অথবা লম্বা লম্বা দাড়ি রাখুক। তাদের ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। এমনি ভাবে যদি

ভারতে কোনো মুসলমান দল, ভারতী সেনা বাহিনীর সাথে মিলে মুজাহিদীনের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের হুকুমও হিন্দু কাফেরদের মতই হবে। একে মুসলমানদের আপসে যুদ্ধ বলা যাবে না। বরং বলা হবে এক দিকে আহলে হক এবং অপর দিকে ইসলামের দুশমন; কাফের ও তাদের ভাই মুনাফিক; যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করছে। এ কথা আকলও মেনে নেয় না যে, মুসলমানদের মধ্যকার সব যুদ্ধকে ফেতনা বলা হবে এবং তলোয়ার ভেঙ্গে দিয়ে একাকিত্ব অবলম্বন করবে। যদি এমনই হতো, তাহলে ইহুদীরা এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ফায়দা উঠাতো। তারা মুসলমানদের মতো নাম রাখতো এবং গোটা ইসলামী বিশ্বের উপর হামলা করে বেছে বেছে মুসলমানদের হত্যা করতো। (নাউযুবিল্লাহ) মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করতো এবং এই হাদীসগুলো বড় বড় ব্যানারে লিখে সাথে নিয়ে চলতো। যদি কোনো মুসলমান তাদেরকে বাঁধা দিতো তাহলে তাকে এই হাদীস শুনাতো, ‘যখন মুসলমান পরস্পরে যুদ্ধ করে তখন কারো সঙ্গ দিতে নেই’। এভাবে নিজেরা তো মুসলমানদেরকে নিস্তনাবুদ করতো আর তাদের বিরোধীদের এই হাদীস শুনিয়ে বসিয়ে দিতো। বরং এই খেদমততো তাদের পক্ষ থেকে সরকারী উলামা মাশায়েখও আঞ্জাম দিতো।

হক-বাতিল কি স্পষ্ট নয়?

কিছু লোকের বক্তব্য হলো, কোনটা হক কোনটা বাতিল কিছুইতো বুঝে আসছে না। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলের অন্তরের গোপন কথা জানেন। আমাদের মতো গুনাহগার, যে বুকের ভেতর নেফাকী ভরপুর এক দিল নিয়ে ফিরছে সে-ও এই ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহ করবে না যে, এই যুদ্ধে আমেরিকা এবং তার নামধারী মুসলিম সাঙ্গপাঙ্গ মুসলমানদের কাছে কী চাচ্ছে? আগামীতে কী করবে? পাকিস্তানের ব্যাপারে তাদের কী চিন্তাধারা? এখানে কোন কোন শ্রেণির লোক এবং বুদ্ধিজীবিরা তাদের সাথে দাঁড়াবে? কারা ব্লাক ওয়াটারের কাতারে দাঁড়াবে এবং কারা পাকিস্তানপ্রেমি আর কারা ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য মাথার

ফসল কেটে রাখবে? করাচী, লাহোর, পেশওয়ার এবং কোয়েটায় মুসলমানদের মহল্লার উপর হামলা করতে আমেরিকার সাথে কে আসবে? কারা নিজের মুসলমান ভাই বোনদের জন্য গলিতে গলিতে রক্তে গোসল করতে, করাতে এবং তড়পাতে তড়পাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে? এই যুদ্ধ থেকে সুস্পষ্ট যুদ্ধ আর কবে হবে? যদি এই যুদ্ধেও সন্দেহ থাকে, তাহলে ইমাম মাহদীর সময় কী হবে? যখন সুফিয়ানী সেনাবাহিনী নিজিদেরকে মুসলমান দাবী করবে, এমনকি কোনো সময় তাদের নামে মসজিদে মসজিদে খুতবাও পড়া হবে। নিশ্চয় তাদের সাথে সরকারী উলামা মাশায়েখও হবে। যারা মাথায় কুরআন নিয়ে ফিরবে, সায়্যিদুনা ইমাম মাহদীকে সন্ত্রাসী, ফেতনাবাজ এবং আমীরুল মুমিনীনের বিদ্রোহী বলবে। আরো কতো কিছুই না তারা বলবে।

সকল ফেতনার সর্বোত্তম সমাধান

কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা বুঝে আসে; যে ধরনের ফেতনাই হোক না কেনো, সব ফেতনার সর্বোত্তম সমাধান আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করা। কেননা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; মুসলামানদের একটা দল হকের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল করবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আমার উম্মতের একটা দল হকের প্রতিরক্ষার জন্য কিতাল করতে থাকবে। যারা তাদের সাথে দুশমনি করবে তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। এপর্যন্ত যে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।

-সহীহ সনদে আবু দাউদ শরীফ।

সুতরাং যেমন ফেতনার যুগই হোক, তা থেকে বাঁচার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। এতে ফেতনা থেকে বাঁচার সাথে সাথে (আল্লাহর কাছে) মর্যাদাও বৃদ্ধি হবে। যেটি পাহাড়ে পালায়নকারী থেকে বেশি। এমনকি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিপদজনক ফেতনা, ফেতনায়ে দাজ্জালের সময়ও সেসব মুজাহিদীন সবচেয়ে উত্তম হবে, যারা কিতালের ময়দানে ব্যস্ত থাকবে।

জিহাদের হুকুম

এজন্যই বর্তমান যুগে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করা ঠিক তেমনি ফরজ, যেমন নামায। প্রত্যেককেই এই যুদ্ধে শরীক হতে হবে। চাই নিজে জিহাদে যাক অথবা মাল দিয়ে মুজাহিদীনকে সহযোগীতা করুক অথবা মানুষকে তাদের সহযোগীতার জন্য প্রস্তুত করুক। যে ঘরে বসে থাকবে, সে আল্লাহর কাছে কঠিন গুনাহগার হবে। এ ধরণের মানুষকে পাকিস্তানের আগামী প্রজন্মও ক্ষমা করবে না। কারণ, তারা আমেরিকাকে পাকিস্তানের উপর হামলা করতে দেখেও নিজের দীনের জন্য কিছুই করেনি। হাতে হাত বেঁধে এই অপেক্ষায় ছিলো যে, সরকারী মুফতী অথবা দরবারী উলামা মাশায়েখ জিহাদের ঘোষণা করবে, তারপর তারা গিয়ে জিহাদ করবে।

জিহাদ ছেড়ে অন্য কাজে মশগুল হওয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমি রহমতের রাসূল, আমি তুমুল লড়াইয়ের নবী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিহাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ক্ষেত-খামার দিয়ে পাঠাননি।

-আল হুকমুল জাদীরাতু বিল আযাআহ, ইবনে রজব হাম্বলী।

আর ইমাম বাগাভী রহ. তার মু'জাম গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হেদায়াত এবং দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে ক্ষেত-খামার দিয়েও পাঠাননি আবার ব্যবসায়ী কিংবা বাজারে আওয়াজদাতা হিসেবেও পাঠাননি। আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।

ইবনে রজব হাম্মলী রহ. বলেন, এজন্য আল্লাহ তা'আলা সেসব লোককে তিরস্কার করেছেন, যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে এবং দৌলত উপার্জনের লিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে কুরআনে এই আয়াত নাযিল হয়েছে, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।' এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা প্রথমে জিহাদে ছিলো এবং পরবর্তীতে যখন একটু সময় পেয়েছে তখন বলল, নিজের ক্ষেত-

খামারেরও কিছু দেখবাল করে নেই। এ ব্যাপারে সতর্কতা এলো যে, জিহাদ ছেড়ে দেয়া তোমাদের ধ্বংসের কারণ।

-আল হুকমুল জাদীরাতু বিল আযাআহ, ইবনে রজব হাম্বলী।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন তোমরা আয়না (এক ধরণের ব্যবসা) ব্যবসা করবে, গাভীর লেজের পিছনে লাগবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা আল্লাহ তা'আলা ততদিন পর্যন্ত দূর করবেন না, যতদিন তোমরা তোমাদের দীনে ফিরে আসবে।

-আবু দাউদ শরীফ।

ফায়দাঃ এর উদ্দেশ্য হলো, যখন তোমরা হারাম ব্যবসায় লিপ্ত হবে, জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন জিহাদ ছাড়ার কারণে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে এবং তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চেপে বসবে। আর এই লাঞ্ছনা ততদিন পর্যন্ত শেষ হবে না যতদিন পর্যন্ত পুনরায় জিহাদের ফিরে না আসবে।

প্রত্যেক যুগেই এমনটি দেখা যায় যে, কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে। কিন্তু যখনই মুসলমানরা জিহাদের ঝাণ্ডা উচু করে, তখনই আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে কাফেরদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়। ফলে যে কাফেররা কাল পর্যন্ত মুসলমানদেরকে পোকা-মাকড়ের মতো পিষে মারতো, নিজেদেরকে খোদা মনে করতো, জিহাদের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাদের অহংকারকে মাটিতে মিশিয়ে দেন। অপদস্ত এবং লাঞ্ছিত হয়ে নিজেদের শক্তির জানাযা উঠিয়ে নিয়ে যায়।

মাকহুল রহ. বলেন, (উমর রা. এর যুগে) মুসলমান যখন শামে আসে, তখন কিছু লোক তাদের সাথে 'আল হাওলা' চাষের ব্যাপারে আলোচনা করলো। সুতরাং তারা তা চাষ করলো। এই সংবাদ যখন উমর রা. এর নিকট গেলো, তখন তিনি একজন দূত পাঠালেন। দূত যখন শামে পৌছলো, তখন ফসল পেকে গিয়েছিলো। সেই দূত এসে সব ফসলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওমর রা. তাদের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের রিযিক বর্শার হুক এবং তার নীচের অংশে রেখেছেন।

-আল হুকমুল জাদীরাহ বিল আযাআতি ইবনে রজব হাম্বলী রহ.।

ইমাম বায়যাবী রহ. নিজের সনদে বর্ণনা করেন, ওমর রা. লিখে পাঠান- যে ক্ষেত-খামার করলো, গাভীর লেজের পিছনে ছুটলো, তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকলো এবং তাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো, আমি তার উপর কর ফিরিয়ে আনবো।

-আল হুকমুল জাদীরাহ বিল আযাআতি ইবনে রজব হাম্বলী রহ.।

কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য চাষাবাদ করছেন না কেনো? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা কিষাণ হয়ে দুনিয়াতে আসিনি। বরং আমরা এসেছি জিহাদের মাধ্যমে কাফের কৃষকদের হত্যা করে তাদের চাষাবাদ থেকে খাওয়ার জন্য।

-আল হুকমুল জাদীরাহ বিল আযাআতি ইবনে রজব হাম্বলী রহ.।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এসব হাদীস এবং বাণী বর্ণনা করার পর বলেন, মুমিনের পূর্ণ অবস্থা হলো, তার সকল ব্যস্ততাই হবে আল্লাহ আনুগত্য এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল হয়ে যাবে, তার রিযিকের যিম্মাদারী আল্লাহ তা'আলা নিয়ে নেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফিকিরকে নিজের চিন্তা চেতনা বানিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার সকল কাজ গড়বড় করে দিবেন এবং দারিদ্রতাকে তার চোখের সামনে এনে দিবেন। আর দুনিয়া তো তার ততটুকুই মিলবে, যতটুকু লেখা হয়েছে। আর যার নিয়ত আখেরাত হবে, তার সবকিছুই সহজ করে দিবেন। তার অন্তরে ধনাঢ্যতা সৃষ্টি করে দিবেন। দুনিয়া নিজেই তার নিকট চলে আসবে।

-মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ শরীফ।

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদীনের জন্য জিহাদ ছেড়ে ক্ষেত-খামার এবং ব্যবসা বাণিজ্যে মশগুল হওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে জিহাদ কমজোর হয়ে যাবে। বাকি থাকে রিযিকের প্রশ্ন। আল্লাহ তা'আলা এই জিহাদের মাধ্যমেই মুজাহিদীনের পবিত্র এবং হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। তেমনি ভাবে সাধারণ মুসলমানদেরও ক্ষেত-খামার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হয়ে জিহাদ থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। কারণ, জিহাদ

ছেড়ে দিলে সকল মুসলমানের ক্ষতি হবে। যেমনটি বর্তমানের অবস্থা। মুসলমানদের সকল আসবাব-পত্রের উপর ইহুদী এবং হিন্দুদের দখলদারিত্ব। সকল মুসলিম রাষ্ট্রে জনগণকে নিজেদের সূদী লেনদেনে ডুবিয়ে রেখেছে। মুসলমান দুনিয়ার পিছনে ছুটছে। কিন্তু দুনিয়া হাতে আসছে না। আগত প্রতিটি দিন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাষাবাদের নতুন নতুন পয়গাম নিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতা ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আমেরিকা এবং বিশ্ব সংস্থাগুলোর সাথে জিহাদ না করবে। তারা নিজেদের কথা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানতে বাধ্য করে। সুতরাং আমাদেরকেও জিহাদের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের দীন, আসবাব-পত্র এবং ইয্যতের প্রতিরক্ষা করতে হবে। আমরা জিহাদ করলে হিন্দু এবং ইহুদীদের সোনা-দানা এবং হীরা জহরতে সজ্জিত মহলগুলো আমাদের কদমে ঢেলে দিবে। তারপর আর কোনো রুই-কাতলা আমাদের আসবাব-পত্রগুলো লুটে পালাতে পাড়বে না। কোনো জর্জ সোরিসও হবে না, যে নিজের পয়সা বের করে নিয়ে যাবে এবং দু'দিনের মধ্যে মুসলিম দেশগুলোর জীবন ব্যবস্থা উলট-পলট করে দিবে। আপনি সেই অবস্থার কথা চিন্তা করুন; যখন বিশ্ব ব্যাংকার 'রক ফেলার্জ', 'রুথ শিলার্ড' ও জি.পি মরগানের মতো ইহুদীদের সমস্ত সম্পদ মুজাহিদীনের মালে গণীমত হবে। গোটা পৃথিবীর সোনা-দানা; যেগুলো এই সূদখোরেরা নিজেদের দখলে রেখেছে, সেগুলো সাধারণ মুসলমানের মধ্যে বিতরণ করা হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ ছেড়ে দিলে এমনি হতে থাকবে যে, সর্বোত্তম উম্মতের বাচ্চাদের মুখ থেকে লুকমা কেড়ে নিয়ে সূদখোরদের সূদ আদায় করতে থাকবে এবং সূদ আদায় করতে করতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। ব্যবসায়ী তার মেহনতের উপার্জন তাদেরকে দেয়, কৃষক রক্ত ঘাম ঝরায় কিন্তু নিজের বাচ্চাদের পেটও ভরাতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী ইতিহাস ও হক পথের মুসাফির

ইসলামী ইতিহাস ও হক পথের মুসাফির

যুদ্ধ রয়েছে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত,
মুহাম্মদী চেরাগের সাথে লাহাবী চক্রান্ত।

ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রান্ত, নিশ্চয় খুবই বিপদজনক ছিলো। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম তাদেরকে এক অংশও বরদাশত করতো না। খ্রিস্টানদেরকেই নেয়া যাক, সেন্ট পৌলের একটিমাত্র স্বপ্নই গোটা খ্রিস্টান জগতকে মূল থেকে উপড়ে ফেলেছিলো। অথচ ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত চক্রান্তসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ের ধ্বংসাত্মক এবং বিধ্বংসী ছিলো। ধাপে ধাপে, পূর্ণ গোপনীয়তার ভারী পর্দার আড়ালে, মিথ্যা ও চক্রান্তের জুব্বা পড়ে, চেহারায় নিস্পাপ হওয়ার কৃত্রিম ছাঁপ ফেলে, দীনে হানিফের অস্তিত্বের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ করে আসছে। তাদের বিস্তৃতি এবং গভীরতা এই বিষয়ের উপর লিখিত বড় বড় কিতাব থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের দুশমনরা বংশ পরম্পরায় চেষ্টা করে আসছে। নিজেদের শয়তানী মিশনের জন্য দিন-রাত এক করে ফেলেছে। কিন্তু তাদের যিন্দেগী গাদ্দারী, চক্রান্ত, চুক্তি ভঙ্গ এবং ধোঁকাবাজিতে ভরপুর। তাদের কুরবানী ইহুদী বিশ্বকে নিশ্চয় অনেক সফলতা এনে দিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্বের দূর্বলতা, চারিত্রিক অধঃপতন এবং শয়তানী মিশন তাদের ইতিহাসকে এতো কলুষিত করেছে যে, এর দূর্গন্ধে গোটা পৃথিবী তাদের ঘৃণা করছে। অথচ তাদের মুকাবেলায় মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামগণ চুক্তি-কৃতজ্ঞতা, আমানত-সত্যবাদিতা এবং মানবতার এমন ইতিহাস রচনা করে গেছেন যে, এর উপর শুধু মসলমানই নয় বরং গোটা মানবজাতি গর্ব করতে পারে। তাদের নেতৃত্বের সামর্থ, উন্নত চরিত্র, মানবতার সফলতা ও কামিয়াবীর মিশন তাদের জীবনকে এতো সুগন্ধীময় করেছে যে, অনুভূতিশীলরা আজও তা অনুভব করছে। যেখানেই সফলতা এবং ব্যর্থতা সেখানেই আল্লাহ ওয়ালাগণ শয়তানের বাহিনীর উপর বিজয়ী থাকেন। যদিও সাময়িক সফলতা শয়তানের বাহিনীর অর্জন হচ্ছে, কিন্তু তারা তাদের মূল টার্গেট অর্জনে

ব্যার্থ হবে। এই দীন আপন অবস্থায় বাকী থাকাটাই তা হক ও সত্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোনো নবী আসবে না তাই আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে আসল অবস্থার উপর বাকী রাখার ব্যবস্থা করেছেন। দুশমনী শক্তিসমূহের আক্রমণ থেকে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ফরজ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সময়ের সাথে সাথে এই দীনের উপর নিপতিত ধূলি-বালি পরিস্কার করে তার চেহারা চমকানোর জন্য ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক শতাব্দির শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ হবেন, যিনি এই দীনকে শিরক-বেদাত এবং কুপ্রথা-কুসংস্কার থেকে পবিত্র করে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, যার উপর নাবিয়ে আখিরুয যামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে গেছেন। এই দীনকে সেই আসল অবস্থার উপর বাকি রাখার জন্য প্রত্যেক যুগে এমন একটি জামাত বিদ্যমান থাকবে, যারা এই সত্যের জন্য নিজেদের জান কুরবানী দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। হককে বাঁচানোর জন্য তাদের জীবন দিতে হলে জীবন দিবে এবং জীবন দিয়ে মুসলমানদেরকে এই পয়গাম দিবে যে হক কী জিনিস?

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; আমার উম্মতের একটি জামাত হকের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। তারা কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। যখন ঈসা বিন মরিয়াম আ. আগমন করবেন, তখন মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন আমাদের নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা বিন মরিয়াম আ. বলবেন, না। তোমরাই একে অপরের ইমামতি কর। এই উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন।

-সহীহ মুসলিম শরীফ।

ইমরান বিন হাসীন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। যে তাদের বিরোধীতা করবে তারা তার উপর বিজয়ী হবে। এমনকি তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।

-আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকীম; তিনি বলেন এটি ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ, ইমাম যাহাবী রহ. তালখীসে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন শামবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের মধ্যে কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। তারা বিজয়ী থাকবে। তারা বিরোধীদেরও পরোয়া করবে না পক্ষপাতিত্বেরও পরোয়া করবে না। এমনকি তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকবে।

-কানযুল উম্মাল; হাদীস নং ৮৩২৩৩, ইবনে আসাকীর।

বিজয়ী থাকার উদ্দেশ্য

এই হাদীসগুলোতে কিয়ামত পর্যন্ত কিতালকারী দলের ব্যাপারে নবুয়াতী যবানে ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন, তারা বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। এই বিজয়ী থাকার উদ্দেশ্য কি প্রকাশ্যে বিজয়ী থাকা? নাকি কিতালের মধ্যে বিজয়ী থাকা? না অন্য কিছু?

এই বিজয়ী থাকার উদ্দেশ্য হলো, তারা যেই হকের জন্য কিতাল করবে, সেই হককে সর্বাবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা হবে। হতে পারে এতে তাদের প্রকাশ্য বিজয়ও মিলে যাবে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে কিতালের ময়দানে বিজয়ী না হতে পারে বরং সবাই শহীদ হয়ে যায় তাহলেও তারা তাদের দুশমনদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা যেই হকের জন্য দাঁড়িয়েছিলো তাকে হক প্রমাণিত করা হবে। তারা থাকা অবস্থায় তাদের দুশমন বাতিলকে হক হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে না। যেমন ভাবে অন্যান্য দীনের সাথে করা হয়েছে। এই পাগলের দল বাতিলের তুফানের সামনে সীনা টান করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তুফানের দিক পাল্টে দিবে। কখনো বেঁচেও যেতে পারে। তবে ডুবে গেলেও বাতিলের তুফানকে হক পর্যন্ত পৌছতে দিবে না। এধরণের পাগলদের ব্যাপারেই কবি বলেছেন,

তীরবাসীকে জিজ্ঞেস করো আমরা কিভাবে সাতার কাটছি
নিজেরা তো ডুবেগেছি কিন্তু তুফানের গতি পাল্টে দিয়েছি।

সুতরাং আপনি দেখে থাকবেন, এই পাগলগুলো ইসলামী ইতিহাসের দিগন্তে ঝলমলে নক্ষত্রের ন্যায় চমকাচ্ছে। এদিকে ডুবেগেলে ওদিকে বের হয়ে আসছে, ওদিকে ডুবেগেলে এদিকে বের হয়ে আসছে। আজও এই ধারা চলমান রয়েছে। এমনই পবিত্র আত্মার কারণে ইসলামী ইতিহাস রোশনি ছড়াচ্ছে, যারা কলিজার খুন ঢেলে এই বরকতময় বৃক্ষের প্রতিপালন করছে। মুসলিম সমাজে মন্দাচার থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আসল অবয়ব পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র। একের পর এক হামলা, অভ্যন্তরীন এবং বহিঃআক্রমণ, ইসলামের জুব্বা পরিহিত মুনাফিকদের মুনাফেকী সত্ত্বেও চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করছে।

বড়দের স্মরণ

বর্তমানে যখন দুঃসময়ের শীতলতা হাড় পর্যন্ত পৌছছে, মাসলাহাতের কেবল চাদরই নয়, কম্বল উড়ানো সত্ত্বেও দেহে কম্পন অনুভূত হচ্ছে, আগত সমীরণের প্রত্যেক ধমকা শিরা উপশিরায় বহমান খুনের প্রবাহকে ধীর করেদিচ্ছে, আশেপাশের মানুষ, পরিবেশ অপরিচিত লাগছে, কোনো মানুষজনের আওয়াজই শুনা যাচ্ছে না, কখনো নিজের আওয়াজ এলেও পরতে পরতে মাসলাহাতের চাদরে আবৃত থাকায় বিষয়বস্তু বুঝা মুশকিল হচ্ছে...... এমতাবস্থায় মন চাচ্ছে অন্তরগুলোকে বড়দের স্মরণের মাধ্যমে উত্তপ্ত করি। অতীতের স্বল্প স্মরণে আল্লাহ না করুন আবার যেনো উত্তপ্ত করতে গিয়ে জমে না যায়। আজ সেসব পবিত্র আত্মার আলোচনা হয়ে যাক, যারা আঁধার রাতে নিজেদের চাহিদা, আশা, আকাঙ্খা এবং স্বপ্নের মশাল জ্বালিয়ে কাফেলায়ে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ প্রদর্শন করছে। আঁধার ঘোরতর হচ্ছে, মশাল টিম টিম করে জ্বলছে, তারা নিজের খুন তাতে ঢালতে শুরু করেছেন। তার আলোকে নিবে যেতে দেননি। ফোটা ফোটা খুন তাতে নিংড়িয়ে দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কলিজার খুনটুকুনও সেই মশালে কুরবান করে গিয়েছেন। সেসব অমর ব্যক্তিত্বের স্মরণ করবো, যাদের আলোচনা দীলওয়ালাদের দুনিয়ায় উদ্যমতা সৃষ্টি

করে। হতে পারে আজ পুণরায় তাদের আলোকিত ইতিহাস পড়ে সেই পুখতা এরাদার পথে কদম রাখবে। যেসব লোক ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি, ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন, তাদের মনে পড়ে যাবে বড়রা কিভাবে যিন্দেগী যাপন করেছেন। বাতিলের সাথে কেমন আচরণ করেছেন। এই আলোচনা তাদের জন্যও যারা এই পুখতা এরাদার পথে পা রেখেছেন, কিন্তু পিছনে ফিরে দেখছেন গোটা উম্মত একদিকে দাঁড়ানো আর আপনি অন্য দিকে। তাদের অন্তর শক্তিশালী হবে। হক পথের মুসাফিরদের জানা হবে, পুখতা এরাদার পথের পথিকদের ইতিহাস কেমন উজ্জ্বল, ঘোর আঁধারও আলোকিত হওয়ার জন্য তাদের থেকে আলো ধার নিতে চায়। গোলামদের জন্য আযাদীর সবক এই মকতবেই পাওয়া যায়। আর আযাদীপ্রিয়দের মাথা না ঝুকানোর দিল এসব পবিত্র আত্মা থেকেই মিলে। এসব বুযুর্গ অমর ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজেযার অন্তর্ভূক্ত। যারা একেক সময় একা-ই দুনিয়ার তামাম শয়তানী শক্তির মুকাবেলা করেছেন। দীনে হানিফকে এমন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে অবস্থায় নবীয়ে আখিরুয যামান আপন উম্মতকে রেখে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতিগণ বাতিলের সামনে মাথা না ঝুকানোর এমন কিছু নিয়ম নীতি রেখে গেছেন, রাসূলের প্রেমিকরা কখনো এই ব্যাপারে আকল ও যুক্তির কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করবে না। যার ফলে কাউকে শুধু একটি ফেকহী মাসআলার জন্য চাবুকের প্রহারের নীচে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বর্তমানের প্রশাসকদের বিরুদ্ধে দন্ডায়মানদের সহযোগীতা করে জেল-জুলুমের নির্যাতনকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন এবং বন্দীদশায় থেকেই জান্নাতের নাজ নেয়ামতের দিকে উড়ে গেছেন। কাউকে উম্মতের আকীদার হেফাজতের জন্য গায়ের চামড়া তোলা হয়েছে। কেউ কেউ খিঞ্জিরের ঠোটের দিকে নাচতে নাচতে উপরের দিকে উড়ে গেছেন। কেউ অঙ্গার হয়েছেন, কেউ উত্তপ্ত শলায় বিদ্ধ হয়েছেন, কেউ লোহা এবং তামার খোলে জীবিত সেলাই হয়েছেন। কেউ শহর ছেড়ে পাহাড়, নদী নালা এবং মরুভূমিকে নিজের খুনে রঙ্গীন করেছেন। এক শায়খ নিজের সকল মুরীদ এবং সবকিছু নিয়ে দুনিয়ার সেই শক্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন, যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। মুরীদগণও

কেমন? যাদের ছাড়া এই উপমহাদেশ এলেমের ক্ষেত্রে এতিম থেকে যেতো। মাদরাসা এবং খানকা থেকে উঠে ময়দানে জিহাদে বের হয়ে আকস্মিক গর্জে উঠেন। আকাশের বাতাস বন্ধ হয়ে আসে। বিশ্ব স্থির হয়ে যায়। যদি এই বাহিনী শহীদ হয়ে যায়, তাহলে এই উপমহাদেশে কারা দীন শিখাবে? তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ এবং ফতোয়া কে শিখাবে? কেউ একজন মেহমানের জন্য মুকুট, রাজত্ব, বাদশাহীকে লাথি মেরে প্রাণহীন পাহাড়ের অবলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ রাজপুতের যিন্দেগী ছেড়ে দারিদ্রতা বেছে নিয়েছেন। এসব পবিত্র আত্মার দল এবং কারবালার ময়দানের দল পৃথক। কিন্তু একটি ব্যাপারে তারা এক। আর তা হলো, হক বলতে এবং হকের উপর আমল করতে কারো ভয়ের পরোয়া না করা। বতিলকে বাতিল বলতে কোনো মাসলাহাতকে কাছে ভীড়তে না দেয়া। নিজের চাওয়া পাওয়া চাই দীনী হোক অথবা দুনিয়াবী হোক, তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি যখন সারা রাত হাদীস পড়ানোতে থাকতো, তখন চোখ বন্ধ করা ছাড়া ক্বালাল্লাহু এবং ক্বালাররাসূল বলে ইবলিস ও শয়তানের অন্তরে আঘাত করতে থাকতো। যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি পড়ানো ছেড়ে জেল জুলুমের কষ্ট সহ্য করার মধ্যে, বিষ পান করার মধ্যে অথবা ঘরের দরজায় চুমা দেয়ার মধ্যে তখন আগে বেড়ে সেই সন্তুষ্টি অর্জনে লিপ্ত হতেন। ফেকাহ পড়াতে থাকেন, কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে থাকেন, কিন্তু এই ফেকাহকে কেবল কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং দেহের চামড়া বিসর্জনের বিনিময়ে সেসব মাসায়েলের উপর আমল করার পদ্ধতি নিজের অনুসারীদের বুঝিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন, আল্লাহর বান্দাগণ আসা যাওয়া করতো। বিরান অন্তরসমূহে আল্লাহ যিকির দ্বারা আবাদ করতেন। অন্তরের কুঠরীগুলোতে লুকিয়ে থাকা দুনিয়ার মহব্বত এভাবে আচড়ে বের করতেন যে, বান্দা আখেরাতের চিন্তার মধ্যেই ডুবে থাকতো। বক্ষসমূহকে গায়রুল্লার মহব্বত থেকে পবিত্র করে তাতে তাওহীদের আমানত ভরে দিতেন। যার ফলে বান্দা কেবল তার প্রতিপালকের জন্যই হতে থাকে। মহব্বতের সাগরে মাহবুবে হাকিকীর (আল্লাহ তা'আলা) সাক্ষাৎ লাভের আশা এমন ভাবে উছলাতে থাকে যে, মিলনের আকাঙ্খায় প্রিয়ের

দুশমনদের কাতার ভাঙ্গতেই থাকে। সেসব খানকাগুলোতে বসবাসকারীদের বীরত্ব এবং বাহাদুরী এমন পর্যায়ের হতো, সমকালিন প্রশাসকগণ অনুগত হয়ে যেতো। প্রশাসকদেরকে কল্যাণের আদেশ এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে কখনো মাসলাহাতকে হেকমতের চাদর হিসেবে ব্যবহার করতেন না। বরং অমুখাপেক্ষী ভঙ্গিতে হক কথা বলে যেতেন।

এখানে তুফান থেমে যায়, পর্বত দেবে যায়
ফকীরি কুঠিরের সামনে শাহী বালাখানা ঝুকে যায়।

পুখতা এরাদার পথিকের আলোচনা এখানে এজন্যও উপযোগী যে, ইমাম মাহদীর বন্ধু সেসব সাহসী নওজোয়ানই হতে পারবে, যারা পুখতা এরাদার কাটাঘেরা ও বরফের রাস্তার পথিক হবে। দীনে হকের জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চলে হলেও দীনের হক আদায় করবে। ইমাম মাহদীকে পাওয়ার জন্য এবং কাফেলায়ে হকের সাথে শামিল হওয়ার আকাঙ্খায় অজানা খুনের দরিয়া এবং অশ্রুর সমূদ্র পাড়ি দিবে।

বড়দের ইতিহাস পড়ুন এবং আপনার বর্তমান যামানার প্রতি লক্ষ্য করুন। ফেতনা, চক্রান্ত এবং দুশমনদের আক্রমণের কঠোরতা দেখুন। বড় বড় স্তম্ব ভিত্তিসহ উড়ে যায়। সাধারণ মশালের কী অবস্থা? এবারের তুফানে আলোর সুউচ্চ মিনারকেও বয়োবৃদ্ধ টিমটিম চেরাগের মতো মনে হচ্ছে। অনাড়ি অনভিজ্ঞ মাঝির কথা কী বলব? বিশ্ব ভ্রমনকারী, দুনিয়া জুড়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাঝিও দাঁড়-বৈঠা ছেড়ে তুফান থামার অপেক্ষা করছে। এমন সময় কিছু পাগল আছে, যারা পণ করেছে; এই তুফানের বুকের উপর সওয়ার হয়ে মনযিলে পৌছে যাবে। যারা এই কথাকে রপ্ত করেছে, নবুওয়াতের মশাল পর্যন্ত কোনো অবাধ্য তুফানকে পৌছতে দিবে না। তাদের অন্তরে এই এরাদা বসিয়ে নিয়েছে; বাতিলের উছলে উঠা তুফানের সাথে লড়ে গতি পরিবর্তন করে দিবে, যদিও নিজেরা ডুবে যায়। আহলে হকের কাফেলার এই আল্লাহওয়ালাগণ ইসলামের মশালের হেফাজতের জন্য রাতভর তার আলোকে তাদের আহ! এবং ডুকরে উঠা কান্না দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করছেন। আঁধার যখন বাড়তে থাকে, অন্ধকার যখন গাড় হতে থাকে তখন তারা তাদের চাওয়া-পাওয়া তাতে বিসর্জন দিয়ে

তার আলো বাড়াতে থাকেন। আজ উম্মতের অভিধানে আত্মমর্যদাবোধ, লজ্জা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা, অন্যের হককে প্রাধান্য দেয়া এবং ত্যাগ, শব্দগুলো তাদের কারণেই বাকি আছে। এসবকিছু অল্প বয়সের, নাকি যৌবন কালের, নাকি পরন্ত যৌবনের? কার জন্য? সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড থেকে এসেছেন। না তাদের এলাকা এক, না ভাষা। শুধুই আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য। এই উম্মতের মৃয়মান সম্মানকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। ইসলামের দুশমনদের থেকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য। এজন্য আমাদের ভাবতে হবে, তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? আমাদের ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে আছি নাকি তাদের দুশমনের সাথে? তাদেরকে খুশী করেছি নাকি তাদেরকে যখমী-ই করছি? আমাদের উচিত অতীত হয়ে যাওয়া পবিত্র আত্মাগুলোর ন্যায় অন্তরে তাদের সম্মান জন্মানো। আঁধারের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের কাছে আলো ধার চাওয়া। সাহস যখন দেয়া হয়েছে, তখন তাদের থেকে দিল ধার নেয়া। অসওয়াসা, সন্দেহ, ধারণা এবং অবিশ্বাস এসে বেষ্টন করেছে? তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস, দৃশ্যমান ঈমান অর্জন করে নাও। যদি শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে, পণ শেষ হয়ে থাকে, তাহলে সেসব সীনার সাথে সীনা মিলিয়ে নাও, যাতে দৃঢ় পণ, বিরামহীন ত্যাগ, গর্জন ও চমকানো বিজলী ভরা রয়েছে।

হাসান বসরী রহ. : সত্যবাদিতা এবং বিদ্রোহী

এসো সত্যবাদী বিদ্রোহী নওজোয়ান
আল্লাহর সিংহরা মাথা নাহি নোয়ান।

হাসান বসরী রহ. ২১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রা. এর বাদি। সুতরাং যখনই তাঁর আম্মা কোনো কাজে ঘরের বাহিরে যেতেন উম্মুল মুমিনীন তাঁকে কোলে নিয়ে দোলাতেন। নিজের স্তনও পান করাতেন। কখনো কখনো এমনও হতো; তিনি তাঁকে বাহিরে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে কোলে নিতেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করতেন।

একবার উম্মে সালমা রা. তাঁকে ওমর রা. এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ওমর রা. তাঁকে কোলে নিয়ে এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! তাঁকে দীনের গভীর বুঝ দান কর এবং মানুষের কাছে প্রিয় কর।

-সিয়ারে আ'লামুন নুবালা ৪/৫৬৫।

আল্লাহ তা'আলা হাসান বসরী রহ.কে ইলমের খাযানা, স্পষ্টভাষী, বাগ্মিতা, সত্যবাদিতা, বিদ্রোহী এবং দীনের সঠিক বুঝ দান করেছিলেন। এটি সাহাবায়ে কেরামের দু'আ এবং উম্মুল মুমিনীন রা. এর লালন পালনের বরকত ছিলো। তিনি সমাজে জন্ম নেয়া মন্দাচারী অনুভব করলেন। নেফাক; যা মুসলিম সমাজকে ঘুণের ন্যায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করলেন। তিনি নিজের ওয়াজের মাধ্যমে মুনাফিকদের উপর অবিরত আক্রমণ করতে এবং সত্য বলতে কোনো ভয় ভীতিকে আমলে নিতেন না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো নির্দয় লোকের সামনে কোনো প্রকার ভয় ভীতি ছাড়া সত্য কথা বলতেন। একবার তিনি বলেন, এই উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার শান কেমন, কিভাবে একজন মুনাফিক তাদের উপর এসে গেলো? সে একজন বড় মাপের স্বার্থপর। তৎকালিন মানুষজনের অবস্থা এবং সাহাবায়ে কেরামের রা. আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, হায় আফসোস! মানব জাতিকে আশা-আকাঙ্খা এবং ব্যক্তিস্বার্থ ধ্বংস করেছে। কথায় রয়েছে, কাজের কোনো নাম গন্ধও নেই। ইলম আছে, কিন্তু তার বাস্তবায়নে ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু একীন থেকে বিলকুল খালি। মানুষ অনেক আছে, কিন্তু মানবতা নেই। আগমন এবং প্রস্তানকারীদের আওয়াজ খুব শোনা যায়, কিন্তু আল্লাহর এমন একজন বান্দা চোখে পড়ে না, যার সাথে দিল লাগানো যেতে পারে। মানুষ প্রবেশ করলো এবং বের হয়ে গেলো। তারা সবকিছু জানলো কিন্তু তারপরও ধোঁকা খেলো। তারা প্রথমে হারাম করলো, তারপর তাকেই হালাল করে নিলো। তোমাদের দীন কী? কেবলই যবানের ফুটানী। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কি কিয়ামতের হিসাব নিকাশকে বিশ্বাস কর? তাহলে উত্তর আসে হ্যাঁ হ্যাঁ।

যামানা আজ আরো একজন হাসান বসরীর অপেক্ষায়। যিনি মুনাফিক এবং তাদের ভিতরে লুকায়িত নেফাকীর খবর নিতে পারবেন। হেরেম

শরীফে তওয়াফ করে। বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে। সাচ্চা পাক্কা মুসলমান হওয়ার দাবী করে। কিন্তু নেফাকে ভরপুর অন্তরসমূহকে কেউ বলতে পারবে, হে মুনাফিকের দল! তোমাদের নেফাক তোমাদের আমলের উপর বিজয়ী। যদিও তোমরা সারা জীবন বায়তুল্লাহর গিলাফের সাথে লেপটে থাকো। তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ছেড়ে তাদের দুশমনদের সাহায্য করছো।

ইমাম আবু হানিফা রহ.

(৮০-১৫০হিজরী/৬৯৯-৭৬৭ঈসায়ী)

তোমরা কে? অথচ তারা ছিলো পিতা তোমাদের,
হাতে হাত রেখে অপেক্ষমান কিয়ামতের?

ইমাম আবু হানিফা রহ. ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাত লাভের মর্যাদা দান করেন। তাঁদের মধ্যে আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন আবি আউফা, সাহল বিন সাআদ আস সা-ঈদি, আবু তোফাইল এবং আমের বিন ওয়ায়েলাহ রা.ও ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর একটি কবিতা-

আবারো আলোচনা কর নু'মানের
তার আলোচনা মেশক আমাদের,
মেশকে আম্বর যতবার নাড়বে
ততো বেশি ঘ্রাণ ছড়াবে।

ইলমী মর্যাদাঃ

সুফিয়ান ছাওরী রহ. এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এর বাণী, আবু হানিফা তার যুগে গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফেকাহবিদ ছিলেন।

হাফেজ যাহাবী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. গুণকীর্তন করতে গিয়ে লেখেন, যতদূর ফেকাহ, সমসাময়িক সিদ্ধান্ত এবং তার সূক্ষ্মতার সম্পর্ক রয়েছে, তা তার পর্যন্তই শেষ হয়েছে। আর মানুষ এ ব্যাপারে তার পরিবারভূক্ত।

তিনি আরো লেখেন, হাফস বিন গিয়াস বলেন, আবু হানিফার কথা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম। জাহেল ছাড়া কেউ তাতে ভুল ধরতে পারে না।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা।

জারীর রহ. বলেন, আমাকে মুগীরা বলেছেন, আবু হানিফার মজলিসে বসো ফকীহ হয়ে যাবে। যদি ইবরাহীম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও তার মজলিসে বসতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা।

তাকওয়াঃ-

বর্ণিত আছে, তিনি সাত হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার অজু দিয়ে ফজর নামাজ পড়েছেন। খতীবে বাগদাদী রহ. নিজের সনদে বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব রহ. রাতে নফল পড়তেন। প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি এতো কান্না করতেন যে, তার উপর প্রতিবেশীদের দয়া হতো। তার মৃত্যু এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে তিনি সত্তর হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। জানাযাতে এতো ভীড় হয়েছিলো যে, ছয় বার জানাযা পড়া হয়েছিলো।

-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

হাফেজ যাহাবী রহ. সাক্ষি দেন, তিনি দয়ালু দানশীল, পবিত্র আল্লাহওয়ালা, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক তেলাওয়াত এবং কিয়ামুল লাইলে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

-তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী ৯/৩০৬।

সবশেষে ইমাম যাহাবী রহ. লেখেন, আবু হানিফা রা. এর অবস্থা এবং মর্যাদা এই ইতিহাস বহন করতে অক্ষম।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইলমী অবস্থান, তাকওয়া পরহেযগারী, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার উপমা তিনি নিজেই। এই ঘটনা থেকে তাঁর সতর্কতার অনুমান করা যায়,

একবার কুফাতে এক মহিলার বকরী গুম হয়ে যায়। এর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই তিনি ততদিন পর্যন্ত বকরীর গোশত খাননি যতদিন এই বকরীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি যে, বকরী মারা

গেছে। তাঁর আশঙ্কায় ছিলো, হতে পারে কেউ এই বকরি জবাই করে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। চিন্তা করুন! কোনো মানুষ কেবল সন্দেহ বশত কতো দিন গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে? এক সপ্তাহ, এক মাস, বেশি থেকে বেশি কয়েক মাস? তিনি সাত বছর পর্যন্ত বকরীর গোশত খাননি। সাত বছর পর যখন জানতে পারলেন ওই বকরী মরে গেছে, তখন তিনি গোশত খেতে শুরু করলেন। একদিকে তাঁর ইলমী খেদমত, অপরদিকে সত্যবাদি, অমুখাপেক্ষী, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেদ, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ এবং শাসকগোষ্ঠির সাথে কী ভূমিকাই না রেখেছেন। খলিফা আবু জাফর মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারক নিয়োগ দিতে বারং বার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। তার উপহারও তিনি কবুল করতেন না।

কারাগারে ইমামে আজম রহ. এর উপর নির্যাতন

একদিন মানসুর কসম করে বলল, আপনাকে আমার প্রস্তাব কবুল করতেই হবে। তার জবাবে তিনিও কসম করে বললেন, আমি প্রস্তাব কবুল করবো না। মানসুরের দারোগা বলল, দেখুন! আমীরুল মুমিনীন কসম করেছেন, আপনিও কসম করছেন। তিনি জবাব দিলেন, আমীরুল মুমিনীন নিজের কসমের কাফফারা আদায় করতে আমার চেয়ে অধিক সক্ষম।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয যাহাবী।

সুতরাং মানসুর কারাগারে বন্দী করার আদেশ করলো। অবশেষে জেল থেকে জানাযা বের হয়। মানসুর ইমামে আজম রহ.কে তার পুলিশ অফিসার হামিদ ত্বোছির হাওয়ালা করে দেয়। হামিদ ত্বোছি বলেন, আমিরুল মুমিনীন যে ব্যক্তিকেই আমার হাওয়ালা করে দেন, আমাকে বলেন আমি যেন তাকে কতল করে ফেলি অথবা হাত-পা কেটে দেই অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করি।

ইমামে আজম রহ. খুবই প্রশান্ত অবস্থায় জবাব দিলেন, তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেল।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয যাহাবী।

ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ সমীরি রহ. বলেন, ইমাম সাহেব রহ.কে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হয় এবং তিনি কারাগারেই ইন্তিকাল করেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা লিয যাহাবী।

হিশাম বিন আব্দুল মালেক এর শাসনামলে খান্দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেরাগ সায়্যিদুনা হুসাইন রা. এর পুতি, যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. হিশামের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উচু করেন। ইমাম সাহেব রহ. এর সাহসিকতা এবং বাহাদুরী দেখুন, প্রকাশ্যে তিনি যায়েদ রহ. এর রক্ষনাবেক্ষন করেন। তিনি তার খেদমতে দশ হাজার দেরহাম পাঠান এবং উপস্থিত হতে না পেরে ওজর পেশ করেন। তারপর হাসান রা. এর বংশদর থেকে মুহাম্মাদ যুন নাফস যাকিয়্যাহ রহ. মদীনা মুনাওয়ারায় এবং তার ভাই ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ কুফায় মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা বুলন্দ করেন। ইমাম মালেক রহ. মদীনা মুনাওয়ারাতে মুহাম্মাদ যুন নাফস যাকিয়্যাহকে এবং আবু হানিফা রহ. কুফাতে ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহর সহযোগীতা করেন। তিনি কিছু টাকা-পয়সাও তার খেদমতে পাঠান। তিনি মনসুরের সেনা অফিসার হাসান বিন কহতবাকে ইবরাহিম রহ. এর মুকাবেলা করা থেকে বিরত রাখেন। যারফলে সে খলিফার কাছে ওজর পেশ করে। মানসুর ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধ নেয়, তা মূলত এই কারণেই। সে প্রধান বিচারকের পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকে উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে বাহানা বানায়। কারাগারে তাঁকে কঠোর নির্যাতন করা হয়। তারপর বিষ দেয়া হয় এবং কারাগার থেকে জানাযা বের হয়।

ইমাম সাহেব রহ. এর জানাযা জেল থেকে বের হয়েছে

বলা খুবই সহজ। কিন্তু একটু চিন্তা করুন, ইমামে আ'জম রহ. এর জানাযা কারাগার থেকে বের হয়েছে। হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন, তিনি শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করেছেন। যার ব্যাপারে আলী বিন আছেম রহ. বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইলম ওজন করা হয়, তাহলে তার যামানার সকলের ইলমের চেয়ে বেশি হবে।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৪০৩।

এই সেই আবু হানিফা রহ. আমরা যার নাম নেই। আমরা যার তাকলীদ করার দাবি করি। যার মর্যাদা, বড়ত্ব আর মাসায়েল পড়তে এবং পড়াতেই আমাদের যিন্দেগী শেষ হয়ে যায়। হায় আফসোস! যদি কখনো ভাবতেন তিনি কী ছিলেন? কী দরদ ছিলো তাঁর দীনের প্রতি? কতো ব্যাথা ছিলো দীনের জন্য? বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুরীদানের বেষ্টনীতে থাকার পরিবর্তে কারাগারের একাকিত্বকেই বেছে নিলেন। তিনি কেমন ফেকাহ পড়েছিলেন, কোনো ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) অথবা কোনো ফেকহী শাখার (জুযের) বাহানা করেননি। শেষ বয়সে শাগরীদের সভায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে যিন্দানখানার চুল্লীর দিকেই ঝুকে গেলেন। দরসের মসনদের গুরুত্বও 'মাসলাহাত আর হেকমতের' জুব্বা হয়ে সামনে এসেছিলো, এ কথা বুঝানোর চেষ্টাও করা হয়েছিলো যে, বর্তমান খলীফার (মানসুর) বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কিভাবে জায়েয বলেন? এটা তো মুসলমানদের আপসে লড়াই। আপনি ফেকাহ পড়াতে থাকুন। চুপ থাকুন। (প্রধান কাজী হওয়ার) প্রস্তাব কবুল করলে কী সমস্যা? এটাও তো ইসলামী খেলাফতের কাজীর প্রস্তাব। কিন্তু সাবেতের (নুমান বিন সাবেত) বেটার কদম সাবেতই থাকলো। একবার যার জবাব 'না' এসেছে সুতরাং ব্যস। জান গেলেও সেই 'না'কে 'হ্যাঁ'তে রুপান্তরিত করা যাবে না। এ কথা চিন্তার বিষয় যে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন যুগে ছিলো, যা সর্বোত্তম তিন যুগের মধ্যে ধরা হতো। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। চারদিকেই ইসলামের জয়গান। ইসলামের বিধি বিধান কার্যকর হচ্ছে। মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রুর উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো ভয় নেই। খলীফাও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী থেকে কোটি গুণ ভালো। সে না নামায পড়াকে বাতিল করেছে, না জিহাদকে। কল্পনা করুন, ইমাম সাহেব যদি জানতে পারেন, তার ভক্তরা কাফেরদের গোলামী করছে, তাঁর ফেকাহ থেকে ইহুদী, নাসারা এবং হিন্দুদের আনুগত্যকে জায়েয ফতোয়া দেয়া হচ্ছে, এর উপর আবার গর্ববোধও করছে যে, সে দীনের বড় খেদমত করছে। কিয়ামতের দিন যদি তিনি আমাদের আঁচল ধরে ফেলেন, তাহলে কী জবাব দিবো? যেই ইমামের দৃষ্টিতে সোনালী তিন যুগের শাসকগোষ্ঠী বাতিল, তাদের বিরুদ্ধে

জিহাদকারীদের সরাসরি সঙ্গ দিয়েছেন, যদি তিনি জানতে পারেন তার অনুসারীরা হিন্দুস্তানে হিন্দুদের গোলামীতে সন্তুষ্ট, তাঁর অনুসারীরা (দারুল হারব) আমেরিকা-বৃটেনে বসবাস করছে, তারা জিহাদ করছে না, তাগুতদেরকে নিজেদের আমীর বলে স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নাজায়েয বলছে, আল্লাহর দুশমনদের সাহায্যকারীদের হক প্রমাণিত করতে ইমাম সাহেবের ফেকাহ্ থেকে দলীল পেশ করছে, তাহলে কী জবাব দিবো?

হে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী! আপনি কি কখনো ভেবেছেন, কিয়ামতের দিন এই পবিত্র আত্মার মুখোমুখি কিভাবে হবেন? আমেরিকার আনুগত্যের উপর সন্তুষ্ট থেকে, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনদের সারিতে দাঁড়িয়ে, তাভীলের (ব্যাখ্যা) বাহানা দিয়ে এমন ব্যক্তিত্বের সাথে বহস করা যাবে, যার ফেকহী সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা দুনিয়া জুড়ে খ্যাত? আবারো পড়ুন। দীলের চোখ খুলে পড়ুন। ইমামে আজম রহ. এর জানাযা জেল থেকে বের হয়েছে। চাবুকের আঘাত খেয়েছেন, তিলে তিলে কঠিনতম শাস্তি সহ্য করে মাহবুবে হাকিকীর (আল্লাহর) সাথে মিলেছেন। আসমান ও যমীনের প্রশস্ততা বরাবর রহমত বর্ষিত হোক নু'মান বিন সাবেত; আবু হানিফা রহ. এর উপর। যিনি নিজের জীবন কুরবান করে শরীয়তের আব্রু হেফাজত করেছেন। আমীন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.

তোমাদের প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা পাই হিম্মত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ১৬৪ হিজরী মুতাবেক ৭৮০ ঈসায়ী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। যারফলে তাঁর আম্মা সর্বাত্মক সাহসিকতা এবং হিম্মতের সাথে তাঁকে লালন করেন। শিশুকালেই কুরআন হিফজ করেন। তিনি দীনি ইলমের মধ্যে হাদীসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর দশ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলো। ফেকাহ শাস্ত্রে

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এতো উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে তাঁর ফেকাহ বিদ্যমান। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর 'মুসনাদে আহমদ' বড় কৃতিত্ব।

ইমাম শাফেয়ী রহ. (১৫০-২০৪ হিজরী/৭৬৭-৮২০ ঈসায়ী) বলেন, আমি এমন অবস্থায় বাগদাদ ছেড়েছি, যখন সেখানে আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে বড় কোনো মুত্তাকীও নেই, কোনো ফকীহও নেই।

মসনদে হাদীসে বসলে হাদীসের তালেবানরা পতঙ্গের ন্যায় তার চারপাশে জমা হতো। তাঁর একেকটি দরসে পাঁচ পাঁচ হাজার করে শ্রোতা থাকতো। আত্মসম্মানবোধে তার উপমা তিনি নিজেই। তিনি কখনো তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর কোনো হাদিয়া গ্রহণ করেননি। তাঁর নম্রতা এবং ভদ্রতা এতো বেশি ছিলো যে, ইয়াহইয়া বিন মুঈন (১৫৮-২৩৩ হিজরী/৭৭৫-৮৪৮ ঈসায়ী) এর মতো ইমাম সাক্ষি দেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের মতো লোক দেখিনি। আমি তাঁর সাথে ৫০ বছর ছিলাম। তিনি কখনো আমাদের সামনে নিজের যোগ্যতা এবং সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করেননি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং খলকে কুরআনের ফেতনা

খলীফা মামুনুর রশীদ (১৯৮-২১৮ হিজরী/৮১৩-৮৩৩ ঈসায়ী) ইউনানী দর্শন এবং যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তার শাসনামলে মু'তাযেলা ফেরকা খুব শক্তিশালী হয়। তাদেরকে সে সময়ের আলোকিত বুদ্ধিজীবি মনে করা হতো। তারা প্রত্যেক বিষয়কে আকল দ্বারা পরখ করায় অভ্যস্ত ছিলো। (মনে রাখা উচিত, বর্তমানের মডার্ণ ইসলামের ঝান্ডাবাহী মুবাল্লিগগণ, চকচকে এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ এ যুগের মু'তাযেলা। তারা প্রতিষ্ঠিত দীনকে আকল দ্বারা পরখ করার পর মেনে নেন। যদি কোনো হাদীস অথবা কোনো হুকুম তাদের ক্ষুদ্র আকলে না বুঝে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।)

মু'তাযেলারা নতুন নতুন ইখতেলাফের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যকে টুকরো টুকরো করেছে। ইসলামের দুশমন শক্তিগুলো সাধারণ বিষয়কে জনসাধারণের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করে, যেন এটাই

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা ইলমী এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্যবিষয়কে কুফর ও ঈমানের বিষয়বস্তুতে রুপান্তরিত করে। আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বা এবং গুণাবলীর ব্যাপারে মানুষের অন্তরে এমন এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, সাধারণ মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। এমনি ভাবে তারা একটা বিষয় উপস্থাপন করে, কুরআন মাখলুক, নাকি মাখলুক নয়? মু'তাযেলারা কুরআন মাখলুক হওয়ার কথা বলে। তৎকালিন হুকুমত তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলো। আর তাদের মুকাবেলায় ছিলেন মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের বিশাল দল। যারা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধারক বাহক। আহলে সুন্নাত 'কুরআন' মাখলুক না হওয়ার পক্ষে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম হওয়ার পক্ষে ছিলেন। চক্রান্তের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের অন্তর থেকে কুরআনের বড়ত্ব, গুরুত্ব এবং মর্যাদা বের করে দেয়া। যাতে উম্মত হেদায়াতের মূল ঝর্ণা থেকেই দূরে হটে যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর দূরদৃষ্টি এই ফেতনার দূরাগত প্রভাব দেখছিলো। সুতরাং হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য, সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরন করে ইমাম সাহেব রহ. সবকিছু কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

মামুন খলকে কুরআনের মাসআলাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। ২১৮ হিজরীতে বাগদাদের গভর্নর ইসহাক বিন ইবরাহীমের নামে বিস্তারিত এক ফরমান পাঠায়। যাতে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কঠোর সমালোচনা এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। তাঁদেরকে খলকে কুরআনের আকীদায় ইখতেলাফ করার কারণে তাওহীদে ক্রুটি, সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, ফাসাদপ্রিয় ইত্যাদি আখ্যায়িত করা হয়। (বর্তমানেও মু'তাযেলা নামক বাতিলদের সামনে মাথা না নুয়ানে ওয়ালাদেরকে ফেতনাবাজ, সন্ত্রাসী বলা হয়।) হাকিমকে হুকুম করা হলো, যেসব লোক এই মাসআলার পক্ষে না আসবে, তাদেরকে তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করে দাও। তারপর মামুন আরো কঠোরতা করলো। সরকারী কর্মকর্তা এবং আলেমগণের জন্যও এই ব্যাপারে মু'তাযেলাদের রক্ষনাবেক্ষন করা বাধ্যতামূলক করে দিলো। ইসহাক বড় বড় আলেমদের একত্রিত করলো এবং তাদের সাথে এ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করলো। তারপর এই আলোচনা লিখে মামুনের নিকট

পাঠিয়ে দেয়। মামুন সবকিছু পড়ে খুবই রাগান্বিত হলো এবং সেসব আলেমগণের মধ্যে বাশার বিন ওয়ালিদ ও ইবরাহিম বিন মাহদীকে হত্যার নির্দেশ দেয়। আর বাকিদের ব্যাপারে লিখলো, যারা নিজের রায় থেকে ফিরে না আসবে তঁদেরকে পায়ের উপর ঝুলিয়ে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। বাকী আলেমগণের মোট সংখ্যা ৩০ ছিলো। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল চারজন নিজের রায়ের উপর স্থির থাকেন। তাঁরা হলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., সাজ্জাদাহ, কওয়ারিরী এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ.। তাঁদের মধ্যেও সাজ্জাদাহ দ্বিতীয় দিন এবং কওয়ারিরী তৃতীয় দিন নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। ইমাম সাহেব রহ. এবং মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান ধরে রাখেন। সুতরাং ইমাম সাহেব রহ. এবং মুহাম্মাদ রহ.কে হাতকড়া এবং বেড়ি লাগিয়ে মামুনের নিকট তরসুসে (বর্তমান তুর্কির একটি শহর) পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবত হাতকড়া এবং বেড়ি এমন বরকতময় হাত-পা'য় চুমা দেয়ার জন্যই বানানো হয়েছিলো। ইমাম সাহেব রহ. এর সহযাত্রী এবং সহমর্মী অন্যান্য স্থানের উলামায়ে কেরামও ছিলেন। এসব উলামায়ে কেরাম রাস্থায় থাকাবস্থায়ই মামুনের মৃত্যুর খবর আসে। সুতরাং সকল উলামায়ে কেরামকে বাগদাদের গভর্নরের নিকট বাগদাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। পথেই মুহাম্মাদ বিন নুহ রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

মামুনের পর মু'তাসিম খলীফা হয়। মামুন তার স্থলাভিষিক্তকে খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে কঠোর ভাবে অসীয়ত করেছিলো। যেনো সে এই শিক্ষার উপর আমল করে। সুতরাং মু'তাসিমের সামনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে মুনাযারা করার জন্য আনা হলো। ইমাম সাহেব রহ.কে যখন মুনাযারার জন্য আনা হয়, তখন তাঁর পায়ে চারটি বেড়ি লাগানো ছিলো। তিন দিন পর্যন্ত মুনাযারা হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব রহ. আপন বিশ্বাস থেকে হটেননি। বাগদাদের হাকিম ধমক দিলো, যদি তুমি কথা না মানো তাহলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এমন জায়গায় ফেলে দেয়া হবে যেখানে কখনো সূর্যের আলো পৌছে না।

আখেরাতের সওদায় যাঁদের অন্তরে ভরপুর, যাঁদের সীনা নবুওয়াতের নূরে আলোকিত, তাঁদের জন্য দুনিয়া কেড়ে নেয়ার ধমকি অথবা সূর্য

হারিয়ে যাওয়ার ভীতি কোনো অর্থ রাখে না। সুতরাং তিনি কোনো ধমকে প্রভাবিত হলেন না। ভরা মজলিসে সরকারী উলামা মাশায়েখের সাথে মুনাযারা করতে থাকেন। তাঁর একটাই জবাব ছিলো, তোমরা যা বলছো তার পক্ষে কুরআন হাদীসের কোনো প্রমাণ নিয়ে আস, আমি তা মেনে নিবো। তাঁর সাহসিকতা এবং নির্ভিকতা খলীফা মানসূরকে প্রভাবিত করলো। যারফলে সে ইমাম সাহেব রহ. এর উপর নরম হতে লাগলো। সে ইমাম সাহেব রহ.কে বলল, যদি আপনি আমার অগ্রজের হাতে না লাগতেন, তাহলো কক্ষনো আমি আপনাকে স্পর্শ করতাম না। কিন্তু দরবারী উলামা মাশায়েখ তাকে উত্তেজিত করতে থাকে। মানুষ আপনাকে বলবে, মু'তাসিম তার ভাই মামুনের বিশ্বাস থেকে সরে গেছে। সরকারী উলামা মাশায়েখেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো যে, এই মাসআলার ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যে পুজি ভাগে আসতো, তা-ই ছিলো তাদের পেটের ইন্দন। কুরআন সুন্নাহ নিয়ে তাদের কী গরজ পড়েছে? তাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিলো, খাহেশাত পূর্ণ করা, দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করা, হুকুমতের পদের ফায়দা লুটা এবং সরকারী দরবার থেকে পাওয়া দিরহাম দিনার দিয়ে ঘরের সিন্দুকের মুখ ভরা। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথা ব্যাথা ছিলো না যে, ইতিহাস তাদের ব্যাপারে কী বলবে, আগামী প্রজন্ম তাদেরকে কিভাবে স্মরণ করবে, আখেরাতে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তারা কোন অবস্থায় দাঁড়াবে? আ'কায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুদের সাথে নাকি দুশমনদের সাথে? তারপর তৃতীয় দিন মু'তাসিম ইমাম রহ.কে বললো, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে আযাদ করে দিবো। তিনি জবাব দিলেন, কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসো।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের হাত কেটে ফেল

মু'তাসিম খুব রাগান্বিত হলো। জল্লাদকে হুকুম দিলো, তাঁর হাত কেটে দাও। জল্লাদ দুই চাবুক মারলো। তারপর অন্য জল্লাদ নিয়ে আসা

হলো। এভাবে প্রত্যেক জল্লাদ পূর্ণ শক্তিতে দুই চাবুক মেরে পিছনে হটে গেলো। উনিশ চাবুক মারার পর মু'তাসিম পুণরায় ইমাম সাহেবের সামনে আসলো এবং বললো, কেনো নিজের জানের পিছনে লেগেছো? আল্লাহর কসম তোমার প্রতি আমার খুবই খেয়াল আছে।

যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয় এবং তার উপর জমে যায়, এমন আত্মবিশ্বাসী লোকের সামনে আসমান থেকে রহমতের ফেরেশতা নামে। যারা তাঁদের অন্তরকে প্রশান্তি দিতে থাকে এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। আজও আল্লাহ তা'আলার এই সুন্নত প্রতিষ্ঠিত আছে। আজও দুনিয়া জুড়ে কারাগারগুলো এমনি ভাবে সেসব আল্লাহ ওয়ালাদের দিয়ে ভরে দেয়া হয়েছে, যাঁরা বাতিলের সামনে মাথা নুয়াতে অস্বীকার করেছে। যদি জুলুমের সামনে কেউ না দাঁড়াতো, তাহলে প্রত্যেক জালেম বিজয়ী হতো। প্রত্যেক অত্যাচারী কামিয়াব এবং সফল হয়ে যেতো। আর প্রত্যেক দূর্বল ভেঙ্গে কয়েক টুকরা হয়ে যেতো এবং নিজেদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট আশা ছেড়ে অত্যাচারী আর জালেমের দীন গ্রহণ করতো। উনিশ চাবুক খাওয়ার পরও ইমাম সাহেব রহ. এর আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞায় সামান্যতমও ফাটল ধরেনি। তিনি সেই জবাবই দিলেন, যা প্রথমে দিয়েছিলেন। মু'তাসিম পুণরায় চাবুক মারার হুকুম দিলো। তারপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সেই চাবুকের ব্যাপারে বলা হয়, তা এমন চাবুক ছিলো, যদি একটি চাবুক কোনো হাতিকে মারা হতো তাহলে হাতি চিৎকার করে পালিয়ে যেতো। ইমাম সাহেব রহ. রোযা ছিলেন। কেউ বলল, আপনার জান বাঁচানোর জন্য এই আকীদাকে মেনে নেয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। লোকেরা তাঁকে বুঝাতে চাইলেন এবং জান বাঁচানোর হাদীস শুনালেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে খাব্বাব রা. এর হাদীসের জবাব কী? যাতে বলা হয়েছে, প্রথমে কিছু লোক এমন ছিলো, যাদের মাথার উপর করাত চালিয়ে দেয়া হতো, তারপরও তাঁরা নিজের দীন থেকে সরে আসতো না।

একবার কোনো একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এসব করছেন আপনার ভয় হয় না? এর জবাবে তিনি বলেন, ভয় তো সে পাবে যার অন্তরে ব্যাধি আছে।

ইমাম সাহেব রহ.কে দু'বছর চার মাস কারাগারে রাখা হয়। এসময়ে ৩৩/৩৪ চাবুক মারা হয়। আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' গ্রন্থে লেখেন, ইমাম আহমদ রহ. এর উপমাহীন দৃঢ়পদ এবং অটলতার দরুন এই ফেতনা চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায়। ফলে মুসলমান এক বড় দীনি বিপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। যারা দীনের সেই ক্রান্তিকালে তৎকালিন হুকুমতের সঙ্গ দিয়েছে, সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাসলাহাতের দুহায় দিয়ে কাজ করেছে, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে। তাদের দীনি এবং ইলমী গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ রহ. এর শান দ্বীগুণ হয়ে বেড়ে গেছে। তার মহব্বত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং সহীহ আকীদাসম্পন্ন মুসলমানদের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরই এক সমকালীন ব্যক্তিত্ব কুতাইবা বলেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে আহমদ বিন হাম্বলের সাথে তার মহব্বত আছে, তাহলে বুঝে নিবে সে সুন্নাতের অনুসারি।

অপর একজন আলেম আহমদ বিন ইবরাহিম দাওরাকী রহ. বলেন, যাকে তোমরা আহমদ বিন হাম্বলের সমালোচনা করতে শুনবে, তার ইসলামকে তোমরা সন্দেহের চোখে দেখবে।

-তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ১/১০০।

ইমাম সাহেব ৭৭ বছর বয়সে ১২ রবিউল আওয়াল জুমার দিন ২৪১ হিজরী/৮৫৫ ঈসায়ীতে নিজের মাবুদে হাকীকির সাথে মিলিত হন। ইন্তেকালের সংবাদ শুনতেই গোটা শহর ছুটে আসে। তার জানাযার মতো এতো ভিড় ইতিপূর্বে অন্য কারো জানাযায় দেখা যায়নি। জানাযা পড়নেওয়ালাদের সংখ্যার ব্যাপারে বলা হয়, ৮ লক্ষ পুরুষ এবং ৬০ হাজার নারী উপস্থিত ছিলো। অবিচলতার এই ইতিহাস ওই সওদাগর কখনো-ই বুঝতে পারবে না, যার শিরায় শিরায় মাসলাহাত প্রবাহিত হয়েছে। যে দীনের প্রত্যেকটা বিষয়কে দুনিয়াবী লাভ ক্ষতির মাপকাঠিতে পরখ করার পর তা হক বাতিল হওয়ার ফায়সালা করে। তাদের দৃষ্টিতে এসব অবিচলতাকে জযবার অতিরঞ্জন, প্রাবল্য এবং হেকমত ও মাসলাহাত বিরোধী-ই মনে হবে।

অতীত আমাদের আয়না

খলকে কুরআনের ফেতনার ব্যাপারে হুকুমতের সঙ্গ দানকারীদের সরকারী আওতায় খুব খোশামোদি হবে। তাদের জ্ঞান-গরিমা, কৃতজ্ঞতা, মধ্যমপন্থী এবং আলোকিত চেতনার খুব কবিতা-গীত গাওয়া হবে। শাহী দরবার থেকে তাদের ব্যাপারে দেশপ্রেমিক, দেশ ও জাতির দরদী, শান্তিবাদি এবং কল্যাণকামী হওয়ার খেতাব দেয়া হবে। কিন্তু এসব খেতাব এবং সম্মান পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে বিদ্যমান আছে? আল্লাহ মালুম সেসব উচ্ছিষ্টের ঝুড়িরও কোন্ ডাস্টবিন জুটেছে, যাতে এসব সরকারী খেতাব ফেলে দেয়া হবে? তৎকালিন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব সরকারী উলামা মাশায়েখকে কিভাবে স্মরণ রেখেছে? হুকুমতের পক্ষ থেকে সম্মান দেয়ার পরও মুসলমান তাদেরকে কী মর্যাদা দিয়েছে? তাদের নাম জানে এমন কতজন আছে বর্তমানে? অথবা তাদের মুকাবেলায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে তৎকালিন হুকুমত ফেতনাবাজ, ফাসাদপ্রিয় ইত্যাদি নাম দিয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে কেমন ইয্যত দিয়েছেন? যে কেউ তাঁর নাম নিলে তাঁর উপর রহমত পাঠায়। এটাই ইতিহাসের সবক। কিন্তু ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণকারী খুব কমই হয়। অতীতের ইতিহাসকে অতীতের মতই মস্তিস্ক থেকে অতীত করে দেয়। এ কথা চিন্তা করে না যে, বর্তমানেও তেমন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। যারফলে মানুষ তার যুগে ঘটমান ঘটনা এবং কাহিনীকে সেই দৃষ্টিতে দেখে না, যে দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখে থাকে। বর্তমানের ঘটনাগুলোকে খুবই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। কেউ কোনো দলের গণ্ডিতে, কেউ মাযহাবের গণ্ডিতে, কেউ দেশের গণ্ডিতে বন্ধি হয়ে। এমনি ভাবে নিজের যুগের হুকুমতের বক্তব্য অনুযায়ী যাদের বিরোধীতা করছে, তাদেরকেও হুকুমতের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। তারা এ কথা ভুলে যায়, আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর বিরোধীরাও তাঁকে হুকুমতের বিদ্রোহী, আমীরুল মুমিনীনের অবাধ্য, উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী, হেকমত এবং মাসলাহাত পরিপন্থী হিসেবে দেখেছিলো। ভালো মন্দের যুদ্ধের অবস্থা এবং ঘটনা একই হয়। প্রতিপক্ষ এবং অস্ত্র

ভিন্ন নামের হতে পারে। তাদের মুকাবেলায় দাঁড়ানেওয়ালা এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মূল ভিত্তি একই হয়। কিন্তু মানুষ কেবল অতীতের বাতিল ও ঘোড়সাওয়ারদের সম্মান করে। বর্তমানকে তারা ভুলে যায়। আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হোক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর উপর। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর, যারা তাঁরই অবিচলতার পথে ফোস্কা পায়ে মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত এই বিশ্ব চরাচরে হক বাতিলের লড়াই বাকি থাকবে, ততদিন এই ইতহাসের পুণরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। বাতিল যেই আকৃতি নিয়েই আসুক না কেনো, হকের পক্ষ থেকে কোনো আবু হানিফা রহ. অথবা কোনো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. দাঁড়িয়ে যাবে।

পাকিস্তানের ফেরাউন, পারভেজ মুশাররফ প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পৃষ্ঠপোষক। এটা কিভাবে হতে পারে যে, বাতিল প্রকাশ্যে ভ্রষ্টতা ছড়াবে অথচ হকের সারি থেকে কেউ তার মুকাবেলায় দাঁড়াবে না? যদি এমনটি-ই হতো তাহলে হক বাতিলের লড়াইয়ের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেতো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সেই ইতিহাসকে পূর্ণ করার জন্য পারভেজ মুশাররফের মুকাবেলায় হকের ইমাম, শহীদ মাতা-পিতার গাজি ছেলে, গাজি আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. কে পাঠিয়েছেন। যাতে আহলে হককে কেউ অপবাদ দিতে না পারে যে, হে অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্বকারী! তোমাদের কী অবস্থা? গাজি আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. নিজেকে এবং জামিয়া হাফসার ছাত্রীদের কুরবানী দিয়ে বস্তুত বর্তমানের ইতিহাসকে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যাঁদের তবীয়তে প্রত্যেক বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া মিশে আছে। হে আল্লাহ! অসংখ্য অগণিত রহমত বর্ষিত কর গাজি শহীদ রহ. এর উপর এবং সেসব আত্মমর্যাদাবান ছাত্রীদের উপর, যারা পুরুষদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়ে দীনি মর্যাদার অর্থের মান বাঁচিয়েছে।

শায়খ আব্দুল কাদীর জিলানী রহ.

সিকান্দরের বাদশাহী থেকে সেই ফকীর উত্তম
যার ফকীরিতে আসাদুল্লাহর ঘ্রাণ আছে।

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. ৪৭০ হিজরীতে জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ আসেন। সেখানেই তিনি দীনি ইলম হাসিল করেন। তৎকালিন নামকরা উলামায়ে কেরামের সাহচর্যে থাকেন। জাহেরী এবং বাতেনী ইলম অর্জন করে ফারেগ হওয়ার পর মানব জাতির রুহানী চিকিৎসা শুরু করেন। সাধারণ থেকে নিয়ে হাকিম, বড় বড় আলেমগণও তাঁর মজলিসে শরীক হয়ে দীলের জগতকে আবাদ করেন। শায়খ জিলানী রহ. নম্রতা এবং শালীনতার উপমা ছিলেন। গরীব মিসকীনদের পাশে বসতেন। তাদের কাপড় পরিস্কার করতেন। উকুন আনতেন। পক্ষান্তরে কোনো ধনী, সরকারী কর্মকর্তার সম্মানে কখনো দাঁড়াতেন না। খলীফা আগমন করলে ইচ্ছাকৃত ঘরে চলে যেতেন। যখন খলীফা এসে বসে যেতেন, তখন তিনি বের হয়ে আসতেন। যাতে খলীফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে না হয়। শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর কারামতের আধিক্যের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত। আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক, সৃষ্টির প্রতি দয়া, দানশীলতা এবং মেহমানদারী তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো।

শায়খ আব্দুল কাদীর জিলানী রহ. এবং সত্যবাদিতা

যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার জন্য বরাদ্ধ হয়ে গেছে এবং আখেরাতের ওয়াদার উপর বিশ্বাস সুনিশ্চত হয়ে গেছে, সে সমকালিন হাকিম বাদশাদের অসন্তুষ্টির পরোয়া করে না। যে অন্তরে কবরের অন্ধকার এবং একাকিত্বের ভয় জমে আছে, তাকে যিন্দানখানার অন্ধকার আর একাকিত্ব ভয় দেখাতে পারে না। শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ.ও হক বলতে কোনো ভয়কে আমলে নিতেন না। সুতরাং দরবারি উলামা মাশায়েখ এবং হাকিমদের শুভদৃষ্টি লাভের জন্য ফতোয়া জারি করনেওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ইলম ও আমলের খিয়ানতকারী! তাদের সাথে তোমাদের কী সম্পর্ক? হে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন! খোদার বান্দাদের ডাকাত! তোমরা সরাসরি জুলুম এবং সরাসরি নেফাকে লিপ্ত। এই নেফাক কতদিন পর্যন্ত

থাকবে? হে আলেমসমাজ! হে দুনিয়াত্যাগী গোষ্ঠী! বাদশাহ এবং সুলতানদের জন্য কতদিন পর্যন্ত মুনাফিক হয়ে থাকবে? তাদের থেকে তোমরা দুনিয়ার মাল দৌলত এবং নফসের চাহিদা পূরণ করছো। অধিকাংশ বাদশা বর্তমান যামানায় আল্লাহ তা'আলার মাল এবং তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে জুলুম করছে। খেয়ানত করছে। হে আল্লাহ! মুনাফিকদের শক্তি ভেঙ্গে দাও। তাদেরকে অপদস্ত কর। তাদেরকে তাওবার তাওফিক দাও। জালেমদের কেল্লা তছনছ করে দাও। যমীনকে তাদের থেকে পবিত্র করে দাও অথবা তাদেরকে সংশোধন করে দাও।

-তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত খন্ড-১।

অন্য এক জায়গায় এই স্তরেরই একজনকে খেতাব করে বলেন, তোমার শরম হয় না? তোমার লোভ তোমাকে জালেমদের খেদমত এবং হারামখুরীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কতদিন পর্যন্ত হারামখুরী এবং জালেম বাদশাদের খেদমত করতে থাকবে? যাদের খেদমতে তুমি লেগে আছো, তাদের রাজত্ব অচিরেই মিটে যাবে। তোমাকে আল্লাহ তা'আলার খেদমতেই আসতে হবে। যার কোনো ক্ষয় নেই।

-তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত খন্ড-১।

মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে মানুষের উপর আশা বেঁধে আছে। কাফেরদেরকে এমন ভাবে ভয় পায়, যেমনটি আল্লাহকে পাওয়া উচিত ছিলো। বরং এর চেয়ে বেশি পাওয়া উচিত ছিলো। শায়খ জিলানী রহ. তার ব্যাপারে বলেন, আজ তুমি ভরসা করছো নিজের উপর, মাখলুকের উপর, নিজের দীনার দেরহামের উপর, নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, শহরের হাকিমের উপর। তুমি যে বস্তুর উপরই ভরসা করছো তা তোমার মাবুদ। যে ব্যক্তির উপর তুমি নির্ভর করছো, সে তোমার মাবুদ। যে ব্যক্তির উপর তোমার লাভ ক্ষতির ব্যাপারে নজর পরবে, এ কথাই বুঝবে যে আল্লাহ তা'আলাই তার হাতে তা দানকারী। আর সে তোমার মাবুদ।

-তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত খন্ড-১।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! পীরদের পীর শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর কথা চিন্তা করুন। তারপর নিজের হিসেব নিন। আমরা কতগুলো মাবুদ বানিয়ে রেখেছি? আল্লাহকে ছেড়ে আমেরিকা এবং ইহুদীদের বিশ্ব

সংস্থাগুলোকে রিযিকদাতা মানছি? কাফেরদের বক্তব্য শুনে প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের বিধি বিধানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি? বসতিগুলোতে বোম বর্ষণ করার ভয়ে নিজের মুসলমান ভাই বোনদেরকে কাফেরদের নিকট বিক্রি করছি? আমেরিকা নারাজ হয়ে রিযিক বন্ধ করে দিবে, দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিবে, এই ভয়ে কুরআনের আয়াতগুলো গোপন করছি? নিজের ঘর বাঁচানোর জন্য কালেমাওয়ালা অন্য মুসলমানদের বাচ্চা, মহিলা এবং বৃদ্ধদের উপর বোম্বিং করাচ্ছি? সেসব হত্যাকারীদের সহযোগীতা করে জুলুমের উপর জুলুম করছি? খুনীদের দুশমন মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে নিজের যবান এবং কলম ব্যবহার করছি? একটু চিন্তা করি। এটা কেমন ইসলাম? ভাবুন। আমরা ঈমানের কোন সঙ্গার উপর দণ্ডায়মান? কখনো মূর্তীগুলোর পূজা থেকে অবসর পেলে গননা করে দেখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রবের সাথে যাদেরকে শরীক করছি তাদের সংখ্যা কততে পৌছেছে? প্রত্যেক জিনিসের পৃথক খোদা বানিয়ে রেখেছি। জীবন মৃত্যুর খোদা আমেরিকা, টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলতের খোদা আই.এম.এফ, রিযিকের খোদা জাতিসংঘ, পানি-বাতাসের খোদা ভারত, দেশপ্রেম, জাতীয়তা, ভাষাপ্রেম আর নফসের মূর্তী? হাজার মূর্তী রয়েছে দীলের আস্তীনে।

সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ.

(১১৩৮-১১৯৩ ঈসায়ী)

শাসকগোষ্ঠীর জন্য মৌজ মাস্তির জীবন যাপন করা, নিজের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জায়েয না জায়েয সবধরণের অস্ত্র ব্যবহার করা, কোনো মুশকিল কাজ নয়। জাতির পেট কেটে নিজের খাযানার মুখ ভরা দুনিয়াদারদের অভ্যাস। জনসাধারণের যিন্দেগীকে ফসল বানিয়ে নিজের যিন্দেগীতে বাহারী রঙ লাগানো তাদের শখ। নিজের নফসের চাহিদায় শরীয়তের গিলাফ লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ এবং আমিত্বকে পবিত্র আইনের মর্যাদা দেয়া তাদের জন্য সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই দীনের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের যেসব বান্দাদের বাছায় করেন, তাঁদের শান অন্যদের থেকে ভিন্নই হয়। তাঁদের স্বভাব অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম হয়।

ইসলামী ইতিহাসের দিগন্তে সেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রই বিদ্যমান, যারা অন্ধকার রাত্রিতে মুসাফিরদের মনযিলের দিকে পথপ্রদর্শন করছে। যারা নিজেদের চেষ্টা, আত্মত্যাগ, কুরবানী এবং আখেরাতের ভয়ের বদলায় যুগে যুগে মুসলমানদের মান বাঁচিয়েছে। নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে, দেহ এবং আত্মাকে রক্তে রঞ্জিত করে, দীলের দূর্বলতাকে টুকরো টুকরো করে উম্মতের শান্তির সামান তৈরি করেছে। মুসলমানদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য গোটা বিশ্বের পেরেশানী (যা পাহাড়ে রাখলে কয়লা হয়ে যাবে) নিজের অন্তরে নিয়ে নিয়েছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. ইসলামী ইতিহাসের সেই হীরা, যার নাম শুনতেই ঈমানদারদের ঈমান টগবগ করতে থাকে। বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদী ইসলামী বিশ্বের বাচ্চা শিশুদেরও স্বপ্ন ছিলো। তিনিই সেই আল্লাহর ওলী, যিনি প্রথম কেবলাকে কাফেরদের হাত থেকে আযাদ করেন। প্রথমে সেটি ওমর রা. এর খেলাফতকালে বিজয় হয়। তারপর শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা এবং মুসলিম উম্মাহর জিহাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে ৪৯৬ হিজরী/১০৯৯ ঈসায়ী কাফেররা দ্বিতীয়বার দখল করে নেয়। বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাত থেকে ছুটে যাওয়া ইসলামী বিশ্বের জন্য বড় ধরণের ধাক্কা ছিলো। যারফলে মুসলমানদের মধ্যে দূর্বলতা এবং নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ক্রুসেডারদের সাহস এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা পবিত্র মক্কা-মদীনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করে ফেলে। পবিত্র রওজা শরীফের ব্যাপারে বেয়াদবী এবং অপমানজনক বাক্য ও ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমন সময় ইসলামী বিশ্বে কোনো একজন মুজাহিদের প্রয়োজন ছিলো। যিনি জিহাদে বের হয়ে ক্রুসেডারদের সয়লাবের পথে বাঁধ দিতে পারবেন। এমন এক নেতা হবেন, যিনি সাধারণ মানুষের জযবার বাস্তবায়ন করবেন। পবিত্র ভূমি এবং মক্কা-মদীনার হেফাজতের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার জযবা রাখবেন। এমন এক মুজাহিদ হবেন, যিনি জিহাদকে ইবাদাত মনে করবেন এবং তাকেই জীবনের চাওয়া পাওয়া বানাবেন।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী রহ.। তিনি ক্রুসেডারদের থেকে নিজেদের ভূমি ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন।

আল্লাহ তা'আলা তাকে ৫৪১ হিজরীতে শাহাদাতের পানপাত্র দান করেন। তারপর তাঁর ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্গী রহ. এই জিহাদকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি একজন আলেম, দুনিয়াত্যাগী এবং আবেদ ছিলেনে। তাঁর ভিতরে কানায় কানায় জিহাদের স্পৃহা ভরপুর ছিলো। বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদী তাঁর মিশন ছিলো। একেই তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করতেন। ৫৫৮ হিজরীতে বাকিআহ এর যুদ্ধে ক্রুসেডাররা আকস্মাত হামলা চালালে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। তখন তিনি কসম করেন, যতদিন বদলা না নিতে পারবেন ততদিন ছাদের নীচে (ঘরে ফিরে) যাবেন না। সুতরাং খুব জযবা এবং উদ্দীপনার সাথে জবাবী হামলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। আলেম-উলামা এবং বুযুর্গানে দীনের নিকটও অবস্থা লিখে পাঠালেন। যাতে তিনি কাফেরদের জুলুমের কথাও উল্লেখ করেন। উলামায়ে হক কেঁদে কেঁদে সেসব ঘটনা মুসলমানদের নিকট বর্ণনা করেন। যারফলে মানুষের মধ্যে জিহাদের ঢেউ উঠে। ইতিহাস সাক্ষি, প্রত্যেক যুগে উলামায়ে হক মুজাহিদীনকে সঙ্গ দিয়েছেন। নিজেরা জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেছেন। যদি কখনো যেতে না পারতেন তখনো তাদের অন্তর জিহাদের ময়দানে ঝুলে থাকতো। সাধারণ মুসলমানদেরকে মুজাহিদীনকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করতেন। উলামায়ে হকের উৎসাহে মানুষ পাগলের মতো নুরুদ্দীন জঙ্গী রহ. এর সহযোগী হতে পৌছতে লাগলো। সুলতান নিজের কসম পুরা করলেন। ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের ঐক্য ভেঙ্গে তছনছ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বড় বিজয় দান করলেন। পঞ্চাশের বেশি শহর কাফেরদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনলেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদী অন্য কারো হাতে লেখা ছিলো। সুতরাং তিনি ফিলিস্তিনের সকল এলাকা ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করে ৫৬৯ হিজরী/১১৭৪ ঈসায়ীতে আসল ঠিকানার দিকে পাড়ি জমান।

তারপর এই যিম্মাদারী তার সিপাহ সালার সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর কাঁধে আসে। সুলতানকে যারা দেখেছেন তারা বলেন, মনে হয় তাঁকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে দীনে ইসলামকে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং বায়তুল

মুকাদ্দাস আযাদ করবেন। সুলতান রহ. বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদীকে দিলের ব্যাধিতে পরিণত করে নিয়েছিলেন। যা তাঁকে একটা মূহুর্ত নিশ্চিন্তে বসতে দিতো না। আরাম-আয়েশ, দুনিয়ার স্বপ্ন-স্বাধ, ব্যক্তিগত চাহিদা, সবকিছু সুলতান আইয়ূবী রহ. এর জন্য অর্থহীন হয়ে পড়ছিলো। জিহাদই তাঁর আরাম-আয়েশ, জিহাদই তাঁর আশা-আকাঙ্খা। জিহাদের সাথেই তাঁর ভবিষ্যত স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

কাজী ইবনে শাদ্দাদ সুলতান সালাহ উদ্দীন রহ. এর বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লেখেন, জিহাদের মহব্বত এবং আকাঙ্খা তাঁর শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিলো। তাঁর অন্তর এবং চিন্তা চেতনাকে বেষ্টন করে নিয়েছিলো। জিহাদই তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিলো। জিহাদেরই সরঞ্জাম তৈরি করতে থাকতেন। জিহাদেরই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। এরই জন্য তিনি লোক তালাশ করতেন। এরই আলোচনা এবং উৎসাহদাতার প্রতি তিনি মনোযোগী হতেন। এই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য তিনি নিজের সন্তান, পরিবার এবং জন্মভূমিকে আলবিদা বলেছেন। সবকিছু ছেড়ে মরুবাসি হয়েছেন। এক তাবুর যিন্দেগীতেই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যা বাতাসের দরুন এদিক ওদিক হেলে যেতো। কসম করা যেতে পারে, জিহাদের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি একটা পয়সাও মুজাহিদীনের সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া অন্য কোনো খাতে খরচ করেননি।

-তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত খন্ড-১।

অন্য এক জায়গায় কাজী শাদ্দাদ লেখেন, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অবস্থা এমন একজন চিন্তিত মায়ের মতো হতো, যিনি তার একমাত্র বাচ্চাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি এক কাতার থেকে অন্য কাতারে ঘোড়া নিয়ে দৌড়াতে থাকতেন এবং মুজাহিদীনকে জিহাদের উপর উৎসাহিত করতে থাকতেন। তিনি একাই গোটা ফৌজের মধ্যে ঘুরে ফিরতেন এবং হাঁক ডাক করতেন; হে ইসলামের প্রভু! তুমি ইসলামকে সাহায্য কর। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।

-তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত খন্ড-১।

হাত্তিনের যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ

টলানো যেতো না যা, যুদ্ধে তা উড়ে যেতো
সিংহের পা-ও ময়দান থেকে উপড়ে যেতো,
তোমার অবাধ্য হতো যে, নষ্ট হয়ে যেতো
তরবারি কী জিনিস, আমরা তো কামানের সাথে লড়ে যেতাম।

হাত্তিনের যুদ্ধ ৫৮৩ হিজরী/১১৮৭ ঈসায়ীতে সংঘটিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয় এবং পরাজয় এই যুদ্ধেই চূড়ান্ত হয়েছিলো। সুতরাং ক্রুসেডাররা নিজেদের সবকিছুই এই যুদ্ধে সংযোগ করেছিলো। সুলতান জিহাদের উৎসাহ দিতে দিতে মুজাহিদীনের মধ্যে জোশ এবং স্পৃহার আগুনে স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়েছিলেন। আল্লাহর বন্ধুদের বাহুতে বিজলী চমকাচ্ছিলো। যা যে কোনো সময় আল্লাহর দুশমনদের উপর ভেঙ্গে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিলো। প্রত্যেক মুজাহিদ বিজয় অথবা শাহাদাতের তামান্নায় অস্থির ছিলো। নিজের প্রথম কেবলাকে ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করার আকাঙ্খায় বুঁদ হয়েছিলো। মুজাহিদীন এই যুদ্ধে এমন ভাবে লড়াই করে যে, এরপর তাদের বেঁচে থাকা অনর্থক। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদীনকে সাহায্য করেন। মুজাহিদীনকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করেন। ঈমানদারদের অন্তরে শীতলতা নেমে আসে এবং মুনাফিকদের কলিজা ফেটে যায়। যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা অবাক করার মতো ছিলো। একেক জন মুজাহিদ ৩০ ক্রুসেডারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতেন। তাঁরা যাদেরকে গ্রেফতার করেছিলেন তাদের মধ্যে ক্রুসেডারদের বড় বড় কমাণ্ডারও গ্রেফতার হয়েছিলো। জেরুজালেমের বাদশা 'গাঈ'ও তাদের সাথে গ্রেফতার হয়েছিলো।

মক্কা মদীনার উপর কুদৃষ্টিদাতার পরিণাম

মক্কা মদীনার উপর হামলার ইচ্ছা পোষণকারী 'ওয়ালী কর্ক রেজিনাল্ড' আ'কায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামদের সামনে বন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলো। তার চক্রান্ত এবং

অহংকার মাটির সাথে মিশে গিয়েছিলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ. জেরুজালেমের বাদশাকে নিজের কাছে বসালেন। তার পিপাসা দেখে তাকে ঠান্ডা পানির পিয়ালা পান করতে দিলেন। বাদশা পানি পান করে রেজিনাল্ডকে দিয়ে দিলেন। তার উপর সুলতান রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বাদশা 'গাঈ'কে বললেন, আমি তো তাকে পানি দেইনি। রুটি এবং লবন যাকে দেয়া হয়, তাকে নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু এই লোক আমার প্রতিশোধ থেকে বাঁচতে পারবে না। এ কথা বলে সুলতান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'শুনে রাখ! আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য দুইবার কসম খেয়েছি। এক. যখন তুমি পবিত্র মক্কা মদীনায় আক্রমণ চালানোর ইচ্ছা করেছিলে। দুই. যখন তুমি ধোঁকাবাজি এবং গাদ্দারী করে হাজিদের কাফেলার উপর আক্রমণ করেছিলে। দেখ! এখন আমি তোমার বেয়াদবী এবং অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছি।' এ কথা বলে সুলতান রহ. তরবারি বের করলেন এবং রেজিনাল্ডকে নিজের হাতে কতল করে নিজের কসম পুরা করেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

হাত্তীন বিজয়ের কয়েক মাসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সেই দিনটিকেও মুসলমানদের দেখালেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বিতীয়বার মুসলমানদের দখলে আসে। প্রথমবার হযরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফতকালে জিহাদের মাধ্যমেই বিজয় হয়েছিলো। তারপর যখন উম্মত জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তখন কাফেররা পূণরায় তা দখল করে নেয়। তারপর ৯০ বছর বায়তুল মুকাদ্দাস কাফেরদের হাতে থাকে। এটা সেই ৯০ বছর যখন উম্মতের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস, প্রশিদ্ধ ফকীহ এবং ওলীগণ মওজুদ ছিলেন। ইলমী এবং গবেষণার দিক থেকে তা ইসলামী ইতিহাসের সোনালী যুগ ছিলো। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী, আল্লামা যমখশরী, আবু বকর ইবনে আরাবী, ইবনে আসাকির এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. এর মতো মহান

ব্যক্তিবর্গ এই যুগে বিদ্যমান ছিলেন। সারকথা হলো, কুফর এবং ফেতনার শক্তি ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কিতালের আদেশ করেছেন। এই পথ অবলম্বন করেই কুফরের শক্তি ভাঙ্গা যেতে পাড়ে। যেই পথ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পছন্দ করেছেন, নবীয়ে আখিরুয্যামান সেই পথকেই নিজের উম্মতের জন্য ছেড়ে গেছেন এবং বলে গেছেন, যদি তোমরা এই পথকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দেয়া হবে। যেই লাঞ্চনা ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন তোমরা জিহাদের পথে ফিরে না আসবে। এখন যদি উম্মত জিহাদের রাস্তা ছেড়ে অন্য কোনো পন্থায় এই লাঞ্চনাকে দূর করতে চায়, তাহলে তা কখনোই দূর হবে না। কেননা মুসলমানদের জন্য কামিয়াবী কেবল এবং কেবলই আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান পালনের মধ্যে রয়েছে। যখন যা হুকুম হবে তখন তাই পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর মাথা ঝুকানোর নামই দীন। তা ভিন্ন সবকিছুই শয়তানের ধোকা। শব্দ এদিক সেদিক করা, যৌক্তিক দলীল প্রমাণ এবং কাদিয়ানী টাইপের প্রশ্ন মানুষের নিকট যতই পছন্দনীয় হোক না কেনো, দীন হলো সেই জিনিস, যা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য ছেড়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবন যার উপর সাক্ষি। উলামায়ে হক তার উপর চলে আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন। সুতরাং সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. দীনের সেই অটল বাস্তবতাকে বুঝতেন যা কাফেরদের শক্তিকে ভাঙ্গতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের ময়দানে বের হয়ে বিজয়ের জন্য দু'আ করেছেন। সুতরাং সুলতান রহ. বায়তুল মুকাদ্দাসের আযাদীর জন্য কিতালকে আবশ্যক মনে করেছেন এবং তারপর উলামায়ে হকের নিকট দু'আর দরখাস্ত করেছেন।

৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে ৯০ বছর পর জুমার নামায হয়। দূর দূরান্ত থেকে উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মুসলমান গলা ছেড়ে তাকবীর দিতে দিতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আসতে থাকেন। সেসব লোকের আনন্দের পরিমাপ তারাই করতে পারে যাদের অন্তরে ইসলামের বিজয়ের

তামান্নাগুলো উছলাতে থাকে। যাদের চোখ ইসলাম এবং মুসলামানদেরকে কাফেরদের শাসন থেকে আযাদ দেখার জন্য অপলক তাকিয়ে থাকে। অন্যথায় যাদের নিকট ইসলাম বিজয়ী হলো নাকি পরাজিত হলো, মুসলমান শাসক হলো নাকি প্রজা হলো এসবের কোনো দরকার নেই, তাদের জন্য এসব কথা অর্থহীন। তাদের জন্য দু'বেলা পেট ভরার নামই যিন্দেগী। চাই তাদের শাসক হিন্দু হোক কিংবা ইহুদী হোক।

সম্মিলিত সেনাদল
এবং ইসলামের সিংহ সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ.

পক্ষান্তরে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ের সংবাদ কুফরী বিশ্বের উপর বিজলী হয়ে আছড়ে পড়ে। এই সংবাদ তাদের ভিতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গোটা ইউরোপ মারার জন্য এবং মরার জন্য তৈরি হয়ে যায়। ইউরোপের সকল প্রশিদ্ধ বাদশাহ, শাহজাদা, সিপাহ সালার এবং সমরবিদরা ময়দানে বের হয়ে আসে। কায়সার, ফ্রেডরিক, রিচার্ড শেরডল এবং ইংলিস্তান, ফ্রান্স, স্কলিয়া, অস্ট্রীয়ার বাদশা, ডিউক ও নাইটরা সবাই এক ছিলো। পক্ষান্তরে তাদের মুকাবেলায় একা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. কিছু সাথীবর্গ নিয়ে ইসলামী বিশ্বের পক্ষে লড়ছিলেন। ধারাবাহিক পাঁচবছর রক্তারক্তি যুদ্ধ চলতে থাকে। সম্মিলিত বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের জন্য জান প্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. তাদের মুকাবেলা করতে থাকেন। ক্লান্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়েও বিশ্রামের খেয়ালও অন্তরে আনেননি। নিজের জান বাঁচানো, নেতৃত্বের ফায়দা লুটা এবং পরিবারের সাথে যিন্দেগীর স্বাদ নেয়ার বিনিময়ে ঈমানী সম্ভ্রম ও রক্ষকের সওদা করেননি। এই চিন্তাও করেননি যে, যদি এই সম্মিলিত বাহিনীর সাথে কুলাতে না পারেন, তাহলে তারা মুসলমানদের প্রতিটি ইট খুলে নিবে। বরং অকুতোভয় হয়ে গোটা ইসলামী বিশ্বের পক্ষ থেকে প্রথম কেবলার প্রতিরক্ষা আঞ্জাম দিতে থাকেন।

আজ মুসলমান কোনো একজন সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোনো সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে পাঠিয়ে দিলে তার কদর করে না। এমনকি তাকে সময়ের সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী মনেই করে না। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, আজ তারই রুহানী প্রতিনিধি সেই পথে চলে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছার প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে। মনে রাখা উচিত, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রহ. শুধু একজন বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ীর নাম নয়, তিনি একটি প্রেরণা, তিনি একটি প্রতিজ্ঞা, তিনি হৃদয়ের এক জ্বালার নাম। তিনি মহব্বত এবং পাগলামীর ওই চূড়া যেখানে আকলের প্রবেশাধিকার নিষেধ। জয়-পরাজয়ের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা মুজাহিদীনের ব্যাপারে হক বাতিলের ফায়সালা করে জয়-পরাজয় দেখে তারা যুক্তিবাদি, তাদের অন্তরে মহব্বতের বাতাসও লাগেনি। শরীয়তের রাজ এবং গভীরতা সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই। স্মরণ করুন! সায়্যিদুনা নূহ আ. ৯০০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল কী পেয়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহ এক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাস কি এমন যে, তিনি ব্যর্থ? তিনি কি হকের উপর ছিলেন না? প্রকৃতপক্ষে লাভ ক্ষতি দেখে প্রেম ভালোবাসা হয় না। পরিণামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কেবল হুকুম পালন করে যেতে হয়। যদি হুকুম হয়, একমাত্র ছেলের গর্দানে ছুরি চালাতে, তাহলে তৎক্ষনাত তা পালন করতে হয়। আকলকে এ কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না যে, ছুরি চালাবো কি না? গর্দান কাটবো কি না? বিশদ ইতিহাস। দীল ওয়ালারাই কেবল বুঝতে পারবেন। যাদের অন্তরে ঈমান বাসা বেঁধেছে তারাই বুঝবেন। সুতরাং এই উম্মত প্রত্যেক যুগে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর পথে চলার মতো লোক জন্ম দিচ্ছে। কখনো সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ রহ. (কস্তুনতুনিয়া বিজেতা ১৪৩২-১৪৮১) এর আকৃতিতে। কখনো আওরঙ্গজেব আলমগীর রহ. (১৬১৮-১৭০৭) এর আকৃতিতে। কখনো সিরাজুদ্দৌলা রহ. (১৭৪৯-১৭৯৯) এর আকৃতিতে। কখনো শহিদ টিপু সুলতান রহ. (১৭৯৯) এর আকৃতিতে। কখনো সায়্যিদ শহীদ রহ. (১৭৮৬-১৮৩১) এর আকৃতিতে। কখনো শামেলীর ময়দানের ঘোড় সাওয়ারদের আকৃতিতে। শুধু চিন্তা ভাবনার কমতি। নতুবা আজও উম্মত

বাঁজা হয়ে যায়নি। আফগান জিহাদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভূখণ্ডে উম্মতের মায়েরা কেমন চমকানো হিরাগুলো জিহাদের ময়দানে কুরবানী করে দিয়েছে। ইতিহাস লেখা হলে সবাই স্বীকার করবে। কারণ, মানুষ নিজের যুগের ব্যক্তিত্বদেরকে মর্যাদা না দেয়াটা বাস্তবতায় রুপ নিয়েছে। তারা শুধু অতীতের সালাহ উদ্দীন রহ.কে জানে। কারণ, তার অবস্থাগুলো তাদের দৃষ্টিতে চমকাচ্ছে। এটাও একটা প্রশ্ন যে, যদি এই যুগে সুলতান সালাহ উদ্দীন রহ. আসেন তাহলে আমাদের মধ্য থেকে কতজন তার সঙ্গ দিবো? সম্মিলিত সেনাবাহিনীর মুকাবেলায় তাঁর সমমনা কতজন মুসলমান পাওয়া যাবে? বর্তমান হুকুমতের অসন্তুষ্টি, চক্রান্তকারী ফেতনা, ব্যক্তিগত বাঁধা সত্ত্বেও কতজন এমন পাগল পাওয়া যাবে, যারা সবকিছু ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য কোনো আইয়ূবী রহ. এর সাথে চলে যাবে?

তৃতীয় অধ্যায়
ইমাম মাহদীর আলোচনা

ইমাম মাহদী

ইমাম মাহদী এর বংশ, আকৃতি এবং বায়আতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং দাজ্জাল' নামক গ্রন্থে অতিবাহিত হয়েছে। কিছু আলোচনা 'বার্মোডা ট্রায়েঙ্গেল এবং দাজ্জাল' গ্রন্থেও করা হয়েছে। এখানে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি কথা পেশ করবো। মু'তাযেলী চিন্তা চেতনার কিছু লোক ইমাম মাহদীর আগমনকে অস্বীকার করে। আর্থিক তাওয়াতুর এর পর্যায়ের হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে তারা এই হটকারিতার উপর অটল যে, ইমাম মাহদীর ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। গোটা উম্মতের চৌদ্দশত বছরের মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং উলামা এক দিকে (যাদের আকীদা ইমাম মাহদীর আগমন হবে) আর তারা এক দিকে (যাদের আকীদা ইমাম মাহদী আসার নামও নেই)। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যবদ্ধ আকীদা হলো, ইমাম মাহদী আ. শেষ যামানায় আগমন করবেন। কুফফার এবং মুনাফিকদের সাথে কিতাল করে পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। যা নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইসলামের দুশমনদের মধ্যে সেসব মুসলিম নামের প্রশাসকরাও শামিল থাকবে যারা নিজ নিজ দেশে ইসলামী হুকুমতের বিরোধী। ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে তাদের হাত কাটা যাওয়া, তাদের স্ত্রীদেরকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা এবং তাদের সন্তানদেরকে মুসলিম হত্যার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলানোর ভয় রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে ইমাম মাহদী এবং দাজ্জালের আগমণকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের ব্যাপারে মানুষের পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত মত রয়েছে। কিছু লোক এই বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। কিছু লোক এই বিষয়কে গুরুত্ব দিতে সম্পূর্ণ বিরোধী। অর্থাৎ যদি ফেতনাসমূহ, ইমাম মাহদী এবং দাজ্জালের বিলকুল আলোচনাই না করা হয়, তাহলে কিছু লোকের নিকট তা ভালো। কিন্তু যদি এই বিষয়টি আলোচনা করা অথবা লেখা শুরু করে, তাহলে তারা তা ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। তাদের মধ্যে কিছু লোক ইমাম মাহদীর আলোচনার বিরোধীতা এ জন্য করে যে, এতে উম্মতের মধ্যে অলসতা এবং বিলাসীতা সৃষ্টি হয়। আমল করতে

আগ্রহী হয় না। মানুষ নিজে কিছু করার পরিবর্তে হাত পা গুটিয়ে ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় বসে যায়। এ কথা মনে করে যে, এখন যা কিছু করবে ইমাম মাহদী এসেই করবে। ইমাম মাহদীর আলোচনায় যদি এমন প্রভাব তৈরি হয় যে, মানুষ আমল করা থেকে বিরত হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয় এমন আলোচনার চেয়ে আলোচনা না হওয়া ভালো। কিন্তু যদি এই বিষয়ে লেখনে ওয়ালার উদ্দেশ্য উম্মতকে জাগ্রত করা, তাদের মধ্যে জিহাদের স্পৃহা তৈরি করা, কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের সাহস পয়দা করা, হতাশা এবং নৈরাশ্য থেকে বের করে আনা এবং বিশ্বাসের মশাল জ্বালানো হয়, তাহলে এই আলোচনা তো এখন খুবই প্রয়োজন। এর বিরোধীতা করা বোধ শক্তির বাহিরে। তাছাড়া এই যুগে যদি কেউ এই বিষয়ে আলোচনা করে, তাহলে সেটা তো কোনো নতুন বিষয় নয়। প্রত্যেক যুগে সলফে সালেহীন এ বিষয়ে লিখেছেন। নিজ নিজ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ঘটনার তুলনাও দিয়েছেন।

দিল তোমার কাঁপছে কেনো, তুফান আসার ভয়ে? এক ভয়ঙ্কর তুফান যে জাতির দরজায় করাঘাত করছে, উত্তাল ঢেউ নিজের সাথে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আছড়ে পরছে, এমন জাতি যদি সতর্কতা অবলম্বনের পরিবর্তে তুফানকেই অস্বীকার করতে শুরু করে, তাহলে তাদের পরিণতির ব্যাপারে কার সন্দেহ হতে পারে? এমন সময় যখন ইসলামী বিশ্ব, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুসলমানরা নেহায়াতই স্পর্শকাতর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে মানুষকে সেই অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা যদি আবেগী এবং বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে উম্মতকে জাগানোর সময় ও পন্থা কী হবে? তুফানের আলামত দেখে তার আগমণ অস্বীকার করলে তুফান চলে যাবে? নাকি ঘরের বারান্দায় পৌছা সুনামির ঢেউ শুধু এজন্য চলে যাবে যে, আমরা কোনো প্রস্তুতি নেইনি? অথবা আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম? আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নেয়া উচিত যে, বিপদ বুঝে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুকাবেলার পরিবর্তে একা একা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অভ্যাস করছি। প্রত্যেকেই জানে হকপন্থীদের সাথে কী করা হবে। কিন্তু আমরা নিজেদের অলসতা, কাপুরুষতা এবং বিলাসীতাকে ব্যাখ্যার (তাওয়ীল) লেবেল লাগিয়ে স্বপ্ন এবং খেয়ালের জগতে মগ্ন থাকতে চাই।

দিল তোমার কাঁপছে কেনো তুফান আসার ভয়ে,
নাকি (তোমার অবস্থা) তুমি খোদা, তুমি সাগর,
তুমিই কিসতি, তুমিই কুল হয়ে?

মোটকথা, ফেতনা, দাজ্জাল এবং ইমাম মাহদীর আলোচনার গুরুত্ব দেয়া হোক অথবা না দেয়া হোক, এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হলো, তিনি এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজের প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম রা.কে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পর তাবেঈ, তাবয়ে তাবেঈ, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ের উপর লেখা লেখি করে গেছেন।

ইমাম মাহদীর আগমণের কিছু নিদর্শন

ইবনে সিরীন রহ. বলেন, মাহদী ততদিন পর্যন্ত আসবেন না যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক নয়জনের মধ্যে একজনকে কতল করে দেয়া হবে।

-নুআঈম বিন হাম্মাদ এটি বর্ণনা করেন। আহমদ বিন শুঅবান বলেন এটিতে কোনো সমস্যা নেই।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত 'আবি কুবাইস' পাহাড়ের উপর বিল্ডিং দেখে বললেন, হে মুজাহিদ! যখন তোমরা দেখবে মক্কার উভয় পাহাড়ের (আবি কুবাইস এবং কুআঈকাআন) উপর বিল্ডিং প্রকাশ পেয়েছে এবং তার রাস্তাগুলোতে পানি প্রবাহিত হয়েছে তখন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।

-এটি ইবনে হাজার রহ. 'আল ফাতহু' গ্রন্থে এবং আল ফাকেহী রহ. 'মক্কা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

ফায়দাঃ- আবি কুবাইস পাহাড় সাফা এর উপরিভাগের একটি পাহাড়। যার উপরে থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদকে দু'টুকরো করেছিলেন। বর্তমানে এই পাহাড়ের উপর আলে সাউদ বাদশার প্রাসাদ বানানো হয়েছে। আর তার সামনের পাহাড়ের নাম কুআঈকাআন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী আবি কুবাইস এবং আহমার পাহাড় উদ্দেশ্য।

-মু'জামুল বুলদান।

ইয়ালা বিন আতা রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর সাওয়ারীর থামানো ছিলো। তখন তিনি বললেন, যখন তোমরা দেখবে মক্কাতে পানির ঝর্ণাসমূহ (পাইপ লাইন) খনন করা হবে এবং বিল্ডিংসমূহ পাহাড়ের চূড়াতে উচু হতে থাকবে, তখন মনে করবে কিয়ামতের লেনাদেনা নিকটে এসে গেছে।

-মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

ফায়দাঃ- মক্কা মুকাররামাতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সব জায়গাতে পানি পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। মক্কা মুকাররামার প্রত্যেক পাহাড়ের উপরও বিল্ডিং বানানো হয়েছে।

ইমাম মাহদী কোথায় থেকে বের হবেন?

সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইমাম মাহদী আ. বায়তুল্লাহতে প্রকাশ হবেন। অর্থাৎ শেষ যামানার মাহদী হিসেবে তাঁর হাতে হারাম শরীফে বায়আত নেয়া হবে। কিন্তু বের হওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু সলফে সালেহীন কিছু হাদীসের এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, বায়তুল্লাতে বায়আত নেয়ার আগে ইমাম মাহদী পূর্বদিকের দেশগুলোতে বের হবেন। আর তা হলো সেই হাদীস যাতে বলা হয়েছে, তোমাদের খাযানার পাশে তিনটি দল যুদ্ধ করবে। তিনজনই খলীফার ছেলে হবে।

সুতরাং আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এই বর্ণনার ভিত্তির ব্যাপারে বলেন, ইমাম মাহদী পূর্বদিকের দেশগুলো থেকে প্রকাশ পাবে। সামিরা গুহা থেকে প্রকাশ পাবে না, যেমনটি জাহেল রাফেযীরা ধারণা করছে। তাদের ধারণা, তিনি সেই গুহায় অবস্থান করছেন। শেষ যামানায় তারা তার বের হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত অবস্থা এবং চূড়ান্ত নৈরাশ্য।

এই পৃষ্টাতে একটু সামনে তিনি লেখেন, পূর্বদিগন্তের লোকেরা তার সঙ্গ দিবে এবং রক্ষনাবেক্ষন করবে। তার হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের পতাকাও কালো রঙ্গের হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডাও কালো ছিলো। যাকে 'আল

উকাব' বলা হতো। সারকথা হলো, ইমাম মাহদীর প্রকৃত প্রকাশ পূর্বদিকের দেশগুলোতে হবে এবং বায়আত নিবেন বায়তুল্লাতে। হাদীসের ভাষ্য এ ব্যাপারে সাক্ষি।

-আন নেহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/৫৫-৫৬।

ইবনে কাছীর রহ. ছাড়াও নুআঈম বিন হাম্মাদ রহ. কয়েকটি বাণী 'আল ফিতান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেগুলোতে ইমাম মাহদী খুরাসান এবং কুফাতে থাকার আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু সনদের দিক থেকে সেগুলো দূর্বল।

ইমাম মাহদীর সময়কাল

ইমাম মাহদী কতদিন হুকুমত পরিচালনা করবেন? এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে সাত অথবা নয় বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

১. ততদিন কেয়ামত আসবে না, যতদিন আমার পরিবারভূক্ত একজন হুকুমত করবে। সে চওড়া কপাল ও খাড়া নাক বিশিষ্ট হবে। পৃথিবীকে আদল ও ইনসাফ দিয়ে ভরে দিবে, যেমন আগে তা জুলুম দ্বারা ভরপুর ছিলো। সে সাত বছর থাকবে।

-মুসনাদে আহমদ। মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী এটি সহীহ। তবে সাত বছরের কথাটি ব্যতিত।

২. মুসতাদরাকে হাকিম এর বর্ণনাতে, তিনি সঠিক ভাবে মাল দিবেন, দ্রুত হাটবেন এবং উম্মতকে সম্মানিত করবেন। তিনি সাত অথবা আট বছর অর্থাৎ কাছাকাছি সময় অবস্থান করবেন।

-হাকিম রহ. এটিকে সহিহ সনদ বিশিষ্ট বলেছেন। হাফেজ যাহাবী রহ. তাকে সত্যায়ন করেছেন।

এই হাদীসে সাত থেকে নয় বছর ইমাম মাহদীর সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. আমার উম্মতের মধ্যে মাহদী হবেন। যদি কম সময় অবস্থান করেন, তাহলে সাত অথবা আট অথবা নয় বছর।

-তিবরানী ফিল আওসাত, তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, মাজমাউয যাওয়াইদ।

৪. নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে মাহদী হবেন। তিনি পাঁচ বছর জীবিত থাকবেন। অথবা সাত অথবা নয়।

-তিরমিযী শরীফ, আলবানী বলেন, এটি হাসান (উত্তম)।

৫. আমার উম্মতের মধ্যে মাহদী হবেন। কমপক্ষে সাত অথবা নয় বেঁচে থাকবেন।

-ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকিম, আলবানী বলেন এটি হাসান।

৬. খলীফার মৃত্যুর সময় মতানৈক্য হবে। পৃথিবীতে ইসলাম শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ এমতাবস্থায় সাত বছর অতিবাহিত করবে অথবা নয় বছর বলেছেন।

-তিবরানী ফিল আওসাত, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মতই, মাজমাউয যাওয়াইদ, মুসনাদে আবু ইয়ালা হাদীস নং-৬৯৪০।

ইমাম মাহদীর দোস্ত

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা রহ. বলেন, আমরা আলী রা. এর নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে মাহদীর ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, হায় আফসোস! তারপর তিনি নিজের হাতে বন্ধুত্বের চিত্র বানালেন। তারপর বললেন, তিনি শেষ যামানায় আসবেন। যখন মানুষ আল্লাহ আল্লাহ বললে কতল করে দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে এমন লোক একিত্রত করবেন, যারা মেঘমালার মতো বিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরে মহব্বত পয়দা করে দিবেন। তাঁরা কাউকে পর মনে করবে না। কারো উপর রাগান্বিতও হবে না। তাদের মধ্যে বদরের সমানসংখ্যক লোক শামিল হবে। তাঁদের আগের লোকেরাও মর্যাদায় তাঁদের সমান হতে পারবে না, তাঁদের পরের লোকেরাও তাঁদের সমান হতে পারবে না। তাঁরা তালুতের সাথীদের সমান হবেন। যাদেরকে নিয়ে তালুত নদী পার হয়েছিলেন। আবু তুফাইল বলেন, ইবনে হানাফিয়্যাহ জানতে চাইলেন আপনি কি তাঁদেরকে চান? আমি বললাম, হ্যাঁ।

-এটি ইমাম হাকিম রহ. মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন এবং বলেন, এটি শায়খায়নের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ.ও এ ব্যাপারে একমত পোষন করেছেন।

ইমাম মাহদীর ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন

ইমাম মাহদী এবং দাজ্জালের ব্যাপারে হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করার পর পাঠকদের অন্তরে কিছু প্রশ্ন জন্ম নেয়। যেমন,

১. সহীহ হাদীসে এসেছে, ইমাম মাহদীর যুগে মুসলমান খুব ভালো অবস্থায় থাকবে। তিনি মানুষদের মধ্যে মুষ্ঠি ভরে ভরে ধন বন্টন করবেন। অথচ সহীহ হাদীসে এ কথাও আছে যে, দাজ্জালের সময় দুনিয়ার সকল মাধ্যম দাজ্জালের হাতে থাকবে। যে তার কথা মেনে নিবে তাকে তার জান্নাত দিবে। আর যে তার কথা মানবে না তাকে জাহান্নামে ফেলে দিবে। নিজের দুশমনদের ফসল, পশু এবং মাল ধ্বংস করে দিবে। বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। যমীন বাঁজা হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ'দুটি কথার মধ্যে বৈপরিত্য মনে হচ্ছে।

২. যারা ইমাম মাহদীকে প্রথম দেখেই চিনে নিবেন, বাহ্যিক আকৃতি দেখেই চিনবেন। কারণ, হাদীসে এসেছে তারা ইমাম মাহদী আ.কে তার নাম এবং বংশ জিজ্ঞেস করবেন। এখানে যদি বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অবস্থা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এমনতো অনেক লোকেরই হয়। যেমন, উঁচু নাক এবং চওড়া কপাল। যেখানে লাখো লোকের অবস্থান হবে সেখানে এই আকৃতির লোক অনেক থাকবে। জিহাদের ময়দানের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে এমন অনেক উলামায়ে কেরামের মত হলো, ইমাম মাহদী তাদের সাথে জিহাদের ময়দানে হবেন। তারা তাঁকে মুজাহিদ হিসেবে চিনবেন। তবে প্রথমে তিনি মাহদী হওয়ার কথা কেউ জানবে না। যখন মুজাহিদীনের কঠিন অবস্থা আসবে এবং তাদের নেতৃত্ব একের পর এক শহীদ হতে থাকবেন, এমনকি বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বগুলোও শাহাদাত বরণ করবেন, তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থানরত উলামায়ে হকের দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা এমন একজন পুরাতন সাথীর উপর নিবদ্ধ করবেন, যাকে তারা তাদের আমীর নিযুক্ত করবেন। প্রথম প্রথম তিনি হাশেমী হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুজাহিদ উলামায়ে কেরামের এই বিশ্বাস হয়ে যাবে যে তিনি-ই শেষ যামানার মাহদী। সুতরাং তাঁকে বায়আতের জন্য রাজি করাবে। কোনটি সত্য?

উত্তর-১ ইমাম মাহদীর যুগে প্রশস্তা এবং দাজ্জালের যুগে সংকীর্ণতার কথা হাদীসে পড়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও বাস্তবতা এমন নয়। সহীহ হাদীসে ইমাম মাহদীর যুগে প্রশস্তার সময়কাল সাত অথবা

আট অথবা নয় বছরের কথা এসেছে। এরপর পেরেশানীর যুগ শুরু হয়ে যাবে।

মুসনাদে আহমদ রহ. এর বর্ণনা, ... সুতরাং এমনটি থাকবে সাত, আট অথবা নয় বছর। তারপর জীবন যাপনে কোনো কল্যাণ থাকবে না।

-মুসনাদে আহমদ।

তিবরানীর বর্ণনা, মাল বন্টন করা হবে, ইসলাম শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলমান এমতাবস্থায় সাত বছর বসবাস করবে।

-তিবরানী শরীফ, আল্লামা হায়ছামী রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মতোই।

এই প্রশস্ততার যুগ কখন থেকে শুরু হবে? উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, সুফিয়ানী পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলাম এবং মুসলমানদের ভালো অবস্থা শুরু হয়ে যাবে।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, খলীফার মৃত্যুর পর মতানৈক্য শুরু হবে। বনী হাশিম গোত্রের এক লোক (লোক তাকে খলীফা বনিয়ে দিবে এই ভয়ে) মদীনা থেকে মক্কা চলে যাবে। মানুষ তাঁকে (শেষ যামানার মাহদী হিসেবে চিনে) ঘর থেকে বের করে আনবে। হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহিমের মাঝখানে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলাফতের বায়আত করবে। (তাঁর খেলাফতের বায়আতের সংবাদ শুনে) শাম থেকে এক সৈন্যদল তার মুকাবেলার জন্য রওয়ানা হবে। এই বাহিনী যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছবে তখন তাদেরকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তার কাছে ইরাকের আওলিয়ায়ে কেরাম এবং শামের আবদালগণ উপস্থিত হবেন। পুনরায় শাম থেকে এক লোক বের হবে। যার জন্ম কালব গোত্রে হবে। সে তার সৈন্যদল নিয়ে (বনী হাশেমের) সেই লোকের বিরুদ্ধে মুকাবেলা করতে রওয়ানা হবে। আল্লাহ তা'আলা তার বাহিনীকে পরাজিত করবেন। যারফলে তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। এটাই কালবের যুদ্ধ। সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলো, যে কালব যুদ্ধের গণিমত থেকে বঞ্চিত থাকলো। তারপর তিনি (মাহদী) খাযানা খুলে দিবেন এবং মাল বন্টন

করবেন। ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে এমতাবস্থায় সাত অথবা নয় বছর থাকবে।

-তিবরানী ফিল আওসাত। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ। মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/৩১৫। আল মাজমাউল আওসাত ২/৩৫, মুসনাদে আবি ইয়ালা:৬৯৪০, ইবনে হিব্বান:৬৭৫৭, আল মাজমাউল কাবীর:৯৩১।

আর দাজ্জাল দুনিয়াতে অবস্থানকালীন সময় হবে ৪০ দিন। যা ১ বছর ২ মাস এবং প্রায় ১৪ দিনের সমান হবে। দাজ্জালের এই সময়টুকুই মুসলমানের জন্য কঠিনতম পরীক্ষার সময় হবে। হাদীসসমূহের আলোকে এতটুকু বলা যেতে পারে, যে বের হওয়ার তিন বছর আগে থেকেই পরীক্ষার ভূমিকা শুরু হয়ে যাবে। এই হাদীসসমূহের আলোকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ইমাম মাহদী শুরুর দিকেই বড় বড় বিজয় অর্জন করে নিবে। যারপর মুসলমানদের প্রশস্ততার যুগ শুরু হয়ে যাবে। আর এই যুগ ৫-৯ বছর স্থায়ী হতে পারে। তারপর কঠিন অবস্থা শুরু হয়ে যাবে। মুসলমান এবং মুনাফিক পৃথক পৃথক হতে শুরু করবে। সহীহ হাদীসে এটাই এসেছে যে, দাজ্জাল আসার আগে মুসলমান এবং মুনাফিক পৃথক হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঈমানদারদের একদল, যাতে বিন্দুমাত্র নেফাক থাকবে না। মুনাফিকদের একদল, যাতে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে না।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে, ইমাম মাহদীর যুগে তুমুল যুদ্ধসমূহ হতে থাকবে। এমনকি হাদীসে বর্ণিত সেই যুদ্ধও হবে, যাকে হাদীসে 'মালাহামাতুল কুবরা' অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ যাতে শতকরা ৯৯ জন মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে। যুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মুসলমান প্রশস্ততা এবং নিরাপত্তায় জীবন কাটাতে পারে?

এর জবাব হলো, সহীহ হাদীস অনুযায়ী সুফিয়ানী সেনাবাহীনির পরাজয়ের পর মুসলমানদের প্রশস্ততার যুগ শুরু হয়ে যাবে। আর বিশ্বযুদ্ধ বা মালহামাতুল কুবরা হবে দাজ্জাল আসার এক বছর আগে। এই বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও যদি তখন যুদ্ধ হয়, তাহলে তা নিরাপত্তা বা প্রশস্তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, বিজয়ী জাতি যুদ্ধ করার সাথে সাথে নিজ নিজ এলাকায় নিরাপত্তা এবং প্রশস্ততাকে সহজেই প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে।

ইতিহাসে এর সবচেয়ে বড় উপমা হলো, আমিরুল মুমিনীন উমর ফারুক রা. এর খেলাফতকালে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে যেতে থাকেন, সেই সাথে ইসলাম এবং মুসলমান শক্তিশালীও থাকে আবার প্রশস্ততার সাথেও থাকে।

আরো একটি প্রশ্ন মনে আসে যে, এই যুদ্ধ তো হেজাজ এবং শামে হবে। সুতরাং এর ফলশ্রুতিতে বেশি থেকে বেশি হেজাজ এবং আরব ভূমিতে ইমাম মাহদী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। অথচ ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ইত্যাদির কী অবস্থা হবে? এই দেশগুলোর মুসলমানরাও ইসলামী খেলাফতে ছায়ায় প্রশস্ততার জীবন যাপন করবে?

এর জবাব সেসব হাদীসে পাওয়া যায়, যেসব হাদীসে উল্লেখিত ভূখণ্ডগুলোর বিজয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন ইমাম মাহদীর সংরক্ষনের জন্য পূর্বদিকের দেশগুলো অর্থাৎ খোরাসান থেকে উঠে আসা কালো পতাকাওয়ালা বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায় যে, এসব এলাকা মুজাহিদীনের দখলে থাকবে। আর হিন্দুস্তান বিজয়ের সুসংবাদও হাদীসে নববীতে বিদ্যমান আছে। মুজাহিদীনের সৈন্যদল হিন্দুস্তানকে ইমাম মাহদীর খেলাফতের অধীনে নিয়ে আসবে এবং সেখানেও মুসলমানরা প্রশস্ততার জীবন যাপন করবে। ইমাম মাহদীর ব্যাপারে যদিও হাদীসে আরবের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনারবকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এক হাদীসে আছে, 'ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতদিন আমার বংশের এক লোক গোটা আরবে রাজত্ব করবে। আমার নামেই তার নাম হবে।' এই হাদীসের ব্যাখ্যায় 'তুহফাতু বিয যাল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লামা তিবী রহ. বলেন, এখানে অনারবের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা অনারবও উদ্দেশ্য। কারণ, যখন ইমাম মাহদী আরব দেশগুলোতে রাজত্ব করবে, সকল মুসলমানের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা এক হবে এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হবে তখন সকল জাতির উপর তারা বিজয়ী হবে। এই কথার সত্যায়ন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রা. এর হাদীস থেকেও হয়। যাতে উল্লেখ আছে, 'মাহদী মুসলমানদের মধ্যে নিজের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সুন্নত বাস্তবায়ন করবে। পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী হবে। সে সাত বছর থাকবে।'

এ ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবত এজন্যই শুধু আরবের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তখন তিনি আরবে বিজয়ী থাকবেন অথবা আরবের মুসলমানদের মধ্যে তিনি সম্মানিত থাকবেন। অথবা সংক্ষিপ্ততার জন্য শুধু আরবের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এর দ্বারা আরব আজম দুটোই উদ্দেশ্য। কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হলো, আরবের কথা এজন্যই উল্লেখ করা হয়ে যে, আজমী মুসলমানরা ইসলামের ক্ষেত্রে আরবীদের অনুসরণ করে থাকে।

-তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৪০২।

উত্তর-২ দ্বিতীয় প্রশ্ন ইমাম মাহদী খোরাসান অথবা জিহাদের ময়দানে থাকার ব্যাপারে। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রহ. এর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও নুআঈম বিন হাম্মাদ রহ. 'আল ফিতান' গ্রন্থে কয়েকটি বাণী উল্লেখ করেছেন। যেগুলোতে ইমাম মাহদী জিহাদের ময়দানে হওয়ার কথা জানা যায়। বর্তমান মুজাহিদীন উলামায়ে কেরামের মত অনুযায়ী যাঁরা ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত নিবেন তাঁরা ইমাম মাহদীকে পুরাতন মুজাহিদ হিসেবেই চিনবেন। এটি মুজাহিদ উলামায়ে কেরামের মত। হাফেজ ইবনে কাছির রহ. এর কথাও এই মতের সত্যায়ন করছে। এতটুকু কথা অবশ্যই বুঝে আসে যে, ইমাম মাহদীকে সেসব হক উলামায়ে কেরামই তালাশ করবেন যারা কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে দীনকে দুনিয়াতে বিজয়ী করার বিশ্বাস পোষণ করেন। সেসব উলামায়ে কেরাম কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর দুশমনদেরকে পরাজিত করার আকাঙ্খী হবেন।

ইমাম মাহদীর সংরক্ষনে পূর্বদিক থেকে আগত কালো পতাকা

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর বাণীর সংখ্যা তো অনেক। সেগুলোর মধ্যে দূর্বল বর্ণনাও রয়েছে আবার সহীহ বর্ণনাও রয়েছে। তারপরও কিছু লোক তা অস্বীকার করে। তাদের অস্বীকার কেবলই অজ্ঞতা, গোঁড়ামী এবং জীদের দরুন। তারাই সেই

লোক যারা ইমাম মাহদীকে অস্বীকার করে। তাদের নিকট ইলমী কোনো দলীল নেই। তারা উসূলে হাদীসকে একদিকে ফেলে কেবলই এই জীদের উপর বসে আছে যে, ইমাম মাহদীর ব্যাপারে সকল হাদীস দূর্বল। যারা জীদ করে বসে এবং বলে যে 'আমি মানবো না' তাকে আপনি কিভাবে মানাবেন? অস্বীকারকারীরা ঈসা বিন মারইয়াম আ. এর আগমনকেও অস্বীকার করে। তাছাড়া দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকারকারীও এই যুগে বিদ্যমান।

এই কালো ঝাণ্ডার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, কালো ঝাণ্ডাবাহীরা সেসব লোক হবে যারা ইমাম মাহদীর সাথে থাকবেন। ইমাম মাহদীর নিজস্ব ঝাণ্ডাও কালো হবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডাও কালো ছিলো। যাকে উকাব বলা হতো। খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. তা পূর্ব দামেস্কে 'সানিয়্যাহ' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই জায়গাকে আজও 'সানিয়্যাতুল উকাব' বলা হয়। এই ঝাণ্ডা রোম এবং আরবের কাফেরদের জন্য আযাব স্বরুপ ছিলো।

-আন নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/১৭।

খোরাসান থেকে উঠে আসা কালো পতাকার ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহ

১. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের ধন ভাণ্ডার নিয়ে তিন ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তিনজনই খলীফার সন্তান হবে। তাদের কেউ এই ধনভাণ্ডার পাবে না। তারপর খোরাসান থেকে কালো ঝাণ্ডা প্রকাশ হবে। তারা তোমাদের সাথে এমন যুদ্ধ করবে যেমনটি ইতিপূর্বে কোনো কওম করেনি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বয়ান করলেন। তারপর বলেন, যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে তাদের হাতে বায়আত হয়ে যাবে। যদিও বরফের উপর হামাগুরি দিয়ে চলতে হয়। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহদী হবেন।

এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ হাদীস। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত।

-আল মুসতাদরাক আলাস সহীহায়নে লিল হাকিম মাআ তালিকাতিয যাহাবী ফিত তালখীস ৪/৫১০।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহ., ইমাম আহমদ রহ., এবং ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. এই হাদীসটি নিজের সনদে বর্ণনা করে বলেন, এই সনদটি শক্তিশালী এবং সহীহ।

-আন নিহায়া ফিল ফিতান।

আল্লামা বুসিরী রহ. বলেন, এটি সহীহ সনদ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. বলেন, এই হাদীসটির অর্থ সহীহ। তবে 'তিনি আল্লাহর খলীফা মাহদী' এই কথাটি ছাড়া। এর সনদ হাসান (উত্তম)।

-সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়ালা মাউযুআহ।

২. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, সেখান থেকে এক কওম আসবে, এ কথা বলে তিনি খোরাসানের দিকে ইশারা করেন। তাদের ঝাণ্ডা হবে কালো। হক (খেলাফত) প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। কিন্তু (আরবের শাষকগোষ্ঠী) তারা দিবে না। দুই অথবা তিনবার এমন হবে। সুতরাং তারা কিতাল করবে। সুতরাং তাদের সাহায্য করা হবে। তারপর তারা (আরবরা) তাকে খেলাফত দিবে। কালো ঝাণ্ডাবাহীরা তা গ্রহণ করবে না। যতক্ষন না আমার পরিবারভূক্ত একজনকে খেলাফত দেয়া না হবে। সুতরাং সে পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে। যেমন আগে জুলুম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে পেলে অবশ্যই তাদের সাথে এসে যাবে। যদিও বরফের উপর হামাগুরি দিয়ে চলতে হয়।

-এটি বর্ণনা করেছেন, আবু আমর দানী। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ হাসান মুহাম্মাদ হাসান শাফেয়ী বলেন, এটি সহীহ হাদীস। এটি ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেন।

৩. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনু হাশেমের কিছু নও জোয়ান আসলো। তিনি যখন তাদেরকে দেখলেন, তখন তাঁর চোখ মুবারক লাল হয়ে যায় এবং চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা আপনার চেহারায় অপছন্দনীয় কিছুর ছাঁপ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার পরিবারের জন্য দুনিয়ার মুকাবেলায় আখেরাতকে পছন্দ করেছেন। আমার পর আমার পরিবারকে বিভিন্ন কষ্ট এবং দেশান্তরীন করা হবে। একপর্যায়ে খোরাসান থেকে কিছু লোক আসবে। যাদের সাথে কালো ঝাণ্ডা থাকবে। তারা হক (খেলাফত) চাইবে। তারা (বনু হাশেম) তাদেরকে তা দিবে না। যারফলে তারা কিতাল করবে। তাদেরকে সহযোগীতা করা হবে। তারপর তাদেরকে কিছু অংশ দিবে। কিন্তু তারা তখন তা গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা তা আমার পরিবারভূক্ত একজনকে দিয়ে দিবে। সে পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা এমন ভাবে ভরপুর করে দিবে যেমন ভাবে আগে তা জুলুম দ্বারা ভরপুর ছিলো। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি কালো ঝাণ্ডাবাহীদের পাও, তাহলে তাদের সাথে চলে যেও। যদিও বরফের উপর হামাগুরি দিয়ে যেতে হয়।

-ইবনে আবি শায়বা:৩৭৭২৭, নুআঈম বিন হাম্মাদ ফিল ফিতান, ইবনে মাজাহ:৪০৮২, আবু নাঈম:২৭।

আল্লামা বুসিরী রহ. যাওয়ায়েদ:১৪৪১ এর মধ্যে বলেন, এই সনদে ইয়যিদ বিন আবি যিয়াদ কুফী সমালোচিত। কিন্তু এতে যিয়াদ বিন আবি ইয়াযিদ একা নয় বরং এই হাদীস ইমাম হাকিম রহ. মুসতাদরাকের মধ্যে ইবরাহিম থেকে হাকাম এবং হাকাম থেকে আমর বিন কায়স এই সনদে বর্ণনা করেন। আল্লামা বুসিরী রহ. মুসতাদরাকে হাকীমের যেই সনদের দিকে ইশারা করেছেন তাকে হাফেয যাহাবী রহ. বানোয়াট বলেছেন। কিন্তু শায়খ আহমদ আল গামারী রহ. 'আবরাযুল অহমিল মাকনুন' গ্রন্থে এই হাদীসকে হাসান (উত্তম) বলেছেন এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ, হাফেজ যাহাবী রহ. এর কথার জবাবে বলেছেন এই হাদীস বানোয়াট নয়। কেননা এতে এমন কোনো বর্ণনাকারী নেই যে মিথ্যুক এবং জালকারী। তাছাড়াও এই হাদীসের আরো সনদ রয়েছে। আশ্চর্যের কথা হলো, এই সনদেই হাকিম রহ. অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকে হাকিম রহ. বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং হাফেজ যাহাবী রহ.ও সেটি গ্রহণ করেছেন।

-আল উরফুল অরদী ফী আখবারিল মাহদী মাআ তাহকীকে শায়খ আবু ইয়ালা বায়যাবী।

৪. ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত, কালো ঝাণ্ডা খোরাসান থেকে আসবে। তাদের নেতৃত্ব এমন লোকের হাতে থাকবে যারা ঝোল পরিহিত খোরাসানী উটনীর ন্যায় হবে। বাবরী ওয়ালা হবে। তারা গ্রাম্য বংশের হবে। তারা উপনামে প্রশিদ্ধ হবে। তারা দামেস্ক শহর জয় করবে। তিন ঘন্টা তাদের থেকে রহমত দূরে থাকবে।

-এটি নুআঈম বিন হাম্মাদ ফিতান গ্রন্থে আমর বিন শোআইব থেকে সে তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন ১/২০৬।

আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা আমেরিকার মুকাবেলায় তালেবানদেরকে বড় বিজয় এবং সফলতা দান করেছেন। শক্তির নেশায় মত্ত আমেরিকা সহায় সম্ভলহীন তালেবান মোল্লাদের সামনে এখন নিরুপায়। নূরীস্থান থেকে সরহদী পর্যন্ত ঘাটিগুলো খালি করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পকিস্তানের সাথে মিলে আমেরিকা হেরে যাওয়া যুদ্ধ জিততে চাচ্ছে। পাকিস্তানে অবস্থিত আমেরিকান দালালরা, আমেরিকানদেরকে এই বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যেভাবে সোয়াত এবং উপজাতি কবিলাগুলোতে বিজয়ী হয়েছে তেমনি ভাবে আফগানিস্তানেও আমেরিকাকে এই যুদ্ধে বিজয়ী করতে পারবে। সুতরাং একদিকে পাকিস্তানে কিছু তালেবান নেতার গ্রেফতার এবং অপরদিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতাকে আমেরিকা কর্তৃক সাদরে গ্রহণ করা, ভবিষ্যতের অবস্থা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। আমেরিকা তাদের নামধারী মুসলমান বন্ধুদের সাথে মিলে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর দা. বা. এর মুকাবেলায় এমন কিছু তালেবানকে সাথে নিতে চাচ্ছে যারা ইসলামী ইমারতের মিশন থেকে হাত ধুয়ে গণতন্ত্রের সাথে মিশতে পারে। এজন্য নিশ্চয় খুব চেষ্টা তদবীর চলছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করনেওয়ালাদের এসব কথা থেকে হুঁশিয়ার তো অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু পেরেশান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি তালেবান নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ কমাণ্ডারগণ জিহাদ ছেড়ে আমেরিকার টার্গেটের উপর রাজি হয়ে

যায়, তাহলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে? নির্দিষ্ট জিম্মাদারদের সাথে কি হক সীমাবদ্ধ? যদি তারা জিহাদ করে তাহলে জিহাদ হক আর যদি তারা জিহাদ ছেড়ে গণতন্ত্রের সাথে মিশে যায়, তাহলে গণতন্ত্র হক হয়ে যাবে? কখনোই এমন নয়। আফগানিস্থানে যারা ইসলামী হুকুমত ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করছে, তারা ততোদিন পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত বিজয় না আসবে অথবা শাহাদাতের পিয়লা পান করে আপন রবের সাথে মিলিত হবে। আর যারা হকের পথ ছেড়ে বাতিলের সাথে মিলবে তারা আল্লাহর দীনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। জয়-পরাজয় আল্লাহ তা'আলার হাতে। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কবে হকপন্থীরা বিজয়ী হবে। কিন্তু যে কথা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, সর্বাবস্থায় হকপন্থীদের সঙ্গ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশা বিজয় খুবই সন্নিকটে।

ইয়ামানবাসী আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, (ইয়ামানের) আদনে আবইয়ান থেকে ১২ হাজার লোক বের হবে, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সাহায্য করবে। তারা আমার এবং তাদের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম হবে।

-মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল। হায়ছামী রহ. বলেন, এটি আবু ইয়ালা এবং তিবরানী বর্ণনা করেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ। তবে মুনযিরুল আফতাস নির্ভরযোগ্য। -মাজমাউয যাওয়ায়েদ। আলবানী রহ. 'সিলসিলাতুস সহীহা' গ্রন্থে বলেন, এটি সহীহ হাদীস।

ফায়দাঃ- আদনে আবইয়ান দক্ষিন ইয়ামানের উপকুলীয় শহর। বর্তমানে যা 'আদন' নামে প্রশিদ্ধ। ইয়ামানবাসীর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ-ও করেছেন।

আফগান এবং ইরাকের পর আমেরিকা ইয়ামানেও অপারেশন শুরু করতে চায়। আপনি দেখুন! সেসব জায়গাতেই ইহুদী আমেরিকী সেনা পাঠাচ্ছে, যেসব জায়গা থেকে ইমাম মাহদীর সংরক্ষনে মুজাহিদীন আসবে।

ইরাক যুদ্ধ

আবু যায়েরা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. এর সামনে দাজ্জালের আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, দাজ্জালের সময় মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল তার সাথে থাকবে। (একদল ঘাস জন্মানোর জায়গায় নিজের পরিবারের লোকদের সাথে মিশে যাবে।) অপরদল এই ফুরাতের তীরে স্থীর হয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সাথে এবং তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। (লড়াই করতে করতে সামনে বাড়তে থাকবে।) পশ্চিম শামেও যুদ্ধ করবে। তারপর তারা একটি উপদল পাঠাবে যাদের মধ্যে ডোরাকাটা রঙ্গের ঘোড়া থাকবে। তারা সেখানে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্য থেকে কেউ-ই ফিরে আসবে না।

-মুসতাদরাক আলা সহীহায়নে ৪/৬৪১।

বি.দ্র. এই হাদীস 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরবীতে ভুল ছিলো ফলে অনুবাদেও ভুল হয়েছিলো। এখানে সেগুলো আরবী এবং অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। সকলেই তা ঠিক করে নিবেন।

আমেরিকার কর্মপদ্ধতি এবং কিছু হুঁশিয়ারী

আমেরিকা যেখানেই সেনা অভিযান শুরু করে, সেই দেশে এমন কিছু লোক তালাশ করে যারা তাদের হয়ে কাজ করবে। সাধারণত সেখানকার সংখ্যালঘুরা তাদের জন্য অধিক উপকারী এবং কিছু কারণে খুব সহজেই ব্যবহারের উপযোগী হয়। সুতরাং তাদের জন্য বড় বড় ফান্ড চালু করে এবং তাদের শক্তিগুলোকে মজবুত করা হয়। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের সিংহাসন উল্টানোর জন্য ইরাকের সংখ্যালঘু রাফেজীদেরকে শক্তিশালী করা হয়। আমেরিকা শিয়া সুন্নী দ্বন্দ দিয়ে খুব ফায়দা উঠায়। শিয়া জনগোষ্ঠী থেকে কিছু ওয়াদা নেয়ার পর আমেরিকা তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের জন্য ব্যবহার করে। শিয়া জনগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যুদ্ধে এ কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে যে, তারা আমেরিকাকে সঙ্গ দিয়ে কতো বড় ভুল করছে। কিন্তু ঐতিহাসিক গোঁড়ামী এবং নেতৃত্বের

নেশা মানুষকে এমন অন্ধ করে দেয় যে, সিংহাসন ছাড়া অন্য কিছু তার দৃষ্টিতে আসে না।

ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য মজলিসে আ'লা যা 'তানযিমে বদর' নামে প্রশিদ্ধ

এটি প্রথমে আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকের হাকীম ইরানে প্রতিষ্ঠা করেছিলো। মুহাম্মাদ বাকের হাকীম সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনীতে ছিলো। কিন্তু ১৯৮০ সালে ইরাক ইরান যুদ্ধে ইরাক থেকে পালিয়ে ইরান চলে যায়। ইরানে মুহাম্মাদ বাকের হাকীম ইরানী গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ট্রেনিং সেন্টার চালাচ্ছিলো, যাতে ইরাকে রাফেজীদেরকে সুসংগঠিত করা যায়। ইরাকের উপর আমেরিকার দখলদারীর পর আমেরিকার সেনাবাহিনী একটি চুক্তি সাপেক্ষে তাকে ইরাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলো। আমেরিকা তাকে ইরাকী নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সাথে মিশিয়ে দেয়। যারফলে সে এই হুকুমতের উচ্চপদে পৌছতে সক্ষম হয়। এমনকি সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পেয়ে যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দয়িত্ব পাওয়ার পর সে একটি সংগঠন তৈরি করে। যাদের কাজ হলো সুন্নী উলামায়ে কেরামকে কতল করা, মসজিদের ইমাম, ডাক্তার এবং ব্যবসায়ীদেরকে অপহরণ করা। যিন্দান খানায় কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করা। তারপর দূরের কোনো এলাকায় লাশ ফেলে চলে যাওয়া। পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগে সুন্নীদেরকে মুজাহিদদের সহযোগী বলে গ্রেফতার করা। ইরাক ইরান যুদ্ধে যেসব অফিসার সামনে সামনে ছিলো, সেসব অফিসারদেরকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা।

ইরাক থেকে সুন্নীদের নিঃশেষ করা

এটি এমন এক তিক্ত সত্য, যা আজ আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে। ইহুদী এবং ইসলামের অন্যান্য দুশমন শক্তিগুলো সুন্নী এবং শিয়া জনগোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে দেখে। এমনিতেই তো গোটা ইসলামী ইতিহাস এ ব্যাপারে সাক্ষি। তারপরও ইরাকে যা কিছু আমেরিকানরা

করিয়েছে, এতে সকলেরই চোখ খোলে গেছে। এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ছিলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। এ ব্যাপারে আমেরিকা ইরানের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগীতা পেয়েছিলো। আর এজন্যই ইরান থেকে আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকের হাকীমকে তার সশস্ত্র রাজাকারসহ ইরাকে পাঠানো হয়েছে। এই পরিকল্পনার অধীনে সুন্নী আবাদীগুলোতে জাহাজ এবং হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করে বিরানভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। যারা বেঁচে গেছে তাদেরকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। ব্লাক ওয়াটারের সাথে মুহাম্মাদ বাকের হাকীমের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে সুন্নীদের মহল্লায় হামলা করা হয়। আবাদীগুলো এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় যে, পিছনে কান্না করার মতও কেউ বাকি থাকেনি। বাগদাদ, ফালুজাহ, তালা'অফার, মোসেল, সামারা, রামাদি এবং বসরায় সাংবদিক লেখকরা এমন গণহত্যা দেখেছে, যা অমুসলিমরাও সহ্য করতে পারে না। যারফলে আমেরিকান লেখক ষ্টীফেন, রাফেজীদের অপরাধের মুখোশ খুলে দেয়। তার এই কলাম 'নিউ ইয়র্ক টাইমে' প্রকাশ হয়। সে তার কলামে ইরাকে সহযোগী বৃটেনের হুকুমত প্রধানকে দোষারোপ করে। কারণ সে-ই শিয়াদেরকে ইরাকী পুলিশে ঢুকিয়েছে। তার কলাম প্রকাশের চারদিন পর তার লাশ এক সড়কে পাওয়া যায়।

সুন্নীদের গণহত্যা এত বড় বাস্তবতা ছিলো যে, সেসব লোকও চিৎকার করে উঠে, যারা শিয়া সুন্নী দ্বন্দে বিশ্বাসী নয়। 'উলামায়ে ইসলাম' সংগঠনের মূখপাত্র তাকে গণহত্যা বলেছেন। এমনকি ইরাকী প্রেসিডেন্ট জালাল তালেবানী এবং কুর্দিস্তান প্রদেশের প্রধান মাসঊদ বারযানী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইবরাহীম জাফরীকে আরব সুন্নীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ বন্ধ করতে বলেন। আবু গরীব কারাগারের জুলুমের কিছু কাহিনী আপনারা শুনেছেন। কিন্তু ইরাকের কোনো সুন্নী যদি মুহাম্মাদ বাকের হাকীমের লোকদের হাতে গ্রেফতার হতো, তাহলে সে এই আকাঙ্খা করতো, হায় যদি আমাকে কোনো আমেরিকান সৈন্য নিয়ে যেতো। ব্লাক ওয়াটার বিভিন্ন রাফেজী গ্রুপকে ভাড়ায় নিয়েছে। যাদের মাধ্যমে এসব কিছু করা হয়েছে। যেহেতু তাদের প্রত্যেকটি সুন্নী ঘরের ব্যাপারে জানা

ছিলো, তাই তারা সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা-লুন্ঠনের বাজার গরম করেছে। ইসলামের এসব দুশমনদের চারিত্রিক অধঃপতন দেখুন, শুধু ফালুজা শহরে ১৪৯ সুন্নী যুবতীকে মসজিদে নিয়ে তাদের ইযযত লুট করেছে। এছাড়াও মসজিদ, মাদরাসা, সুন্নীদের বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র, কারখানা, সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। জুমার দিন মুসল্লি ভরা মসজিদের ছাদ, বারুদ লাগিয়ে মুসল্লিদের উপর ভেঙ্গে দিয়েছে। যিন্দানখানাতে বন্দী করে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরার উপর হাটানো হয়েছে। ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করা হয়েছে।

এসব কি দলীয় দাঙ্গা ছিলো?

সাধারণত মানুষ এসব লড়াইকে দলীয় দাঙ্গা বলে থাকে। অথচ ইরাকে যা কিছু হয়েছে তা দলীয় দাঙ্গা ছিলো না। নিয়মিত যুদ্ধ ছিলো। যা আমেরিকার পয়সা এবং অস্ত্রের সহায়তায় ইরাকী সুন্নীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য একের পর এক সেনাবহিনী সুন্নী আবাদীগুলোতে হামলা করতো। একটি দল আপনাকে দুশমন মনে করছে, সশস্ত্র হয়ে আপনার অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু আপনি এ কথা-ই বলছেন যে এটি দলীয় দাঙ্গার চক্রান্ত।

ব্লাক ওয়াটার এ্যাকশনে

ব্লাক ওয়াটারের ব্যাপারে 'বার্মোডা ট্রায়েঙ্গেল এবং দাজ্জাল' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের কর্মপদ্ধতি এবং ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে আলোচনা করবো। আপনি জানেন, ব্লাক ওয়াটার একটি পারিবারিক সেনাবহিনী। প্রশ্ন হতে পারে আমেরিকার শক্তিশালী সেনা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও একটি পারিবারিক সেনা বাহিনীর কী প্রয়োজন পড়লো? তারপর রাজনীতির ভিতর রাজনীতি করার অনুমতিদাতার শক্তি, কোন শক্তি? আমেরিকার প্রশাসন তাদেরকে আমেরিকান সেনাবাহিনী থেকেও বেশি স্বেচ্ছাচারিতা কার প্রভাবে দিয়েছে? ইয়র্ক প্রিন্সই আসল মালিক, নাকি

পর্দার আড়ালে কোনো গোপন অথচ খুবই শক্তিশালী কেউ বিদ্যমান? আপনি হয়তো ভাবছেন ডেক চিনি? কক্ষনোই নয়। ডেক চিনি কেবল সামনে ছিলো। সূতা অন্য কোথাও থেকে নাড়ানো হচ্ছে। সে যে-ই হোক, কিন্তু এতটুকু স্পষ্ট যে, তার সামনে আমেরিকান সংবিধান, আইন এবং পেন্টাগন খড়কুটা থেকে বেশি মর্যাদাবান নয়। এমন তো নয় যে, ব্লাক ওয়াটারের অবস্থান এমন এক সেনাবাহিনীর প্রথম পরীক্ষা যা প্রশাসন থেকে মুক্ত কোনো ব্যক্তির কমাণ্ডে চলে। যে পৃথিবীর সকল নিয়ম কানুন এবং নেতাদের উর্দ্ধে উঠে কেবলই নিজের গ্র্যান্ড মাস্টারের বিধি বিধানের পাবন্দি করছে?

পক্ষান্তরে পাকিস্তানে ব্লাক ওয়াটারকে আসতে দেয়া বিশ্বের নতুন চিত্রকে আরো স্পষ্ট করে তুলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্ব রাজনীতিকে দেখছে এবং বিশ্লেষণ করছে তা সম্ভবত অগভীর। আমরা যদি সকল বিষয়কে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করি, তাহলে প্রত্যেক বড় বিষয়ের পিছনে নেহায়তই গোপন হাত দেখতে পাই। উদাহরণত, ইরাকে আমেরিকার হামলাকে যদি স্বাভাবিক ভাবে দেখি, তাহলে আমাদের দৃষ্টি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের উপর গিয়ে থেমে যাবে। আর যদি এটিকে আরো গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করি, তাহলে বুশের পিছনে ডেক চিনির মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব দণ্ডায়মান দেখতে পাবো। যে এই মিশনকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য বুশের চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। বরং এমন বললে আরো উত্তম হবে যে, বুশকে এক দাবার ঘুটির ন্যায় ব্যবহার করেছে। কিন্তু যদি এরচেয়ে বেশি গভীরতার সাথে পর্যবেক্ষন করি, তাহলে ডেক চিনির পিছনে রক ফেলার্জকে দেখা যাবে। ইরাকের বিরুদ্ধে মূল হোতা তারাই। কিন্তু আপনি যখন রক ফেলার্জ, রুথ শিলার্ড অথবা সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, সকল নেতৃস্থানীয় ইহুদী শক্তিগুলোর ব্যাপারে অধ্যয়ন করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে, এসবগুলোর পিছনে এক ব্যক্তি আছে, যে তাদের চেয়েও শক্তিশালী। আর এসব ইহুদী শক্তিগুলো তাকে নিজেদের মুরুব্বী মনে করে চলছে। এমনটি একবার নয় বরং ইহুদীদের ইতিহাসে কয়েকবার হয়েছে। বিশেষত: ইহুদীদের নিজেদের সারিতে, ব্যবসা এবং রাজনীতিতে জন্ম নেয়া রাঘব বোয়ালদের

মধ্যে। সুতরাং কোনো কোনো বিশ্লেষক একীনের সাথে এ কথার বলেন যে, সেই গোপন ব্যক্তি 'কানা দাজ্জাল'। যে পর্দার আড়ালে থেকে এদের সবাইকে চালাচ্ছে। এই গোপন হাত পকিস্তানে কয়েকবার নড়াচড়া করেছে। বিশেষত পার্ভেজ মুশাররফের নেতৃত্বের উপর দখলদারিত্ব থেকে আজ পর্যন্ত। আপনি দেখুন, যখন পকিস্তানের ভিতর আমেরিকার বিরোধী শক্তিগুলো নড়েচড়ে উঠে, (যারা পাকিস্তানকে আমেরিকার যুদ্ধ থেকে বের করতে চায়) সবকিছু আমেরিকান এবং ভারতী দালালদের হাত থেকে বের হতে শুরু করে, ঠিক তখনই কিছু অদৃশ্য শক্তি মাঝখানে এসে সবকিছু আগের মতো করে দেয়। পূনরায় সবকিছু আমেরিকার মর্জি মতই হতে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দাবার ঘুটি সামনে দেখা যায়। কিন্তু সে কেবলই দাবার ঘুটি।

ব্লাক ওয়াটারের কর্মপদ্ধতি

যেকোনো দেশে নিজেদের টার্গেট ঠিক করার পর সেই দেশে নিজেদের দুশমনদের দুশমনের সাথে আঁতাত করে। সব ধরণের সহযোগীতার মাধ্যমে নিজেদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাকে সুসংগঠিত করে। দুশমনদের সকল স্তরের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের আবাদী কোথায় কোথায় বেশি, ব্যবসায়ী কেন্দ্রগুলো কোথায়, হুকুমতের কোন্ কোন্ স্থানে তাদের দুশমন আছে, এমনকি ঘরের তথ্যগুলোও সংগ্রহ করে যেমন, ঘরে সদস্য কতজন? প্রতিরক্ষার কী কী ব্যবস্থা আছে? কী কী অস্ত্র আছে? ইত্যাদি। পাকিস্তানে এসব তথ্য ব্লাক ওয়াটার সংগ্রহ করে ফেলেছে। যার সবচেয়ে বড় মাধ্যম মুশাররফের প্রতিষ্ঠিত 'নাদেরা'। এছাড়াও ব্যাংকের একাউন্ট সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে। উদাহরণত, লাহোরের এক বড় ব্যাংকে দিন দুপরে ব্লাক ওয়াটার আসে এবং ম্যানেজারসহ সকল কর্মচারিকে একদিকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়। তারপর তাদের লোক ব্যাংকের কম্পিউটারে বসে এবং সকল রেকর্ড কপি করে তাদের সাথে নিয়ে যায়। এমন শুধু একটি ঘটনা নয়। বরং গোটা পাকিস্তানে এমন ঘটনা অহরহ হর হামেশা ঘটছে। ইসলামাবাদের

মতো শহরে পুলিশদেরকে রাস্তায় শুইয়ে সবার সামনে মারা, নাকের উপর দাঁড়ানো সেনা সদস্যদের গালি গুলুজ করা, কোনো গাড়ি আগে চলে গেলে তাকে থামিয়ে প্রহার করা, জ্যামে আটকে পড়লে গাড়ি থেকে নেমে অস্ত্র দিয়ে সাধারন মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করা, বড় বড় ক্যান্টিনগুলো কোনো প্রকার চেক ছাড়া করাচী থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে ইসলামাবাদ পৌছা, নতুন নতুন আমেরিকান অস্ত্র পাঞ্জাব, করাচী, গলগত এবং সরহদের বিভিন্ন শহরে নিজেদের দুশমনদের দুশমনদের মধ্যে বিলি করা, প্রিয় মাতৃভূমিতে নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও উপরের কোথাও থেকে এই হুকুম এসেছে যে, মিডিয়াতে কোনো সংবাদ যেন না আসে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ভাষণ; 'পাকিস্তানে দলীয় দাঙ্গা লাগানোর জন্য পয়সা এবং অস্ত্র বিলি করা হচ্ছে' সংবাদ পত্রগুলোর শোভায় পরিণত হয়েছে। এই বন্টনকারী কে? কাদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছে? এগুলো বলার অনুমতি নেই।

পাকিস্তানে ব্লাক ওয়াটারের টার্গেট

আমরা তাদেরকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. সেসব উলামায়ে কেরাম, যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন।

২. পাকিস্তানে অবস্থানরত সেসব তালেবান, যারা সরাসরি আল কায়েদার পথের যাত্রী। মনে রাখা উচিত, ব্লাক ওয়াটার কেবল পেশওয়ার শহরে এখন পর্যন্ত এমন দশ জনেরও বেশি মুজাহিদীনকে ঘরে চাপা দিয়ে হত্যা করেছে।

৩. সেসব মুজাহিদীন, যারা তালেবানের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদেরকে সহযোগীতা করে।

৪. সেসব উলামায়ে হক, যাদের সম্পর্ক সেই চিন্তা চেতনার সাথে, যারা প্রত্যেক যুগে বিদেশী আক্রমণকারীদের সামনে মাথা ঝুকানোর পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করেছে। যাদের বংশ ধারা শামেলী মুজাহিদীনদের সাথে মিলেছে। ধারণা করা হচ্ছে (আল্লাহ যেন

ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেন) এই শ্রেণিকে গণহত্যা করা হবে। বিশেষত করাচীতে।

৫. সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগে সেসব লোক যারা এখনো তালেবানকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে।

৬. সেসব ব্যবসায়ী যারা দীনি চেতনা পোষণ করেন।

তাদের টার্গেটের তালিকা পড়ে পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা নিজের হেফাজত নিজের উপর ফরজ করেছেন। ইসলামের এসব দুশমনদের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতি নিন। পাকিস্তানের প্রত্যেক শহরকে তাদের জন্য ফালুজা বানিয়ে দিন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমান অবস্থা এবং আগামী দিনের টার্গেটই আগত দিনের অবস্থা বর্ণনা করছে। বিশেষত করাচীর রাস্তায় চলমান শিশুকেও আপনি জিজ্ঞেস করুন, করাচীতে কী হবে? তাহলে সেও আপনাকে পরিস্কার বলে দিবে।

ফুলই কেবল জানে না, বাগান তো সবই জানে।

যদি আপনি আপনার ইযযত-দৌলত, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, দেশ এবং সবচেয়ে বড় আপনার দীনকে বাঁচাতে চান, তাহলে আক্রমণকারী দুশমনের মুকাবেলায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন। আর যদি আপনি আপনার ফুলসজ্জার মহলকে ফালুজা, তালা'অফার, বাগদাদ এবং রামাদীর পরিণতি বরণ করতে দেখতে না চান, তাহলে এখনই হুঁশিয়ার হয়ে যান। অন্যথায় স্মরণ রাখবেন, লেখকের কলম সেসব দৃশ্য লেখতে অপারগ হয়ে যাবে। পাকিস্তানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ঘৃণা, ইরাকী মুসলমানদের চেয়েও বেশি। জি হ্যাঁ! বসনিয়াবাসী থেকেও বেশি। কথা তো অনেক আছে। কিন্তু এখন কাজের সময়। যদি আপনার দেশের প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকে, আপনার দীনের প্রতি আপনার মহব্বত থাকে, আপনার ব্যবসা যা আপনি দিন রাত মেহনত করে দাঁড় করিয়েছেন, স্ত্রী-সন্তান যারা আপনার গোটা যিন্দেগীর মূলধন, সকলের হেফাজতের জন্য আপনাকেই দাঁড়াতে হবে। নিচে কিছু সহজ টিপস উল্লেখ করা হয়েছে,

এগুলো তাদের জন্য যারা বাঁচতে চায়। আর যারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের ব্যাপারে আর কী বলবো? আপনার প্রস্তুতির কারণে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দুশমনদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন এবং আপনার সহযোগীতাও করবেন। কিন্তু যদি আপনি প্রস্তুতি না নেন এবং চুপ করে ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকেন, তাহলে আগত অবস্থা চলে যাবে না।

১. সর্ব প্রথম ঘরের সকল পুরুষ জিহাদী ট্রেনিং অর্জন করুন। সে সময় বেশি দূরে নয় যখন মানুষ এই আশা করবে, হায়! যদি ঘরে কোনো ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদ থাকতো।

২. যে ধরণের অস্ত্র সম্ভব জমা করুন। ঘরের সকলে এমনকি নারীরাসহ সেগুলো চালানো এবং খোলা ও লাগানো শিখে রাখুন।

৩. গলি মহল্লার ছাঁদের উপর মানুষকে তৈরি করুন। যে কোনো হামালার অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ কর্মপদ্ধতি তৈরি করুন। প্রথমে কষ্ট হবে, কিন্তু মেহনতে এবং মনযোগ সব মুশকিলকে আছান করে দেয়। কঠিন অবস্থায় হায় হুতাশ না করে ধৈর্য এবং ধীরতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিন।

৪. ঘরের সকল সদস্যকে ক্ষুদা-পিপাসায় অভ্যস্থ করুন।

৫. এমন এলাকায় বাসস্থান রাখবেন না, যেখানে দীনদারদের দুশমন থাকে। তাছাড়া সেসব এলাকায়ও থাকবেন না যেখানে দুশমনরা আপনার ব্যাপারে জানে।

৬. ঘরের খরচ কম করুন। পয়সা জমিয়ে অস্ত্র ক্রয় করুন।

৭. আপনার উপর যে কোনো হামলার সময় ভীড়ের মধ্যে মিশে যান। এতে আল্লাহ তা'আলা আপনার দুশমনদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করবেন এবং আপনার বের হওয়ার রাস্তা আছান করে দিবেন।

৮. ঘরে আসবাবপত্র কম রাখুন। এসব যতই কম হবে স্থানান্তর এবং নড়াচড়া সহজ হবে। অস্ত্র অবশ্যই নিজের সাথে রাখুন। ভয়ের সময় বাসস্থান পরিবর্তন করে দিন।

৯. ঘরে খাবার দ্রব্য বেশি বেশি জমা করে রাখুন। বিশেষ করে ভুনা করা ছোলা, খেজুর ইত্যাদি।

১০. পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই নিজের জন্য আবশ্যকীয় বানাবেন না। যেমন সুস্বাদু খাবার, ইয়ারকন্ডিশন, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি। শুধু এবং কেবলই নিজের দীন বাঁচানোর ফিকির করুন। আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের দীলকে বেঁধে নিন। তারই নিকট কেঁদে কেঁদে নিরাপত্তা এবং দৃঢ়তা চাইতে থাকুন।

বাস্তবেই কি এমন সময় আসবে?

যদি আমরা দৈনন্দিন যিন্দেগীতে মশগুল থাকি এবং নিজের আশে পাশের অবস্থা থেকে বেখবর থাকি, নিজের পাড়া মহল্লায় গর্জন করা অস্ত্র থেকে চোখ বন্ধ করে রাখি, নিজের বিরুদ্ধে বিষাক্ত শ্লোগান থেকে কান বন্ধ করে রাখি, তাহলে তো কোনো বিষয়ই নেই। তাহলে আমাদের এমনই লাগবে যে, এসব কথা বাড়াবাড়ি। অনর্থকই লোকদেরকে ভীত সন্তস্ত্র করছে। এখানে তো সবদিকেই নিরাপত্তা। কারো জান মালের কোনো ভয় নেই। এখানে আমেরিকাও আসবে না, ভারতও আক্রমণ করার সাহস দেখাবে না। ব্লাক ওয়াটারেরও এই হিম্মত হবে না যে, পাকিস্থানের মতো আনবিক শক্তিধর দেশে এসব করতে পারবে। নিশ্চয় এমন লোক আছে যারা আজও এসব কথা বলছে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত গাফলতি। আর গাফলতির অপর নাম ধ্বংস।

গাফেলদের পরিণতি

এই শ্রেণির পরিণাম যদি দেখতে চান, তাহলে আসুন, ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো উল্টান।

হিজরী সপ্তম শতাব্দির (ত্রয়োদশ শতাব্দি ঈসায়ী) বাগদাদ। খেলাফতে বনী আব্বাসিয়ার দারুল খিলাফাহ বাগদাদ। বাগদাদ শহর পৃথিবীর সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে গণ্য হতো। পৃথিবী তার সকল সৌন্দর্যসহ এই শহরের গলিতে গলিতে অবস্থিত। বাজারের চাকচিক্য দুনিয়াবাসীর দিলকে নিজের দিকে টানতে থাকে। প্রমোদভবন আছে, মানুষের ভীড়ও আছে। মাদরাসা আছে খানকা আছে। ইলম পিপাসুদের

পদচারণায় মুখর হয়ে আছে। গোটা ইসলামী বিশ্বের মারকায বাগদাদ। দর্শনার্থিরা বলতে পারতেন, এর যৌবনে কখনো ভাটা আসবে না। বাগদাদের প্রতিটি শ্রেণি নিজ নিজ দুনিয়ায় মত্ত। প্রশাসকরা মহলের দুনিয়ায় মশগুল। ব্যবসায়ী বাজারে বন্দী। ইলম পিপাসুরা ইলম অর্জনে পাগল পারা। চাঁদ ছাড়া সবাই ঘুমন্ত। বরং নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নেশায় মত্ত। বিপদ থেকে চোখ বন্ধ করে, বাচ্চা কাচ্ছার গণনা করে শ্বাস পূরণ করছিলো। তখন...! যখন বিপদ বাগদাদের প্রাচীরের বাহিরে ছাউনি ফেলেছিলো, হালাকু খান জার সৈন্যদেরকে নিয়ে বাগদাদ ঘেরাও করে ফেলে। কিন্তু সাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অবস্থা যবের শীষের উপর দণ্ডায়মান ছিলো। এমনটিও ছিলো না যে, এই বিপদ আচানক এসে পড়ে। বরং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী অনেক আগে থেকেই তাদের জাগ্রত করার সামান মওজুদ ছিলো। তাদের আগে তাতারী সেনাবাহিনী, খাওয়ারিজম প্রশাসনকে উলট পালট করে মিটিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু স্বপ্ন আর ধারণার জগতে বসবাসকারীরা এই ধারনায় খুশী ছিলো যে, আমাদের ঘরে আসবে না। এটি দারুল খিলাফাহ। এটি ইসলামী বিশ্বের মারকায। এখানে ইলমের পাহাড় বিদ্যমান। হাজারো মসজিদ বিদ্যমান। বড় বড় খানকা রয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই ছিলো। স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ে। তাতারিরা বাগদাদ ঘেরাও করে। তখনও তারা গাফেল ছিলো। না জাগার কসম খেয়ে বসে ছিলো।

৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ ঈসায়ী মুহাররম শেষ দশমে তাতারিরা বাগদাদ প্রবেশ করে। এমন গণহত্যা চালায় যে, ঐতিহাসিকগণের কলম এই জুলুমের বিবরণ লিখার হিম্মত পাচ্ছিলো না। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুসলমানদের উপর গণহত্যা চলতে থাকে। শিশু, নারী কেউ বাদ পড়েনি। বৃদ্ধদের উপর থমকে দাঁড়ায়নি, রুগীর উপরও না। মসজিদেও নিরাপত্তা পাওয়া যায়নি, খানকাগুলোও নিরাপদ থাকেনি। কেবল ইহুদী খ্রিস্টান এবং রাফেজী শিয়াদেরকে বাদ দেয়া হয়। ওযীর বিন আলকমার ঘরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তারাও বেঁচে যায়।

হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. লেখেন, নিহতদের সংখ্যার ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, আট লাখ মুসলমানকে হত্যা

করা হয়। কেউ বলেন, দশ লাখ এবং কেউ বলেন, বিশ লাখ। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাতারীরা হত্যা এবং লুণ্ঠন করতে থাকে। চল্লিশ দিন পর বাগদাদের অবস্থা এমন ছিলো যে, সমতল ভূমিতে ঝড় হয়েছে। শহর বিরান ছিলো। লাশের স্তুপ ছিলো। বৃষ্টি আকৃতিগুলো আরো বিকৃত করে দিয়েছিলো। যার ফলে গোটা শহর দূর্গন্ধময় ছিলো। বেঁচে যাওয়া লোকেরা নানা রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলো। বাতাস শাম পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও রোগ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ে। মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে।

-আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া।

এটি সেই বাগদাদ ছিলো, যার শান, শওকত, চমক, শোরগোল, সৌন্দর্য, ভীড়, একাকিত্ব সবকিছুই ছিলো। কিন্তু আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বাগদাদের ধ্বংস এবং ওযীর ইবনে আলকমার ঘৃণিত ভূমিকা

ইবনে আলকমা খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ'র মন্ত্রী। সে ছিলো কট্টর রাফেজী শিয়া। যার অন্তরের কোনায় কোনায় সুন্নীদের ঘৃণা ভরপুর ছিলো। হাফেয ইবনে কাছীর রহ. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়াতে লেখেন, 'তার উদ্দেশ্য ছিলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেলাফতকে ধ্বংস করে শিয়া ফাতেমীদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা। সে বাগদাদ থেকে সকল সুন্নীদের নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছিলো। মসজিদ-মাদরাসা ধ্বংস করে খলিফা এবং তার খান্দানকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলো।

-আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া।

সুতরাং সে হালাকু খানের বিশেষ উপদেষ্টা এবং কট্টর রাফেজী শিয়া মোল্লা নাসিরুদ্দীন তুসীর (মৃত্যু ৬৭২ হিজরী/১২৭৩ ঈসায়ী) মাধ্যমে চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। বাগদাদের উপর হামলা করার জন্য সে তাতারীদেরকে উত্তেজিত করে এবং ধীরে ধীরে খেলাফতকে দূর্বল করতে থাকে। মুসলমানদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা খলীফা মুসতানসির (মু'তাসিম বিল্লাহ এর পিতা) এর শেষ সময়ে দশ লাখ ছিলো। ইবনে আলকমা এই সংখ্যা কমাতে কমাতে দশ হাজারে নিয়ে

আসে। খেলাফতের সকল গোপন তথ্য তাতারীদের নিকট নিয়মিত পাচার করতে থাকে। যখন হালাকু খান বাগদাদ ঘেরাও করে, তখন সে খলিফা মু'তাসিমকে হালাকু খানের নিকট যেতে বাধ্য করে। সুতরাং খলিফা সাতশত সাওয়ারী সাথে নিয়ে হালাকু খানের নিকট রওয়ানা হয়। যাদের মধ্যে বাগদাদের বড় বড় উলামা, ফুকাহা, মন্ত্রী এবং শহরের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন। আর ইবনে আলকমা তাদের আগে তার পরিবারসহ হালাকু খানের আশ্রয়ে চলে যায়। খলিফা এবং হালাকু খানের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এক পর্যায়ে হালাকু খান কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফিরে যেতে রাজি হয়। কিন্তু ঠিক তখনই ইবনে আলকমা এবং নাসিরুদ্দিন তুসি হালাকু খানের কান ভারী করতে থাকে এবং আলোচনা ব্যর্থ করে দেয়। (আজও ইবনে আলকমার সন্তানেরা কাজ করছে।)

খলিফা যখন ঘোড়ার পদতলে

ইবনে আলকমা হালাকু খানকে বাধ্য করে খলিফাকে কতল করতে। কিন্তু হালাকু খান খলিফার খুন প্রবাহিত করতে ভয় পাচ্ছিলো। তার বিশ্বাস ছিলো এতে তার উপর আসমানী বিপদ নেমে আসবে। এর সমাধান ইবনে আলকমা এভাবে দেয় যে, তাকে চাটাইয়ের উপর শুইয়ে দেয়া হোক তারপর তার উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়া হোক। এভাবে খলিফার খুন যমীনে পড়বে না আর হালাকু খান আসমানী বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। খলিফার সাথে থাকা উলামা ফুকাহার ব্যাপারেও ইবনে আলকমা কতলের পরামর্শ দেয়। এই গাদ্দার এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং খলিফার মহল থেকে মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে ধরে ধরে বকরীর মতো জবাই করাতে থাকে। খলিফার সকল আত্মীয় স্বজনকে এভাবেই জবাই করা হয়। তার স্বপ্ন ছিলো বাগদাদে মুসলমানদের মাদরাসার পরিবর্তে শিয়াদের মাদরাসা হোক, মসজিদের পরিবর্তে ইমামবার হোক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করে এবং নিরাশ করেন।

এই ইতিহাস পাঠ করে বাগদাদবাসীর অলসতা, ত্রুটি এবং সুধারণা এখনও পর্যন্ত আপনার বুঝে আসবে না যে, দুশমনকে বাগদাদের দরজায়

দেখেও কিভাবে ওই লোকগুলো দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়নি? এমনি ভাবে আপনি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ইতিহাসও পাঠ করেছেন। সম্ভবত আজও আপনি মোগল প্রশাসকগোষ্ঠিকে অভিশাপ দিবেন যে, তাদের অযোগ্যতার দরুন এতো বড় মুসলিম সম্রাজ্য চোখের সামনে ইংরেজদের গোলামীতে দিয়ে দেয়। শাসকগোষ্ঠির সাথে সাথে আপনি তৎকালিন মুসলমান জনসাধারণকেও চূড়ান্ত অলস বলবেন যে, দুশমনকে মাথার উপর আসতে দেখেও কেনো হুকুমতের সাথে বিদ্রোহ করে নিজেরাই দুশমনদের মুকাবেলা করেনি? আপনার কেমন লাগবে, ইতিহাসবিদগণ উল্লেখিত জাতির সাথে যদি আপনাকেও শামিল করে দেয়? আর এ কথা লিখে দেন যে, পাকিস্তানের মুসলমানরা কেমন ছিলো? তাদের সামনে তাদের দুশমন তাদেরই শহর দখল করতে থাকে, আর তারা সবকিছু আরামে সহ্য করতে থাকে? কেমন বুদ্ধিজীবি এবং জ্ঞানি ছিলো যে, দুশমনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির পরিবর্তে নিজের বাহিনীকে সেই শক্তির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে, যেই শক্তি তাদেরই দুশমনদের সাথে লড়ছে?

বর্তমানের ইবনে আলকমা

আজ শুধু একজন নয়, অগণিত ইবনে আলকমা রয়েছে। যারা ইবনে আলকমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দিন-রাত এক করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কতো নাসিরুদ্দীন তুসি রয়েছে, যারা বর্তমানের হালাকু খানদের উপদেষ্টা হয়ে বসে আছে। গোপনতথ্য পাচারকারীরা পাকিস্তানের সাদা-কালোর মালিক বনে আছে। সংবাদ এবং বিশেষ বার্তা নিয়ে বিশেষ দূতরা কখনো তেহরান, কখনো লণ্ডন যাচ্ছে। নাদেরা থেকে ডাটা সংগ্রহ করে মানচিত্রের উপর লাল চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছে। দোকান, বাণিজ্য কেন্দ্র, কারখানা এবং গলি-মহল্লার বিস্তারিত তথ্য তৈরি হয়ে গেছে। কোথায় দোস্ত আছে, কোথায় দুশমন আছে, কোথায় নিরাপদ শহরবাসী, কোথায় সন্ত্রাসীদের সমমনা জনগোষ্ঠি, গাণশিপ হ্যালিকপ্টার কোথায় উপযোগী এবং কোথায় নতুন এফ ১৬ উপকারী...... সব... সবকিছু। রাত যখন গভীর হতে থাকে এবং

আঁধার যখন সবকিছুকে আড়াল করতে থাকে আত্মভোলার শিকার মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, মুখ ভার করে বেখবর পড়ে থাকে। ঠিক তেমনি আমি বর্তমানের ইবনে আলকমা এবং বর্তমানের হালাকু খানকে কী পরামর্শ দিচ্ছি? কী গোপন তথ্য দিচ্ছি? কখন আসার দাওয়াত দিচ্ছি? দেখুন! যদি চোখ থাকে। শুনুন! যদি কান সঙ্গ না ছেড়ে থাকে। অনুভব করুন! যদি অনুভূতি বাকি থাকে। এই বন্টনকৃত অস্ত্রশস্ত্র, নির্বাচিত মন্ত্রণালয়, বিশেষ সময়ের জন্য খোলা অস্ত্রের লাইসেন্স, প্রতিষ্ঠানে রদ বদল, পাকিস্তানী চেতনাধারীদেরকে সন্ত্রাসীদের রক্ষক এবং প্রো-তালেবান বলে চিহ্নিত করা, সেই আগুনের তাপ অনুভব করুন, যা এখনও কেবল বুলেটিন মার্কেটকে ছাই করেছে। স্মরণ করুন, সেসব সুসংগঠিত গ্রুপকে, যারা করাচিতে ফ্যাক্টরীগুলোর কলকব্জা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। শুনুন সেসব চিৎকার, যেগুলো এখনও একটি একটি করে উঠছে আর ট্রাফিকের শোরগুলে হারিয়ে যাচ্ছে। ফালুজাকে ভুলে গেছেন? দ্বিতীয়বার পড়ে নিন। কিন্তু এসবকিছু কেবল তাদের জন্যই যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা চোখ দিয়েছেন, যেগুলো দিয়ে সে দেখে, কান দিয়েছেন যেগুলো এখনও সচল আছে, অনুভূতি দিয়েছেন যেগুলো এখনও জীবিত। তারা জানে, অবস্থা আমাদের আলোচনা থেকেও বেশি নাযুক এবং ভয়ঙ্কর। অস্ত্রশস্ত্রও কারো কাছে গোপন বিষয় নয়। আহলে হকের সকল তথ্য একত্রিত করার বিষয়টিও সকলেরই জানা। ব্লাক ওয়াটারের সাথে কারা আছে, বৃটেন আমেরিকার সাথে কে গোপন আঁতাত করেছে, সবকিছু সামনে উপস্থিত। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নিজের মৌজ মাস্তিতে মত্ত হয়ে থাকলে, কিছুই হয়নি। এগুলো সবই আবেগের কথা। মানুষকে ভয় দেখানোর কথা। বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন। এখানে কিছুই হবে না।

দোস্ত এবং দুশমনকে চিনুন

পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয়দেরকে মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা তারাই করতে পারে, যাদেরকে আজ আমেরিকা এবং ভারতের পরামর্শে দুশমন এবং দেশদ্রোহীদের কাতারে শামিল করা হচ্ছে। আফগান

জিহাদ থেকে নিয়ে তালেবান পর্যন্ত, কাশ্মির জিহাদের শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এমন কোন্ চিন্তাবিদ আছে, যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য ধারাবাহিক কুরবানি দিয়ে আসছে। মুশাররফ প্রত্যেকটি ময়দানে পাকিস্তানের ক্ষতি করেছে। সেই চিন্তার ময়দানেও, যেখানে সে সেই লোকদেরকে উপরে আনতে চেয়েছে যাদের কোনো নির্দিষ্ট চেতনাও নেই কোনো টার্গেটও নেই। যেখানে পয়সা পাওয়া যাবে তারা সেখানের শ্লোগানই দিতে থাকে। নিকট ভবিষ্যতও এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দিবে যে, ভারতী এবং আমেরিকান হামলাকারীদের সামনে সারহাদের কবীলা, আযাদ কাস্মীর, গিলগিট, শিয়ালকোট থেকে ভাওয়াল নগর, ভাওয়াল নগর থেকে করাচী পর্যন্ত পাকিস্তানের মুসলমানদের হেফাজতের জন্য কোন অফাদার কুরবানী দিবে। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ এটাই যে, সে সময় আসার আগেই দোস্ত এবং দুশমন চিনে নিন। এমন যেন না হয়, কাল দৃষ্টি বিনিময়ের সাহসও না থাকে। মিডিয়াতে ভারতী এবং ইহুদী দালালরা যদিও জনগণকে অন্ধ এবং বধির বানিয়ে রেখেছে, কিন্তু আপনি বাস্তবতা জানেন, ভারত থেকে কারা পয়সা পাচ্ছে, 'র' (ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ) এবং সি.বি.আই এর গোপন অফিসাররা করাচী এবং লাহোরে কার মেহমান হয়। দুবাই এবং লন্ডনে কার বাচ্চার ফী এবং পরিবারের শপিংয়ের খরচ সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস বহন করে, শুধু এই চুক্তির বিনিময়ে যে, এসব গাদ্দাররা নিজেদের সেনাবাহিনীর রোখ ভারত থেকে ফিরিয়ে পাকিস্তানপন্থী মুহাফিজদের (দেশপ্রেমিক পাহারাদার) দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং ভারতের সাথে বন্ধুত্বের রশি বাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছে। আপনি জানেন, যাদেরকে আপনি ভারতের এজেন্ট বলছেন তাদের অন্তরে ভারতের ঘৃণা এমন ভাবে কানায় কানায় ভরপুর যে, জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে রাজি হবে, খিদায় তড়পাতে তড়পাতে জান দিয়ে দিবে, কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে হাত মিলাবে না। এটি তাদের জন্য অসম্ভব বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্ত। হতে পারে ভারতীয় এজেন্সিগুলো এমন চেষ্টা করছে, কিন্তু ভারতকে এর বাস্তব জবাব আফগানিস্তানে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। আফগানিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তাদের অবস্থানগুলো উপর যে আঘাতগুলো হানা হচ্ছে আপনি

জানেন তারা সেসব পাগল, যাদের শিরায় শিরায় ভারতের ঘৃণা মিশে আছে। ভারতের জন্য এটাই তাদের কার্যকরী জবাব। এসব তো এমন কথা, যেগুলো প্রত্যেক সচেতন পাকিস্তানী জানে। কিন্তু সেসব অন্ধ, বধির এবং বোবাকারী ফেতনা সবাইকে যাদুগ্রস্ত করে রেখেছে। একই কারণে এখন কাশ্মিরের মুজাহিদদের ব্যাপারেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে, যা ভারতীয় লবি চাচ্ছে। দুশমন হলো ভারত, সেনাবাহিনীকে এদিকে ফেরত আনতে হবে। ভারতের হাত আমাদের গলা পর্যন্ত এসেছে। যদি বিলম্ব করা হয়, তাহলে ব্রাক্ষনদের আঙ্গুল আমাদের শাহরগের উপর মজবুত হতে থাকবে। পাকিস্তানে ভারতের নিমকখুররা এই প্রভাব বিস্তার করবে যে, পন্ডিতজি আমাদের গলা চেপে ধরছে না বরং সারেঙ্গী এবং গীটারের উপর আঙ্গুলী কাঁপছে, যাতে নিরাপত্তার পরিবেশে সুরেলা সারগাম এবং মধুর মিউজিক ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানে অবস্থিত এই শ্রেণির খাহেশ হলো সীমান্ত রেখাকে ভুল হরফের মত মিটিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে গঙ্গা যমুনার কার্লচারে এক ডুব দেয়া হোক, যাতে ভারতের মত এখানকার পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে 'বন্দে মাতারাম' এর না'রা লাগিয়ে চিৎকার করতে থাকে। আমেরিকা এবং ভারতের চেষ্টা হলো, পাকিস্তানের সেনা বাহিনী কবিলাগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকুক। অথচ পাকিস্তানের জন্য জরুরী হলো, এই সেনাবাহিনীকে কবিলাগুলো থেকে বের করে পূর্বদিকের সীমান্তে নিযুক্ত করা। মিডিয়ার শোরগোলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা উচিত। মিডিয়ার শয়তানীর কারণেই আজ পাকিস্তানী সেনাবহিনী কবিলাগুলোতে ব্যস্ত। মিডিয়া কবিলাগুলোর অবস্থাকে কঠিন আকারে পেশ করছে। মনে হচ্ছে তালেবান একটু পরই ইসলামাবাদ দখল করে নিবে। তারা যে কোনো মূল্যে চাচ্ছে সেনাবহিনী কবিলাগুলোতেই ব্যস্ত থাকুক, যাতে ভারত ও আমেরিকার জন্য পকিস্তানকে লুকমা বানাতে সহজ হয়। সত্যিকারার্থে পকিস্তানের প্রতি সদয় এমন কোনো ব্যক্তি এ কথা সমর্থন করতে পারে না যে, সেনাবহিনী নিজেদের লোকের সাথে জড়িয়ে থাকুক। যতলোক এই অপারেশনকে সমর্থন করছে, তাদের সকলেই সেই লোক, যারা কাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার কথা বলতো। এখন তাদের এই আকাঙ্খা পুরা হতে দেখা

যাচ্ছে। তাদের দুই দুশমন মুজাহিদীন এবং সেনাবাহিনী একে অপরের সাথে লড়ছে। উভয় অবস্থাতেই তাদের আনন্দই আনন্দ মিলছে। সেনাবাহিনীর সমর্থনে বের হওয়া র‍্যালি মূলত সেনাবহিনীর সমর্থনে নয় বরং এই র‍্যালি তাদের সেই আনন্দের জন্য যে, তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে। সেনাবাহিনীকে মুজাহিদীনের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এই র‍্যালি তাদের অন্তরে লুকানো সেই আনন্দেরই বহিপ্রকাশ। এই অপারেশনকে সমর্থনকারীদের কিছু এমন লোক, যাদের জন্য সরাসরি ভারতী লবি বড় বড় ফান্ড চালু করে রেখেছে। আমেরিকা এবং বৃটেনে বাড়ি, ইসলামাবাদ এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে প্লট, মাসিক বেতন, সরকারী খরচে ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে উলামা মাশায়েখদের কনফারেন্স, এসবকিছু একটি আওয়াজই দিচ্ছে যে, আমেরিকা খুশি হয়ে যাক আর পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপর যখমের পর যখম লাগতে থাকুক। এমন লোকদেরকেই মিডিয়া সামনে তুলে আনছে, যারা আমেরিকা এবং ভারতের চাহিদা পূরণে আগে আগে চলে। অথচ সেই শ্রেণির আওয়াজকে তলিয়ে দেয়া হচ্ছে, যারা সত্যিকারার্থে পাকিস্তানের সহমর্মী। আল্লাহর কুদরতের নিয়মে না আসুক। যদি শহীদদের রব মুজহিদীনের হাতে ভারত বিজয়ের ফায়সালা করে রাখেন, তাহলে আপনি তাদের রাস্তা বন্ধ করতে পারবেন না। যদি বন্ধ করতে চান, তাহলে ইসলামাবাদ এবং করাচীতে বসে সেই ভারতী লবির লাগাম টানুন, যারা পাকিস্তানকে আজ এই পর্যায়ে পৌছিয়েছে যে, ভারতের সামনে মাথা ঝুকাতে বাধ্য করেছে। এসব গাদ্দারদের কারণেই জাতি পানির প্রতিটা ফোটার মুখাপেক্ষী হতে যাচ্ছে। অথচ পানির বিষয়টি পাকিস্তান বেঁচে থাকার সাথে সম্পৃক্ত। পাকিস্তান বাকি থাকার জন্য সেসব লোকদেরকে লশকর বানান, যারা কবিলাগুলোতে অপারেশন চায়। তাদেরকে দখলকৃত কাশ্মিরে পাঠিয়ে দিন, তারপর দেখুন তারা এই দেশের জন্য কতটুকু দরদী।

পাকিস্তানী কে?

যদি আপনি এ কথা মানেন যে, পাকিস্তান কালেমার নামে জন্ম নিয়েছে, তাহলে আপনি এই পাকিস্তানকে কেনো সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন? যখন পাকিস্তান কালেমার নামে অস্তিত্বে এসেছে, তখন এটি প্রত্যেক ওই মুসলমানের দেশ, যে কালেমার জন্য বাঁচে এবং কালেমার জন্য মরে। চাই সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে জন্ম গ্রহণ করুক। প্রত্যেক মুসলমান ওই পাকিস্তানি, যার যিন্দেগীর উদ্দেশ্য কালেমার বিজয়ের জন্য দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। চাই সে আরবে জন্মগ্রহণ করুক অথবা আফ্রিকাতে। চাই সে দিল্লিতে চোখ খুলুক অথবা শ্রীনগরে। অথচ সেসব গাদ্দার কিভাবে পাকিস্তানী হতে পারে, যারা মুসলমানদেরকে ব্রাক্ষ্মনদের গোলামীতে দেয়ার খাহেশ রাখে? যারা কালেমার বিজয়ের পরিবর্তে এই ভূখণ্ডে হিন্দুদের বিজয় মেনে নিতে দাওয়াত দিচ্ছে? যারা জাগ্রত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ আত্মহত্যার প্রতি ধাক্কাচ্ছে?

হিন্দুস্তানী মুসলমান কাদের সাথে জিহাদ করবে?

বর্তমানে যখন বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের স্পৃহা বেড়ে চলছে, নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নওজোয়ানদের মধ্যে অনুভূতি জন্ম হচ্ছে, দুনিয়া জুড়ে বাতিলের সামনে মুজাহিদীন সীনা টান করে দাঁড়াচ্ছে, এমন সময় এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আবাদীর ভিত্তিতে মুসলমানদের একটা বড় সংখ্যা হিন্দুস্তানে বসবাস করছে। কিন্তু কী কারণে তারা আজ পর্যন্ত যে পরিমাণে জিহাদের অংশগ্রহণ করার কথা সেই পরিমাণে করছে না? এতে কোনো সন্দেহ নেই তারা দুনিয়ার সেরা ধোকাবাজ জাতির সামনে দণ্ডায়মান। যে জাতি নিজের কুৎসিত চেহারার উপর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেকাব লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু হিন্দুস্তানি মুসলমানদের জন্য সময়ের জটিলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজেদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত। গোলামীতে থাকতে থাকতে যেনো আবার ব্রাক্ষ্মনদের গোলামীর অনুভূতিই শেষ না হয়ে যায়। হিন্দুস্তানী মুসলিম ভাইদের প্রতি খুবই সহজ একটা প্রশ্ন করতে মন চাচ্ছে,

প্রত্যেক মুসলমানের মতো আপনিও কি ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছেন? যদি ইমাম মাহদী এসে পড়ে তাহলে আপনারা কী করবেন? আপনারা দেশের সঙ্গ দিবেন নাকি ইসলামের সঙ্গ দিবেন? ইমাম মাহদীর সাথে মিলে ভারতী সেনাবাহিনীর মুকাবেলা করবেন নাকি 'হেকমত ও মাসলাহাত' সামনে নিয়ে ফায়সালা করবেন? যদি ইমাম মাহদীর সাথে মিলে জিহাদ করেন, তাহলে সেই জিহাদের হুকুম এখনও আছে। আর তা হচ্ছে ফরজে আইন। সুতরাং আপনাদের জন্য জরুরী হলো, হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হওয়া। হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্য নিজেদের আগামী প্রজন্মকে মুসলমান করে রাখার জন্য হিন্দুদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। অন্যথায় ধীরে ধীরে হিন্দুদের বিষ শিরায় শিরায় রক্ত হয়ে দৌড়তে থাকবে। উর্দূ ভাষার সাথে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর, তাদের অতীতের সাথে কতটুকু সম্পর্ক থাকবে তা বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন আপনি নিজের মুখে যতই দাবী করতে থাকুন যে, হিন্দুস্তানে আপনাদের সব রকমের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, আপনাদেরকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তানের বাহিরে আপনাদের অপদস্ততা দেখে গোটা বিশ্ব আফসোস করছে। আপনাদের অধঃপতনের উপর ছাঁপা রিপোর্টগুলো পড়ে তো এমন মনে হয় যে আপনাদেরকে শূদ্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্বে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে, জিহাদের ময়দান গরম, নওজোয়ানেরা সেজগুজে হুরদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, মায়েরা জোয়ান ছেলেদেরকে আল্লাহর নামে কুরবানী দিয়ে দিচ্ছে, বাহাদূরী এবং বীরত্বের এমন ইতিহাস লেখা হচ্ছে যার উপর উম্মত সর্বাবস্থায় গর্ব করতে পারে, দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরা জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য জিহাদের স্বর্গরাজ্য আফগানের দিকে মুখ ফিরাচ্ছে কিন্তু আপনারা কোথায়? ব্রাক্ষনদের প্রতারণা, স্মরণশক্তির উপর মনে হচ্ছে এমন জখম করেছে যে, এখন দিল্লির জামে মসজিদ এবং লাল কেল্লা দেখেও নিজেদের হারানো ঐতিহ্য মনে পড়ে না। বাবরী মসজিদের পর এতগুলো মসজিদ শহীদ হওয়ার পরও সোমনাথ মন্দির ভাঙ্গার কথা ভুলে গেছেন। যে জাতির নারীদেরকে আপনি ইযযত দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন আজ সেই জাতি ভরা বাজারে তোমাদের ইযযতের নিলাম করে ফিরছে।

তোমাদের দূর্বলতা এ পর্যন্ত পৌছেছে যে, শুরুতে বিশ্ব থেকে আড়াল করে জুলুম করতো, আর এখন নিজেরাই বিশ্বকে দেখিয়ে ফিরছে। তোমাদের অচেতনতার ভিডিও করে বিশ্ব মিডিয়াকে দেখাচ্ছে। গোলামী এই পরিমাণে করেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ বানাতে বাধা দেননি, কিন্তু যখন ইচ্ছা মসজিদসমূহে ঝুটা ফেলে চলে গেছে? দুই সেজদার অনুমতি নিতে এতো ব্যস্ত যে, দারুল হারব এবং দারুল ইসলামের মাসআলা ভুলে গেছে। আজ আপনি হিন্দুস্তানকে দারুল হারব মনে করেন না। অথচ শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. হিন্দুস্তানকে সে সময় দারুল হারব হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন, যখন দিল্লির মসনদে মুসলমান বসা ছিলো। আদালতের আইন কানুন কাজীদের হাতেই ছিলো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সব ধরণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিলো। দুই ঈদ, জুমা এবং আযানের ব্যাপারে কোনো আপত্তি ছিলো না। সে সময় যেসব কারণ শাহ আব্দুল আযীয রহ, বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো অধ্যয়ন করুন এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতনের চিত্র দেখুন।

শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর ফতোয়া

এখানে খ্রিস্টান অফিসারদের হুকুম বিনা বাক্যে চালু আছে। তাদের হুকুম জারি হওয়া এবং বাস্তবায়ন হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, রাজত্ব, পরিচালনা, টেক্স, বাজনা, উশর, মাল রপ্তানি, ব্যবসায়ী মাল, চোর ডাকাতের নিয়ম নীতির ব্যাপার, মামলা-মুকাদ্দামায় সাব্যস্ত দোষীদের শাস্তি ইত্যাদি অর্থাৎ সিভিল সেনা, পুলিশ, দেওয়ানী, ফৌজদারী লেনদেন, কাস্টম এবং ডিউটি ইত্যাদিতে তারা নিজেরাই হাকিম এবং নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অবশ্যই জুমার নামায, দুই ঈদ, আযান, গাভী জবাইয়ের মতো ইসলামের কিছু বিধান পালনে তারা বাধাঁ দেয় না। কিন্তু যে বিষয়টি সবকিছুর মূল এবং আযাদীর ভিত্তি অর্থাৎ হুকুমত পরিচালনার বিষয়টি অবাস্তব এবং পদদলীত। সুতরাং নির্দ্বিধায় মসজিদগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, জনসাধারণের নাগরিক অধিকার নষ্ট করে দিচ্ছে, যার পরিণাম হচ্ছে কোনো হিন্দু অথবা

মুসলমান তাদের পাসপোর্ট এবং অনুমোদন ছাড়া এই শহর ছাড়া অন্য কোথাও অথবা তার আশেপাশে যেতে পারবে না। সাধারণ মুসাফির এবং ব্যবসায়ীদেরকে আসা যাওয়ার অনুমতিও দেশের কল্যাণ কিংবা নাগরিক স্বাধীনতার জন্য নয় বরং নিজেদের সুবিধার জন্য দিয়েছে। তার বিপরীতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং নামকরা ব্যক্তি যেমন সুজাউল মুলক এবং বেগম সাহেবারাও তাদের অনুমতি ছাড়া এই শহরে প্রবেশ করতে পারে না। দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাদেরই কর্তৃত্ব। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও আছে যেমন হায়দারাবাদ, লাখ্নৌ, রামপুর ইত্যাদির হর্তাকর্তারা যেহেতু আনুগত্য কবুল করে নিয়েছে তাই সেখানে সরাসরি খ্রিস্টান বিধি বিধান জারি হয় না। কিন্তু এতে পুরা হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

-উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি।

আজ হিন্দুস্তানে কার হুকুম চলে? মুসলমানদের নাকি হিন্দুদের? মুসলমানদের জান, মাল, ইযযত, আব্রু আজ পর্যন্ত কোটিবার পদদলিত করেছে। শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর কার্যকরী পদক্ষেপ ইসলামের দুশমনদেরকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করেছে। দুধের মধ্যে টিকটিকি জাল দিয়ে সেই দুধ পান করিয়ে দিয়েছে। যারফলে তার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং শ্বেত রোগ হয়ে যায়। পরিবারের মহিলাদেরসহ তাঁকে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয়। মহিলাদেরকে পর্যন্ত সাওয়ারিতে আরোহন করতে দেয়নি। মির্যা মাযহার জানেজানা রহ.কে সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সাথে মহব্বতের কারণে গুলি করে শহীদ করে দেয়া হয়।

শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.

শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর দারুল হারবের ফতোয়া কাগজী পদক্ষেপে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং এর বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণ যুদ্ধের মিশন তাঁর নিকট ছিলো। যা কিছু তাঁর কলম থেকে বের হয়েছে তার জন্য খুব দ্রুততার সাথে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। শহরে শহরে গিয়ে মানুষজনকে জিহাদের জন্য তৈরি করা হয়। যে জিহাদে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। হিজরতের জন্য মুসলমানদেরকে

প্রস্তুত করা হয়। জিহাদের খরচের জন্য টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, নিয়মিত যুদ্ধের প্রস্তুতি, সীমান্ত নির্ধারণ, সেখান থেকে পিছনের কেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগের ব্যবস্থা, রশদপত্র প্রস্তুতসহ যুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় সবরকম প্রস্তুতি নেয়া হয়। এর জন্য সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. আমীরুল মুজাহিদীন এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. ও মাও. আব্দুল হাই রহ. তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন।

তারপর বিশ্ববাসী দেখেছে চাটাইয়ের উপর উপবিষ্টরা তুপ-কামান উঠিয়েছেন, নিজেদের ইলমের মান রাখতে ঘর-বাড়ী, বিবি-বাচ্চা, বড় বড় দীনি মজলিস, সবকিছুকে আল বিদা বলে ঘর ছেড়ে হাজার মাইল দূরে সারহাদ প্রদেশের পাহাড়ে রাত যাপন করতে থাকেন। কুরআন ও হাদীসের দরস ছেড়ে আজ কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান হেফাজত করতে সবাই দাঁড়িয়ে যায়। কে শায়খুল হাদীস, কে শায়খুত তাফসীর, কে কুতুব আর কে আবদাল? নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহ তা'আলার মানশা পূর্ণ করতে ধূলি মলিন হয়েছেন। কাদায় লুটোপুটো খেয়েছেন। শুকনো বাসি রুটির উপর দিন কাটিয়েছেন। ক্ষুদা সহ্য করেছেন, ভৎসনাকারীদের ভৎসনা সহ্য করেছেন। কুরআন হাদীস থেকে হেকমতে আমলী আর মাসলাহাতপছন্দীর সবকদাতাদের জবাব দিয়েছেন। গাদ্দারী, অকৃতজ্ঞতা আর ঘর-বাড়ীর বিচ্ছেদ সহ্য করে অবশেষে এই মহান ব্যক্তিদের কাফেলা বালাকোটের ময়দানে নিজের শেষ সম্বল জানটুকুও রবে কায়েনাতের সন্তুষ্টির জন্য কুরবান করে দেন। ইসলামের শেয়ারগুলো (ধর্মীয় নিদর্শন) হেফাজত করা-ই দীনের সবচেয়ে বড় খেদমত। চাই তার জন্য নিজের ঘর, নিজের মাদরাসা, এমনকি নিজের মাতৃভূমিও ছাড়তে হোক। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আলেম সে-ই হতে পারে যে কুরআন থেকে শিখে এবং তার উপর জমে থাকে। এটি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর বেলায়েত এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশেষ সম্পর্কেরই প্রমাণ যে, তিনি কাফেরদের সামনে সেই মাথা ঝুকাতে অস্বীকার করেছেন, যেই মাথা মাহবুবে হাকীকীর সামনে নত হয়েছে। বালাকোটে শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর মাজারে উপস্থিত হওয়ার সময় বার বার দিল্লি থেকে বালাকোট পর্যন্ত মানচিত্র মাথায় ঘোরপাক খেতে থাকে। একদিকে দিল্লির চাকচিক্য,

মুসল্লি ভরা মসজিদ, মাদরাসাগুলোতে ইলম পিপাসুদের ভীর আর অপরদিকে পাহাড়ের চূড়ায় দন্ডায়মান বালাকোট। কোথায় দিল্লির শাহজাদা আর কোথায় সেই লোক অভিযোগ যার সাথী? আমার মতো দূর্বল চিত্তের লোক এই রহস্য কিভাবে বুঝবে যে, হাদীসের দরস দাতা শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. হাদীসের দরস ছেড়ে কেনো সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর পিছনে ছুটে গেছেন? কখনো মাকবারায়ে কাসেমীতে কাসেম এবং মাহমুদ রহ. এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করবেন যে, তাঁরা কোন্ শক্তির সাথে লড়তে গিয়েছিলেন? যাদের রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হতো না। নিজেকেও এই প্রশ্ন করবেন যে, মূলছড়ির বেষ্টনী থেকে বের হওয়ার সময় বাবে কাসেমীর দিকে শেষ নযর দিয়ে অন্তরে উদ্দীপনার তুফান নিয়ে বের হওয়া তালেবে ইলম বাকী আছে, নাকি দুনিয়ার চাকচিক্যে তাকেও ভবিষ্যতের চিন্তাবিদ বানিয়ে দিয়েছে?

আমি কখনো চিন্তা করি যে, আমাদের বড়রা অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, যারা উম্মতের হীরাগুলো একত্রিত করে বালাকোটের প্রান্তরে গিয়ে শহীদ করে দিয়েছেন, নাকি আমরা অধিক বুদ্ধিমান যারা নিজেদের জান বাঁচিয়ে ঘুরা ফেরা করছি? আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এর মতো মুহাদ্দিসের কী এতটুকু অনুভূতি ছিলো না যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর ফতোয়া কতটুকু মসিবত বয়ে আনবে? তাঁর কি এই বোধশক্তি ছিলো না যে, তাঁর এই পদক্ষেপ হিন্দুস্থানের মাদরাসাগুলো প্রত্যেকটা ইট ইংরেজরা খুলে নিবে? কিন্তু তারপরও কোন্ ব্যাথায় দিল্লিতে দীনের মহা খেদমত আঞ্জামদাতা মাদরাসাগুলোকে তোপের নীচে রাখলেন? কেনো নিজে মসীবতের সাগরে ঝাঁপ দিলেন আর কেনই বা মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস করালেন? আমার মতো স্বল্পজ্ঞানী লোক যখন আকাবেরের ইতিহাস অধ্যয়ন করি এবং বর্তমানের অবস্থা পর্যবেক্ষন করি তখন মনে হয়, তাঁরা এক জগতের বাসিন্দা ছিলো আর আমরা ভীন গ্রহের লোক। অন্তর সামনে সফরের পরিবর্তে অতীতের দিকে ছুটে যেতে চায়। সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। আসুন অতীতকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আলোচনা-পর্যালোচনা রাখুন। দাঁড়ান। এখনই দাঁড়ানোর সময়। নৈরাশ হবেন না। নিজেকে দূর্বল মনে করবেন না। সোমালিয়াবাসীকে দেখুন। ক্ষুদার্ত পেট।

দূর্ভিক্ষে আক্রান্ত। শিরার রক্তগুলোও দীনের দুশমনেরা চুষে নিয়েছে। কিন্তু যখন তাঁরা দাঁড়িয়েছে যুগের ফেরাউনের গলায় রশি লাগিয়ে গলিতে গলিতে টেনে ফিরিয়েছে। ভারত তো থোরাই। আল্লাহ তা'আলারই সকল শক্তি। তাঁকেই ভয় করা উচিত। এই ভয় গোলামীর ভয়। অন্য কিছু নয়। নতুবা একজন পুলিশের কী শক্তি আছে যে, থ্রী নট থ্রী হাতে নিয়ে মাহমুদ গজনভী এবং আওরঙ্গজেব রহ. এর সন্তানদেরকে বকরীর পালের মতো তাড়িয়ে বেড়াবে? এসব কেবলই জিহাদ থেকে দূরে সরার ফল। অন্যথায় ভারতী সেনাবাহিনীও আপনার সামনে টিকে থাকতে পারবে না। কাস্মীরের ভিতরের অবস্থা দেখুন। মোশাররফের গাদ্দারীর আগ পর্যন্ত কী পরিমাণ ভারতী সৈন্যকে মুজাহিদরা পরাজিত করেছে। দ্রুত করুন। জিহাদের ময়দান আপনাকে ডাকছে। কাফেলা প্রস্তুত। কুতুব মিনার আপনাকে আপনার বড়ত্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। লাল কেল্লায় বয়ে যাওয়া তরঙ্গ, দীলের দরিয়াকে রক্তে রঙ্গিন করছে। তার সামনে নিথর দাঁড়িয়ে থাকা জামে মসজিদও কী আপনার দীলে অতীত ফিরিয়ে আনার তামান্না জাগ্রত করছে না? এর সবই তো আপনার মীরাস। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এজন্য দুনিয়াতে পাঠাননি যে, আপনি আল্লাহর দুশমন হিন্দুদের গোলামী করে জীবন অতিবাহিত করবেন। দাঁড়ানোর সময় এখনই। দাঁড়ান। যদি আপনি নিজে না দাঁড়ান তাহলে আপনাকে উঠিয়ে দেয়া হবে। অল্প সময় বাকী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করুন। যাতে বাহির থেকে আপনার মুজাহিদ ভাইয়েরা আর ভিতর থেকে আপনারা গযওয়ায়ে হিন্দে শরীক হয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেতে পারেন। দু'জাহানের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর হিন্দুস্তান বিজয়ের সুসংবাদের শরীক হতে পারেন।

পাকিস্তান এবং উলামায়ে হক

এরাই সেই লোক, যারা বেঁচতো দীলের দাওয়াই

নেহায়াতই পেরেশানীর কথা, যখন বিপদগুলো সাপের ন্যায় ফণা তুলে সামনে দণ্ডায়মান, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও হকপন্থীদের দীলে

নড়াচড়ার কোনো আবাস পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তাঁরা সেই তবকার লোক, যারা দূরে থেকেই বিপদের ঘ্রাণ অনুভব করার যোগ্যতা রাখেন। বর্তমানে বিপদ তো তাদের মাথার উপর বর্ষিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু কোন্ কারণে তাঁরা একে অপরের অপেক্ষায় বসে আছেন? মাঝে মধ্যে মন চায়, আল্লাহর এই বান্দাদের দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করি জড় পাথরকে যবান দাতাদের উপর এই খামোশী কেন আচ্ছাদিত? বালাকোটের গুহাবাসী আর শামেলীর ময়দানকে নিজের রক্তে রঙ্গীন করে, ভারত উপমহাদেশে আযাদীর রঙ ছিটানেওয়ালারা আজ কেনো শীতের ঝরেপড়া পাতার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে? অতীত এবং বর্তমানের এতটা বৈপরিত্ব তালেবে ইলমদের বোধগম্য নয়। আমাদের নিজেদেরকে কাসেম এবং মাহমুদের মাপকাঠিতে পরখ করা উচিত, আমাদের এবং সলফে সালেহীনদের পথ ও কর্মপদ্ধতীতে কতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে? এই পার্থক্য কেবলই শাখাগত? নাকি বুনিয়াদী ভাবেই দূরে সরে গেছি? কেবল কর্মপদ্ধতীতে মতানৈক্য নাকি উদ্দেশ্য, মিশন সবই উলট পালট হয়ে গেছে? উদ্দেশ্য এবং মিশন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদেরকে কুরবানী করার সুন্নত জারি আছে নাকি নিজেদের জন্য উদ্দেশ্য এবং মিশন কুরবানী করা হচ্ছে? নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আগ্রহ বাকী আছে নাকি বেঁচে যাওয়ার তামান্না দীলে বাসা করে নিয়েছে? শেষ হাদীস পড়ানোর সময় 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনভাব' সনদ হিসেবে বন্টন করা হতো, তার পরিবর্তে 'মাসলাহাত আর কল্যাণ' তো জায়গা করে নেয়নি? বালাকোটের প্রেরণা আর শামেলীর স্পৃহা দীলকে উত্তপ্ত করে নাকি লণ্ডন ওয়াশিংটনের যাদুর প্রভাব দীনের খেদমতের নতুন তাকাযা শিখিয়ে দিয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা যেন এই গুনাহগারকে সেই দিনটি না দেখান, যেদিন ইসলামী চিন্তার সূতীকাগার ব্যক্তিত্বগুলেকে গণহারে হত্যা করা হবে। তাদের মসজিদ ও মাদরাসগুলোর ছাদ তাদেরই উপর ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। হায়! যদি এমনটি না হতো। আল্লাহ সবকিছুই ভালো রাখুন। কিন্তু কেনো জানি এই গুনাহগারের চোখের সামনে গাছে গাছে সেই প্রজন্মের আযাদীর তামান্নাকারীদের ঝুলন্ত লাশ ভেসে উঠে, যাদেরকে ১৮৫৭ সালের পর দিল্লির জামে মসজিদ থেকে দিল্লির শাহী গেট পর্যন্ত গাছের

উপর এমন ভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যেমন বিয়ে সাদিতে প্রত্যেক দেয়াল এবং মন্দীরে বাতি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তারপরও দীলকে এই প্রবোধ দেই যে, এসব তো আগের দিনের কথা। এটা তো নতুন যুগ। অভিজ্ঞতা এবং সতর্কতার যুগ। এক চোখের যুগ। যা সব জায়গায় সবকিছু দেখছে। সুতরাং ইংরেজদের মতো জুলুম বর্তমানে করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরক্ষনেই নিজের সাথে কিছুটা প্রতারক হয়ে যাওয়ার ভয়ে অস্থীর হয়ে যাই। তারপর এই অভিজ্ঞতা এবং একচোখা যুগের (যা একদিকে দেখে এবং একদিকেই দেখায়) ফালুজা চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। ফালুজা এক কতলখানার নাম। এক বিশেষ পরিকল্পিত হত্যাখানা। যেখানে বিদ্রোহী স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। নিজের দীন, নিজের ঈমান এবং নিজের দেশের উপর কোনো কাফেরের দখলদারিত্ব দেখে যাদের বিদ্রোহী স্বপ্নগুলো উছলে উঠে। তারা সবাই এক। তাদের নাম, চেহারা, এলাকা এবং ভাষা যদিও পৃথক। কিন্তু তাদের সকলের স্বভাব বিদ্রোহী। তাদের প্রতিক্রিয়া একই হয়। চাই বৃটেনি কৃষ্টিকার্লচারের আকৃতিতে আসুক আর আমেরিকার শেকেলে আসুক। তাদের পেশা-ই বিদ্রোহী। অথচ মুসলমান তো আরো আছে। যাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত। অন্যকে বরদাস্ত করনে ওয়ালা। নতুন যুগের বাস্তবতায় মাথা ঝুকানে ওয়ালা। কিন্তু এই চিন্তাশক্তির মধ্যে পরিণামপছন্দী রয়েছে। দুনিয়ার সভ্য জাতিগুলো নিজে নিজেই তাদের দরজায় সভ্যতা শিখাতে আসে। আর তারা মরতে এবং মারতে প্রস্তুত। ফাসাদ ছড়ায়। মন্দপ্রিয়। তাদের ইতিহাসই এমন। যখনই এমন কোনো সুযোগ তাদের আসে, তখনই তাদের খানকা ওয়ালারা, মাদরাসা ওয়ালারা, ইমাম, মুয়ায্যিন, ব্যবসায়ী, মজদুর সবাই এক হয়ে যায়। কেউ খানকা থেকে উঠে এসে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এবং হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. হয়ে যায়। একসময়ের মুহাদ্দিস মাদরাসা ছেড়ে নিজের পীরের পিছনে ছুটে চলে।

পাকিস্তানে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে ইরাকীদের পদ্ধতী-ই ব্যবহার করা হবে। হকপন্থী উলামায়ে কেরাম বাতিল শক্তির টার্গেটে রয়েছে। সুতরাং বেছে বেছে টার্গেট বোর্ডে নিশানা বানানোর আগেই উঠতে হবে। আমেরিকা পাকিস্তানে তার পরিকল্পিত যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার আগেই

হকপন্থীদেরকে এই আঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আম জনতাকে সাথে নিয়ে আগত অবস্থা মুকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি আবশ্যক। চিন্তা অন্য কিছু নয়, শুধু এতটুকু যে এই চক্ষু আপনার গলি, মহল্লা আর বসতিকে ফালুজা বানাতে দেখার শক্তি কোথা থেকে আনবে? এজন্যই নফস বারবার নীরবতা পালনের ফযীলত শোনায়। যেখানে লোক আরামে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে শোরগোল করা এবং ঘুমন্তদের জাগানোকে আনকার্লচার, অসামাজিক মনে করা হয়। মানুষ এটাকে ভালো মনে করে না। কিন্তু দীল তো দীল-ই। ভয় হয়, আবার না আপনাদের সাথেও তেমন হয়ে যায়, যেমনটি ইরাকের উলামায়ে কেরামের সাথে হয়েছে। চোখের সামনের পূণরায় সেই ছবি ভেসে উঠে। দজলা ফুরাতের দৃশ্য। আযানের আওয়াজে গমগম করা মিনার মুয়ায্যিনদের উপর ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সেজদায় সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা বলা অবস্থায় মুসল্লিদের উপর মসজিদের ছাদ ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আরবের লজ্জাশীল মেয়েরা মৃত্যু কামনা করে বেঁচে আছে, নাকি হায় মু'তাছিম! বলে, নাকি কোনো মুহাম্মাদ বিন কাসিমের আশায় বেঁচে আছে? গোটা মহল্লাকে ঘেরাও করে সকল মহিলাদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। সাদা দাড়ি ওয়ালাদের দাড়ি ধরে রাস্তায় হেচড়ানো হয়। যুবকদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নিশানা ঠিক করার প্রেক্টিস করা হয়। ইবলিসি কার্লচারের পূজারী, আমেরিকান সেনাবাহিনী, ব্লাক ওয়াটার এবং সেসব লোক যাদের নসবনামা ইবনে আলকমার সাথে মিসেছে, তাদের টার্গেট একটা শ্রেণি। সেটাও খুবই মুন্সিয়ানা আন্দাজে। প্রকাশ্যে, দিনের আলোতে। এমনকি বাজারেও যদি সেই শ্রেণির কাউকে দেখতে পায়, কোনো রাফেজী (শিয়া) ইচ্ছা করলো আর আমেরিকান গাণ উঠালো এবং সবার সামনেই গুলি করে দিলো। শুধু জুলুম আর জুলুম।

বন্ধুরা হয়তো মনে করবে বার বার শুধু ফালুজার আলোচনা কেনো করছি? কাশ্মির, ভারত, আফগানিস্তানের কথা কেনো ভুলে গেছি? সবই মনে আছে। কাশ্মির দিল্লি কোনটাই ভুলতে পারি না। নিজেকে নিজে ভুলতে পারি, কিন্তু শ্রীনগর, দিল্লি ভুলতে পারি না। এটা আমার উপর ঋণ। থাকলো আফগানিস্থান। এটি ছাড়া তো সবকিছুই অসম্পূর্ণ। কিন্তু যে সবক পাকিস্তানের হকপন্থীদের জন্য ফালুজায় মওজুদ রয়েছে তা অন্য

কোথাও নেই। ফালুজার গণহত্যা নিজের মধ্যে অফুরন্ত শিক্ষা এবং সবক ধারন করে আছে। তাছাড়া পাকিস্তানের জন্য ইরাকের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। হত্যাকারী কারা ছিলো, হত্যার পথপ্রদর্শন কারা করেছে, আর কারা হত্যা করেছে? ডুকরে উঠা, আহ! আহ! কাতরানো আর চিৎকার কাদের সম্বল ছিলো? অট্টহাসি আর শ্লোগান কাদের কন্ঠে ছিলো? সংক্ষেপে এ কথা বলা যেতে পারে ফালুজা পাকিস্তানীদের জন্য এমন এক ভিডিও ফিল্ম, যা আগেই বানানো হয়ে গেছে। নিজের ভবিষ্যত দেখার জন্য ফালুজার ঘটনা মনযোগের সাথে পড়ুন। যে ফালুজা পড়েছে, তারজন্য ভবিষ্যতে পাকিস্তানে ঘটমান সবকিছু ফালুজার ভিডিও দেখার মতই মনে হবে। আক্রমণকারী তারাই। হামলার টার্গেটও তারাই। হত্যাকারীরাও ফালুজার মতই। নিহতরাও ফালুজার মত। সেসব বোনদের মরুভূমির দীল নাড়ানো চিৎকার, এই দূর্বল দীল বরদাশত করার উপযোগী নয়। সেসব বোনদের চিৎকারে তো বর্তমানের মুহাম্মাদ বিন কাসিম 'আবু মুসআব যারকাভী' লাব্বাইক বলেছিলো। কিন্তু করাচী থেকে গিলগিট এবং কাশ্মীরের গোত্রগুলো পর্যন্ত ব্লাক ওয়াটার, আমেরিকান মেরিন সৈন্য এবং তাদের ভাড়া করা সৈন্যের মুকাবেলায় আবু মুসআব যারকাভী হওয়ার মতো কি কেউ আছে? এমন কেউ কি আছে, যে তামাম মাসলাহাত, মনগড়া হেকমতে আমলী এবং ভয়ের ছায়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে কোনো এক সময় ইসলামের সকল দুশমনের মুকাবেলায় একা দাঁড়িয়ে যাবে? তবেই পাকিস্তানের মুসলমানদের বাঁচানো সম্ভব। হকপন্থীদের জন্য জরুরী হলো, যে পন্থায় দুশমন আমাদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে ঠিক সেই পন্থায় তাদের মুকাবেলা করা। ভারত এবং আমেরিকার সাথে সমঝোতা করে, যিন্দেগী ভিক্ষা চেয়ে অথবা কয়েকটি নিশ্বাস ধার করে নিয়ে বেঁচে যাওয়ার নাম যিন্দেগী নয়। এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যু হাজার গুণে ভালো। আমেরিকা এবং ভারত মিলে আপনার উপর আক্রমণ করার আগেই দাঁড়িয়ে যান। গোটা পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের স্পৃহা জ্বালিয়ে দিন। ইমাম মাহদীর দাওয়াতদাতা সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করুন। ইমাম মাহদীর শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন। মানুষজনকে এ কথা বুঝান, আমেরিকান যুদ্ধের ইন্ধন হওয়ার দ্বারা কিছুই

পাওয়া যাবে না। আল্লাহ যদি এই ইবলিশি শক্তির ভাগ্যে পরাজয় লিখে থাকেন, তাহলে গোটা পৃথিবী মিলেও তাদেরকে তালেবানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। যদি গোটা পৃথিবীর মুসলমানও আমেরিকার সাথে মিশে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে নতুন এক জাতি নিয়ে আসবেন। যারা তাদের দীনের দুশমনদের সাথে জিহাদ করবে। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং আখেরাতকে ভয় করা উচিত। ইসলামের দুশমন শক্তির সঙ্গ দেয়ার পরিবর্তে ঈমানদারদের সাথে নতুন ঐক্য করে আমেরিকা এবং ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। বিজয়ী তারাই হবে যারা আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ছেড়ে দিবেন। তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হকপন্থীদের সাথে শামিল করুন। বাতিলের সঙ্গ দেয়া থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

জিহাদের সময় কখন হবে?
ইমাম মাহদীর সাথে মিলে জিহাদ করবেন?

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার জন্য চার ইমাম যে শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন, সেই শর্ত অনুযায়ী এখন গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। এই ফরয আদায়ে কোনো অলসতা, ক্লান্তি এবং বাহানার সুযোগ নেই। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন, মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেসব শর্ত বর্ণনা করেছেন, সেগুলো এখনও পূর্ণ হয়নি। কাদিয়ানী শরীয়ত অনুযায়ী এখনও জিহাদ ফরয নয়। ভবিষ্যতেও ফরয হওয়ার কোনো আশা নেই। ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে আর একের পর এক মুসলিম দেশ নিজেদের আক্রমণের টার্গেট বানাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মুসলমান সীমাহীন গাফলতের শিকার। যখন মানুষজনকে জিহাদের আহ্বান করা হয়, আসুন জিহাদে শামিল হয়ে সেই ফরয আদায়

করুন, যা আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর মুসলমান হিসেবে হুকুম করেছেন, তখন তারা জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য নানারকম হীলা-বাহানা তৈরি করতে থাকে। অথচ তার মধ্যে এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি এবং তার জবাব দেয়া হয়নি।

বস্তুত: মানুষজনকে দুনিয়ার মহব্বত এবং তার সাথে সম্পৃক্ত লম্বা লম্বা স্বপ্ন এমন ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে যে, দুনিয়া ছুটে যাওয়ার চিন্তা-ই বিপদজনক মনে হয়। মৃত্যুর চিন্তা তো কবরস্থানে গিয়েও দীলের কোনো এক কোণায়ও সৃষ্টি করতে পারে না। বাস্তবতা অস্বীকার এবং মুশকিল অবস্থা দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখার অভ্যাস, এখন তার মেযাজের অংশ হতে বসেছে। সুতরাং আজও নিজেকে সকল দিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে দেখার পর, মানুষজন বাস্তবতা স্বীকার করার পরিবর্তে বিরোধীতা করছে। তাদের নিকট বর্তমান অবস্থা অস্বাভাবিক কোনো কিছু মনে হচ্ছে না। তারা মনে করছে এখনও সে সময় অনেক দূরে। সুতরাং অনর্থক মুসলমানদেরকে পেরেশান করার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন ইমাম মাহদী আসবে, তখন সকল মুসলমান তাঁর সাথে মিলে জিহাদের শরীক হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে এই ধারণা ব্যাপক যে, ইমাম মাহদী আসলে তাঁর সাথে মিলে জিহাদ করে নিবে। এই কথা বলার সময় ইমাম মাহদীর অবস্থা সামনে রাখে না যে, যখন দুনিয়ার সকল কাফের সেসব মুসলমানদেরকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সংকল্প করবে, যারা গোটা পৃথিবীর সাথে বিদ্রোহ করে কেবল 'আল্লাহ আল্লাহ' নেযাম বাকী রাখার জন্য জীবন বাজি লাগাবে, ইবলিসি ধর্ম 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর সাথে বিদ্রোহ করে ইসলামী নেযাম বাস্তবায়ন করতে আগুনের সাগর পাড়ি দিতে থাকবে, তামাম কাফের এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ মুনাফিকরা তাদের শত্রু হবে, তাদেরকে ধ্বংস করতে তাদের হাসি-খুশি ভরা গ্রামগুলো মাঝরাতে উলট-পালট করে দিবে, ফুলের মতো স্বচ্ছ হাসির বাচ্চাগুলোর ছেলেবেলা ছিনিয়ে নিবে, তাদের লজ্জাশীল নারীদের জীবিত জ্বালিয়ে দেয়া হবে, তাদের বৃদ্ধ বাবার সামনে যুবতী কন্যাদেরকে তোপের মুখে রেখে ফেড়ে ফেলা হবে, চারদিকে রক্তারক্তি যুদ্ধ হবে, পাহাড়ের বুক চিড়ার বোম্বিং হবে, যমীন ধ্বসানোর গোলাবর্ষণ হবে, দেহগুলো থেকে রক্তের ফোয়ারা

ছুটবে, মাথার খুলীগুলো বাতাসে ধূণা তুলোর মতো উড়তে থাকবে, মানুষের দেহের গোস্তগুলো দিক বিদিকে ছিন্নভিন্ন পড়ে থাকবে, গর্জনের তীব্রতায় যমীনের দীল ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে, বন্দুকের নাল থেকে বের হওয়া গুলি কানের পাশ দিয়ে শাই শাই করে উড়ে যাবে, আহত এবং যখমীদের আহ! আহ! কাতরানো বাতাস বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হবে, নীল নদের তীর থেকে কাশগর ভূমি পর্যন্ত যুদ্ধ আর যুদ্ধ চলতে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে কে কার সাথে থাকবে? এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন প্রশ্ন। এসবের সাথে সাথে সরকারী উলামা মাশায়েখ কর্তৃক ইমাম মাহদীকে দেয়া 'না জানা' শত উপাধি আর মূল্যবান প্লট, বহির্বিশ্বে সফর, আজীবন সরকারী ভাতা এবং সুস্বাদু সরকারী ডিনারের বিনিময়ে লেখা ফতোয়া, ইমাম মাহদীর সঙ্গদাতাদের বিরুদ্ধে দাজ্জালী প্রোপাগাণ্ডা, এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, তারপর আপনার সেই সিদ্ধান্তের প্রতি অন্তরচক্ষু দিয়ে লক্ষ্য করুন 'যখন ইমাম মাহদী আসবে তখন তার সাথে মিলে জিহাদ করে নিবো, এখনো জিহাদের সময় অনেক বাকি।'

ইমাম মাহদীর সাথে জিহাদ করবেন নাকি করবেন না তার সহজ জবাব কুরআন দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করতো তাহলে অবশ্যই এরজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতো।

আমাদের যখন এই অবস্থা যে, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেও রাজি নই, তখন জিহাদের প্রস্তুতি-ই যেখানে নেই, সেখানে ইমাম মাহদীর সাথে জিহাদের কিভাবে শরীক হবেন? তাছাড়া কথা হলো, এখনো জিহাদ ফরযে আইন। সুতরাং এখন কোন্ জিনিস জিহাদে শামিল হওয়া থেকে বাধা দিচ্ছে? এটা জিহাদের সময়, দুশমন মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং এখনই জিহাদে শরীক হয়ে যান, তাহলে এই জিহাদই তাঁর নেতৃত্বে আদায় করা যাবে। তিনি যদি না-ও আসেন, তাহলেও আমাদেরকে সেই ফরয আদায় করতে হবে যে ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, জিহাদ নামায রোযার মতই একটি ইবাদাত। কোনো ইবাদাত তখনই করতে পারে, যখন অন্তরে তার আগ্রহ থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট কেঁদে কেঁদে তা চাওয়া হয়। তার জন্য চেষ্টা করা হয় এবং তার কদর করা হয়। সুতরাং জিহাদ চাওয়া ছাড়া, চেষ্টা ছাড়া, প্রস্তুতি

ছাড়া কিভাবে মিলবে? অথচ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তাছাড়া জিহাদের প্রস্তুতিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব করেছেন। তাই প্রথমে অন্তত এতটুকু শিখতে হবে যে, জিহাদ কিভাবে করতে হয়। ওই ব্যক্তিকে আপনি কিভাবে সত্য হিসেবে মানবেন, যে এই কথা বলে, আমি নামায পড়তে চাই, আমার নামায পড়ার নিয়ত আছে, কিন্তু সে অযু-ও করে না নামাযের প্রস্তুতিও নেয় না? ইমাম মাহদীর সাথেই যদি জিহাদ করবেন, তাহলে তার প্রস্তুতি এবং তারবিয়াত তো এখনই করতে হবে। কারণ, ইমাম মাহদী কোনো দিন তারিখ ঠিক করে আসবেন না, যে আপনি সেই তারিখের আগে তারবিয়াত করে নিবেন।

অকল্পনীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন

এসব কথা ছাড়াও মূল এবং সোজা কথা হলো, আমাদের দীলকে প্রশ্ন করা উচিত, অন্তরে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা আছে কি নাই? দুনিয়ার এতো দীর্ঘ আশা, সরঞ্জামে ভরপুর ঘর, বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পরিকল্পনা, মৃত্যুর পর স্ত্রী-সন্তানের জন্য পরিকল্পনা, দুনিয়ার স্বাদ, দস্তরখান ভরা ডিনার-লাঞ্চ, অতি মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছেদ, যিন্দেগী জুড়ে উপার্জন, লয়শীল ক্ষয়শীল ঘরের আরাম-আয়েশ, টাইলস কেমন লাগাতে হবে, কালার কেমন হওয়া উচিত, ঘরের ভিতরের ডেকোরেশন কাকে দিয়ে করাতে হবে, এসব কিছু দেখে তো মনে হচ্ছে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা-ই আমাদের নেই। এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার খেয়ালও অন্তরে প্রবাহিত হয় না। এসব তো কাফেররা করবে। কারণ তাদের উদ্দেশ্যই দুনিয়া। কিন্তু উম্মতে তাওহীদ যদি এই ঘরের সাজ সজ্জাকেই যিন্দেগীর আসল মাকসাদ করে নেয়, যাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, যা বিরান হয়ে যাবে, যেখান থেকে নিজের জানাযা বের হবে, যেই উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের নিজের পেট কেটে হলেও অস্ত্র কিনে রাখা উচিত, সেই উম্মতের গোটা সম্পদ অতিরিক্ত কাজে খরচের এরাদা করা কোন্ জ্ঞানের পরিচয়? হুঁশিয়ার তো সেই ব্যক্তি, যে মসিবতে পড়ার

আগেই তা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে রাখে। জ্ঞানি সেই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের আগে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য নিকট ভবিষ্যতে এক বিপদজনক যুদ্ধের মুকাবেলা করতে হবে। প্রশাসকরা মিথ্যা শান্তনা দিক অথবা আনবিক শক্তির ভয় দেখাক, ভারত এবং আমেরিকার সাথে লড়াই করা, পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য আবশ্যক। আর আনবিক শক্তির ভয়? তাহলে ধীরে ধীরে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে একবার দুশমনের সাথে মুকাবেলা করে শাহাদাতের পিয়ালা পান করা খুবই সহজ। ভারত আমাদের পানি বন্ধ করে ধীরে ধীরে মারার পরিকল্পনা করেছে। পানি ছাড়া কিভাবে যিন্দেগী অতিবাহিত করবো? তা সেই লোক কখনো অনুমান করতে পারবে না, যে সবসময় হাতের নাগালে পানি পায়। বাকি থাকলো শাসকগোষ্ঠীর কথা। তাদের কথা বাদ দিন এবং নিজের বাহুর উপরই ভরসা করুন। কারণ এই ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা সাধারণ মুসলমানদেরই করতে হবে। সময় খুবই কম। বিশেষত গিলগিট, করাচী এবং পাঞ্জাবের জন্য। নিজেদের শহর এবং মহল্লায় অবস্থানরত মুজাহিদীনের কদর করুন। সেই সময় খুবই নিকটে যখন মানুষ এই আশা করবে হায়! যদি আমাদের ঘরে কোনো মুজাহিদ থাকতো। মহল্লাবাসী আফসোস করতে থাকবে, হায়! যদি মহল্লায় একজন মুজাহিদও থাকতো, যে আমাদের ঘরে প্রবেশ করা হায়েনাদের চোয়ালে হাত রাখার হিম্মত দেখাতো। তাঁদের কদর ইরাকীদের অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন। এই দৃশ্য দজলা ফুরাতের তীর দেখেছে। আপনি সেই দৃশ্য নিজের চোখের সামনে আনুন। মুসলমানদের মহল্লা ঘেরাও করে সবকিছু লুটে নিয়ে যায়। গোটা যিন্দেগীর কামাই, ইজ্জত, জান-মাল সবকিছু ধ্বংস করে চলে যায়। পিছনে শুধু জ্বলন্ত স্তুপ, চর্বি পোড়া গন্ধ, সেসব স্ত্রীর চক্ষু যা যখমী অবস্থায় যিন্দেগীর শেষ নিশ্বাসগুলো গণনা করছে, যাকে এসব দৃশ্য দেখার জন্য জীবিত ফেলে গেছে, বাচ্চার লাশের সাথে জড়ানো মমতাময়ীর লাশ, বৃদ্ধ বাবার উপর পড়ে থাকা যুবক ছেলের লাশ, মেয়ে আর বোনদের চিৎকারে দজলা ফুরাতের শোক। হাজারো আবাদীর মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমেরিকা এবং তাদের চরদের মুকাবেলায় অস্ত্র চালাতে জানে। তারপর আপনার সেই সন্ত্রাসীরাই ইয়ামান, সউদী আরব, শাম এবং আফগানিস্তান

থেকে বোনদের চিৎকারে লাব্বাইক বলেছে। ইরাকের শহরবাসীরা নিজেদের ইয্যত ও জানের নিরাপত্তার জন্যই নিজেদের ঘরে এবং মহল্লায় মুজাহিদীনকে জায়গা দিতে থাকে। তাদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে থাকে। সেই জানবাযরা আত্মত্যাগ এবং কুরবানীর এমন নযীর স্থাপন করে যে, আজ ইরাকের মুসলমান তাদের পথে চোখ মেলে থাকে এবং তাদের জন্য জান কুরবান করছে। সুতরাং এই সময় আসার আগেই পাকিস্তানের মুসলমানদের উচিত সেসব দরবেশের (মুজাহিদ) কদর করা। তাদের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান শূণ্যের কোটায়। যদিও আপনার ধারণা, আপনি তাদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। আপনার জ্ঞানের মাধ্যম হলো দুনিয়ার মিথ্যাবাদি দাজ্জালরা। যারা আপনার মস্তিস্কে দাজ্জালি ভরে দিয়েছে। আপনি তাদেরকে যে নামই দেন, সন্ত্রাসী, পাগলামী, পরিণামপছন্দী, মোল্লা, তালেবান। যা ইচ্ছা দিতে পারেন, ইসলাম এবং পাকিস্তানের দুশমনদের কালো তালিকায় জায়গা, জান কুরবানকারীদের উপর পাথরাঘাত। আপনি ইনসাফগার হোন আর দয়ালু হোন, সময়ই সব খরকুটা পৃথক করে দিবে। কার অন্তরে এখানকার মুসলমানদের দরদ আছে, আর কারা পাকিস্তানের নামের উপর আম জনতাকে লুটে খাচ্ছে?

কে দোস্ত কে দুশমন?

ইমাম মাহদীর সাথে কোন্ মুসলমান থাকবে এবং তার দুশমনদের সাথে কারা থাকবে? এর জবাব খুবই সহজ। কিন্তু না বুঝতে চাইলে খুবই মুশকিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগতদের কাছে এটাই চান যে তারা কেবল তাঁরই একনিষ্ট হয়ে থাকবে। যদি কারো শতকরা নিরানব্বই ভাগ তার এবং শতকরা এক ভাগ অন্য কারো থাকে, তাহলেও তাকে কবুল করা হবে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে এই হুকুম করেছেন যে, তারা যেনো পৃথিবীতে সকল মতবাদ খতম করে কেবল আল্লাহরই নেযাম প্রতিষ্ঠা করে। যাতে সে শতকরা একশ ভাগই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে যায়। তিনি ঘোষণা করেন, আর তোমরা কাফেরদের

সাথে কিতাল করতে থাকো, যতক্ষন না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং পুরোপুরি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ইমাম মাহদী এসেও এই ফরয বাস্তবায়ন করবেন। কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ'র মাধ্যমেই গোটা পৃথিবীকে কুফর ও শিরকমুক্ত করে খেলাফতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করবেন। ইমাম মাহদীর সাথে সেসব হকপন্থীরা থাকবেন, যারা আল্লাহ তা'আলার সকল বিধি বিধানের সামনে মাথা ঝুকাবেন। ইসলামের সকল হুকুমের সাথে তাদের মহব্বত হবে। রাতে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অশ্রু ঝরাবেন আর দিনের বেলা জিহাদের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করবেন। তাঁদের অন্তরে আল্লাহর বন্ধুদের মহব্বত থাকবে এবং আল্লাহ দুশমনদের ঘৃণায় অন্তর ভরপুর থাকবে। মুসলামানদের হত্যাকারীদের উপর তাদের রক্তচক্ষু থাকবে। সর্বাবস্থায় কেবল এবং কেবলই আল্লাহর ইবাদাতকারী হবেন। কখনো ইবলিশী নীতিমালার উপর সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিসকে হালাল করেছেন সেগুলোকে হালাল মনে করবেন এবং যেগুলোকে হারাম করেছেন সেগুলো হারাম মনে করবেন। যদি কেউ শক্তির মাধ্যমে আল্লাহর বিধি বিধান পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে সে তাদের সাথে কিতাল করবে। জান কুরবান করে হককে হক হিসেবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণ করবে। অথচ তাঁদের মুকাবেলায় গোটা বাতিল শক্তি থাকবে। কাফেরদের সাথে সেসব নামধারী মুসলমানও থাকবে, যারা ইসলামী নীতিমালার উপর ক্ষেপা, পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক, আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং পর্দাকে উন্নতির পথে অন্তরায় মনে করে, যাদের নিকট জিহাদ হলো সন্ত্রাসী এবং ভদ্রতার খেলাফ, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে মানে না, অন্তর যাদের দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয় দখল করে আছে, খাহেশাত যাদের উপর বিজয়ী হয়ে আছে, জিহাদের পরিবর্তে ঘরে বসে থাকা যাদের কাছে অধিক প্রিয়, ফেতনায়ে মাল, দুনিয়া, নারী এবং সন্তান-সন্ততী বেষ্টন করে রেখেছে। মনে রাখতে হবে ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণাকারী একজন নামের মুসলমান সুফিয়ানী হবে। তার সেনাবাহিনী যদিও নিজেদেরকে মুসলমান মনে করবে, কিন্তু বাস্তবে তারা মুরতাদ হবে। মূলকথা হলো, যে

যাকে পছন্দ করে সে তার পক্ষে লড়বে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, যারা ঈমানদার, তারা কিতাল করে আল্লাহর রাস্তায়। আর যারা কাফের তারা কিতাল করে তাগুতের রাস্তায়। এজন্যই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিতাল কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দূর্বল।

সুতরাং হে ঈমানদারেরা! প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আরামপ্রিয়তা ছেড়ে পরিশ্রমী হোন। আসুন! পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করুন। যার মধ্যে জিহাদ এবং কিতালও রয়েছে। আল্লাহ ওয়ালাদের পথের মুসফির হয়ে যান। তাদের সাথে দাঁড়িয়ে যান। প্রশস্ততা-সংকীর্ণতা, আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায়। যদি আমাদের সামনে ইমাম মাহদীর প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর মদদে তাঁর সাথে শামিল হয়ে যাবো। আর যদি তাঁর আগেই শাহাদাত নসীব হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর সাথে উঠানো হবে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে, নিজের দূর্বলতা স্বীকার করে চেয়ে নিন, হে আল্লাহ! দাজ্জালের মিথ্যাচার থেকে হেফাজত থেকে মুক্ত রেখে হকপন্থীদের সাথে শামিল করে দিন। তাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরে তাঁদের মহব্বত পয়দা করে দিন। আমীন।

দলীল-প্রমাণের ভিত্তি

১. তাফসীরে কুরতুবী।
২. তাফসীরে তিবরী।
৩. তাফসীরে রুহুল মাআ‘নী।
৪. সহীহ বুখারী।
৫. সহীহ মুসলিম।
৬. আল আহাদ ওয়াল মাছানী।
৭. সুনানে আবু দাউদ।
৮. সুনানে ইবনে মাজাহ।
৯. আস সুনানুল কুবরা।
১০. সুনানুত তিরমিযী।
১১. আল মুজতাবা মিনাস সুনান।
১২. আত-তারীখুল কাবীর।
১৩. আল জামে‘অ লি মুআম্মার বিন রাশেদ।
১৪. আয যুহুদ ওয়া ইয়ালীহির রকায়িক। (আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.)
১৫. আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ওয়া গওয়ায়িলিহা ওয়াস সাআতু ওয়া আশরাতুহা। (আবু আমর উসমান বিন সাঈদ)
১৬. মুসতাদরাক লিল হাকিম নিসাপুরী।
১৭. আল মুজামুল আওসাত্ব (আবুল কাসেম সুলাইমান)
১৮. আল মুজামুল কাবীর (আবুল কাসেম সুলাইমান)
১৯. সুনানুল বায়হাকী আল কুবরা।
২০. আল ফিতান লিনুআইম বিন হাম্মাদ।
২১. শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী।
২২. সহীহ ইবনে হিব্বান বিতারতীবি ইবনে বুলবান।
২৩. সহীহ ইবনে খুযাইমা।
২৪. ফাতহুল বারী। (আহমদ বিন আলী আস শাফেয়ী)
২৫. ফাতহুল বারী। (ইবনে রজব হাম্বলী)
২৬. আল হুকমুল জাদীরাহ বিলআযাআ‘হ। (ইবনে রজব হাম্বলী)

২৭. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম। (ইবনে রজব হাম্বলী)
২৮. যম্মুদ দুনিয়া লি ইবনে আবিদ দুনিয়া।
২৯. কিতাবুয যুহদিল কাবীর। (আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন)
৩০. কিতাবুস সুনান। (আবু উসমান সাঈদ বিন মানছুর আল খুরাসানী)
৩১. মাজমাউয যাওয়ইদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ। (আলী বিন আবু বকর আল হায়ছামী)
৩২. মুসনাদে আবি ইয়ালা।
৩৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল।
৩৪. মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুইয়াহ।
৩৫. আল বাহরুয যুখার। (আবু বকর আহমদ বিন আমর আল বাযযার)
৩৬. মুসনাদুস শামিয়ীন। (সুলাইমান বিন আহমদ)
৩৭. আল কিতাবুল মাছান্নাফ ফিল আহাদিসি ওয়াল আছার। (আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ)
৩৮. মাওয়ারিদুয যমআন ইলা যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান। (আলী বিন আবু বকর আল হায়ছামী)
৩৯. আউনুল মা‘অবুদ শরহু আবি দাউদ।
৪০. শরহুন নাওয়াভী আলা সহীহ মুসলিম।
৪১. শরহুস সূয়ূতী আলাল মুসলিম।
৪২. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সহীহিল বুখারী। (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী ও আবুল হাসান নুরুদ্দীন)
৪৩. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা নাসাঈ। (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী ও আবুল হাসান নুরুদ্দীন)
৪৪. শরহু সহীহিল বুখারী লি ইবনে বাত্তাল।
৪৫. মিরকাতুল মাফাতিহ। (মুল্লা আলী কারী)
৪৬. আল মাসনু ফি মারেফাতিল হাদীসিল মাউজু। (মুল্লা আলী কারী)
৪৭. মাসনুআতিস সগানী।
৪৮. মুজামুল বুলদান। (ইয়াকুত বিন আব্দুল্লাহ)
৪৯. তারীখে বাগদাদ। (খতীবে বাগদাদী)
৫০. তারীখুত তিবরী। (মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তিবরী)

৫১. আল মুনতাযিম ফি তারীখিল মুলুক। (আব্দুর রহমান বিন আলী)
৫২. আল কামেল ফিত তারীখ। (ইযযুদ্দীন উলইয়া বিন আছীর ৫৫৫-৬৩০ হি.)
৫৩. কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল। (আলী বিন হুসামুদ্দীন ৮৮৮-৯৭৫হি.)
৫৪. আল জিহাদ ওয়াত তাজদীদ। (মুহাম্মাদ হামিদুন নাছির)
৫৫. মাজমুউল ফাতাওয়া। (তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ. ৬৬১-৭২৮ হি.)
৫৬. আল লুঅলুউ ওয়াল মারজান ফী মাত্তাফাকা আলাইহিস শায়খান। (মুহাম্মাদ ফুয়াদ বিন আব্দুল বাকী ওফাত ১৩৮৮ হি.)
৫৭. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি। (মুহাম্মাদ মিয়া দেওবন্দী রহ.)
৫৮. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত। (আবুল হাসান আলী আন নদভী রহ. ১৩৩৩- ১৪২০ হি.)
৫৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। (ইবনে কাছীর রহ. ৭০০-৭৭৪ হি.)
৬০. আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম। (ইবনে কাছীর রহ. ৭০০-৭৭৪ হি.)
৬১. আল মুফাস্সাল ফী আহাদিসিল ফিতান। (আলী বিন নায়েফ)
৬২. আতহাফুল জামাআহ বিমা জাআ ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিমি ওয়া আশরাতিস সাআহ। (হুমুদ বিন আব্দুল্লাহ ওফাত ১৪১৩ হি.)
৬৩. আহাদিস ফিল ফিতান ওয়াল হাওয়াদিস। (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ১১১৫-১২০৬ হি.)
৬৪. আল ফিতান লিহাম্বল বিন ইসহাক।
৬৫. মাউসুআতুল ইয়াহুদ ওয়াল ইয়াহুদিয়্যাহ। (আব্দুল ওয়াহ্হাব আল মুসাইরী)
৬৬. ইয়াহুদুদ দুনামাহ (মুহাম্মাদ আলী কুতুব)
৬৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা। (ইমাম যাহাবী রহ. ৬৭৩-৭৪৮ হি.)
৬৮. আহকামুল কুরআন লিল জাচ্ছাছ। (আবু বকর আল জাচ্ছাছ রহ. ৩০৫-৩৭০)

৬৯. সিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিক। (আবু বকর আল ফরিয়াবী রহ. ২০৭-৩০১ হি.)
৭০. ইনসাইক্লুপিডিয়া অফ বৃটেনিকা।
৭১. ইনসাইক্লুপিডিয়া অফ আনকারটা।
৭২. মাজাল্লাতুর রাছেদ-৯।
৭৩. The History of the House of Rothschild By Andy and Daryl.
৭৪.The Rockefeller Syndrome By Ferdinend Lunberg.
৭৫.Secret Societies and their power in the 20th century By Jan Van Helsing.

কী আছে এই বইয়ে?
* সকল ফেতনার সর্বোত্তম সমাধান কী?
* দেশপ্রেম কি ঈমানের অঙ্গ?
* ইহুদী যাদুকরদের সফলতার রহস্য কী?
* অতীত আমাদের কী শেখায়?
* মুসলিম বিশ্বের চলমান যুদ্ধগুলো কী মুসলমানদের আপসে লড়াই?
* হিন্দুস্থানের মুসলমান কার সাথে জিহাদ করবে?
* ব্লাক ওয়াটার কী? তাদের কাজ কী?
* ইমাম মাহদীর প্রকাশের আলামত কী?
* ইমাম মাহদীর দোস্ত কে দুশমন কে?
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো
আমাদের কিছু বই
* বিস্ময়কর বিসমিল্লাহ।
* আদর্শ পরিবার ও মহিয়সী নারী।
* আসল তাবলীগ নকল তাবলীগ।
* কষ্টি পাথরে দেওবন্দী মতবাদ।
* ওরা কেনো অস্ত্র রাখে?
* ওরা কেনো যুদ্ধ করে?
* দরদী ভারত! (বিস্ফোরণ-১)
* জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র! (বিস্ফোরণ-২)
* তোলপাড় (গল্প)
* নয়া তুফান (কবিতা)
* ফেরারী প্রেম (কবিতা)
বদলে দেয়ার মিছিলে নতুন মশাল
রুহামা প্রকাশনী
০১৫৫৪৯৮৮৯৩৯, ০১৬৭০৬৫৬২৩১